১) সখিনার জীবন কথা

উত্তমা পাল তমা (নোয়াখালী) :

জীবন যুদ্ধে এক সংগ্রামী সৈনিক সখিনা। মা বাবা সহ সাতজনের সংসার বাঁচিয়ে রাখতে শিশু বয়সে নেমেছে উপার্জনের পথে। বজরা ইসলাম গঞ্জ বাজার সখিনার নিত্যদিনের স্থায়ী ঠিকানা। হাতে দুই তিন ব্যাগ আচার সুইংগাম, চকলেট। মাঝেমধ্যে আমড়া, জাম্বুরা, আমলকিও বিক্রি করে। এসব বিক্রি করে সে প্রতিদিন পায় ৬০-৭০ টাকা। তবে রোজায় ২০-৩০ টাকার বেশি বিক্রি করতে পারেনা।

সখিনার মা বাবা দুজনেরই বয়স হয়ে গেছে। কিছুদিন কাগজ টোকাত সে। তারপর এ পেশায়। সে জানায় চকলেটের চেয়ে আমড়া আমলকি বিক্রি করলে লাভ হয় বেশি।

সখিনার বয়স ৯ বছর। এ বয়সে যখন সবার সাথে ছুটোছুটি করার কথা তখন বেঁচে থাকার তাগিদে তার হাতে এখন চকলেটের ব্যাগ, আমড়ার বাটি।

তার মনের ভেতর একটি স্বপ্ন, একটি আশা বাসা বেঁধে আছে। সে যদি কোনো দিন বড় হতে পারে তাহলে গরীব ও অসহায় শিশুদের শিক্ষার জন্য সাহায্য করবে।

২) রাজুর ছুটে চলা

উত্তমা পাল তমা (নোয়াখালী) :

"মা চুলাত হানি দিয়া বই আছে। হারাদিন বেচাকেনার হরে যা লাভ হয় হেই টাহা দিয়া চাল কিনুম, তার হরে হেই চাল ঘরে নিলে মায় ভাত রানবো, এ হরে খানা"- কথাগুলো বলল রাজু।

রাজুর বয়স ১১। সকালের রক্তিম সূর্যের মত রাজুর স্বপ্ন ছিলো। তার সেই আশা অস্তমিত সূর্যের মত ডুবে গেল। মায়ের খুব ইচ্ছা ছিলো ছেলে পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ হবে, বড় হবে। কিন্তু বড় হয়ে ওঠা হলনা তার আর। বাবা আলমগীর একদিনের জ্বরে মারা যায়। সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে রাজুর কাঁধে। রাতারাতি সে হয়ে যায় তরকারিওয়ালা। তিন বোন এক ভাই, নানী আর মা সব মিলিয়ে ৬ জনের সংসার কিভাবে চলবে সে চিন্তা করে নানা জায়গায় কাজ খুঁজেছে সে। অবশেষে একদিন মাথায় আসে ব্যবসা করবে। জমানো টাকা ছিলোনা তাই এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ৫০০ টাকা এনে শুরু করে ব্যবসা। শুরু হয় রাজুর ছুটে চলা।

কাকডাকা ভোরে আগের দিনের পাতিলের নিচে পড়ে থাকা পান্তা ভাত কটি খেয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার পর ঘুরে বেড়ায় তরকারির খাচা নিয়ে।

"কাঁচামরিচ, লতি, কলমী শাক, লাল শাক, পেঁপে কিনবেন গো, তাজা তরকারি, সস্তায় তরকারি"– এভাবে বিভিন্ন পাড়ায়, অলিগলি, বাসায় বাসায় ঘুরে তরকারি বিক্রি করে। এতে কোনোদিন ৬০-৮০ টাকা আবার তার চেয়ে কম বা বেশি লাভ হয়। তাই দিয়ে কোনোভাবে সংসার চলে। যেদিন যেখানে সস্তায় তরকারি পায় সেখান থেকে নিয়ে আসে।

নোয়াখালী সদর থানার হরিনারায়নপুর স্টেশনের পাশে খড়ের তৈরি ঘরে বসবাস করে তারা। লেখাপড়া হয়নি রাজুর অভাবের কারনে। তার খুব ইচ্ছে ভাইবোনদের পড়ালেখা করাবে।

৩) সবুজের উৎসব জুলেখার বাড়িতে

উত্তমা পাল তমা (নোয়াখালী) :

বাড়ির অঙ্গিনায়, খালি জায়গায় সবজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষ করে জুলেখা বেগম অভাবের সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছেন। আদর্শ খামার তৈরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে প্রমান করেছেন নারীর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা। এখনকার অবস্থানে পৌঁছাতে তাকে করতে হয়েছে কঠোর পরিশ্রম। মোকাবেলা করতে হয়েছে সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা।

নোয়াখালী সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে চর ওয়াপদার চর বৈশাখীতে তার বাস। এক জীবনে তাকে অনেকবার দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ভূমি ও স্বামী দুটোই হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু হারাননি মনের বল। চর বৈশাখীর নিভৃত কোনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সম্মান ও সফলতার সাথে।

একটা সময়ে স্বামীর কৃষিকাজের সামান্য আয়ে এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে কোনো ভাবে চলত তাদের সংসার। এর মধ্যে চরের জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ বাধে। জুলেখার স্বামী জমির ধান কেটে ও পুকুরের মাছ নিয়ে আসায় জমির দাবীকৃত মালিক তার বিরুদ্ধে মামলা করে। ভয়ে তার স্বামী পালিয়ে যান। তারপর থেকে কেটে যাওয়া আট বছরের তার কোনো সন্ধান পাননি তিনি। সে মামলায় তার ছেলেকে জেল খাটতে হয়েছে। জমি বন্ধক দিয়ে ছেলেকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। স্বামী হারিয়ে জমি হারিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে তিনি আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়েন।

২০০০ সালে নোয়াখালী রুর‌্যাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এনআরডিএস) চর ওয়াপদা ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানের মাঠকর্মীদের সহায়তায় তিনি খুঁজে পান কাজের ক্ষেত্র। মাছ ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ শেষে তিনি থেকে তিন হাজার টাকা ঋন নিয়ে সবজি চাষ শুরু করে। সবজি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে আস্তে আস্তে ঋন শোধ করে সে। পরবর্তীতে আরও তিন বার ঋন নিয়ে পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে। অর্থকষ্ট দূর হয়েছে। ধারের টাকা, ঋণের টাকাও শোধ হয়েছে। দু'একর বন্ধকী জমিও ছাড়িয়েছেন। দু'সন্তানকে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করতে না পারলেও নাতিদের পাঠিয়েছেন স্কুলে। তার উৎপাদিত সবজি, মাছ নিজেদের চাহিদা মেটায় আবার বাজারে বিক্রি করলে নগদ টাকা হাতে আসে।

প্রথম দিকে বাজারে যাওয়ার কারনে গ্রামের মানুষ নানা কথা বললেও এখন কেউ কিছু বলেনা। এ সম্পর্কে জুলেখা জোর গলায় বললেন– "কে কি কইব? আর লাই কেউ করবোনি। নিজের কর্মের লাই বাজারে যাই।"

জীবনের বাস্তবতা, প্রয়োজন ও সামাজিক সংস্কারের বৃত্ত থেকে বের করে তাকে দাঁড় করিয়েছে সফলতার সিঁড়িতে। চর বৈশাখীর মানুষ তাকে এখন আদর্শ খামারি হিসেবে চেনে। তিনি জানালেন, মানুষ বলে জুলেখা মাটি থেকে সোনা ফলায়। ভূমি বন্দবস্ত দেয়ার প্রক্রিয়াটি এখনও সম্পন্ন হয়নি। তাই তাকে এখনও মামলা লড়তে হচ্ছে। জমানো টাকার প্রায় পুরোটাই মামলার পেছনে খরচ হচ্ছে। তবুও কর্মঠ দুটি হাতে বোনা লাউ ঝিঙ্গের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক স্বপ্ন। ভবিষ্যতে টিনের ঘর করার ইচ্ছে তার। তাই স্বপ্ন বুনে আগামীর পথে পথে তার এগিয়ে চলা।

৪) নিজের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে থাকতে হয় জাহানারাকে।

শাহিনুর আক্তার (নোয়াখালী) :

"দুনিয়াতে আমার কে আছে। অ্যারে কে চাইবো। মা বাপ নাই। বাপের বাড়ি নাই। যৌতুকের টাকা দিতে পারিনা তাই স্বামীর বাড়িও নাই"- অসুস্থ শরীরে অশ্রু ভেজা কণ্ঠে কথাগুলো বলল জাহানারা (২৪)। তার বাড়ি চাটখিল থানার পাঁচগাও গ্রামে। মায়ের আদর কেমন মনে নেই তার। দু বছর বয়সে মাকে হারায় সে। ছোটবেলায় দাদীর কাছে বড় হয়েছে। বাবা কৃষি কাজ করত। নিজেদের কিছু জায়গা জমি ছিলো। সে যখন ৭ম শ্রেনীতে পড়ে তখন বাবা আবার বিয়ে করে। সৎ মা সহ তিনজনের সংসার সুখের ছিলো।

কিছুদিন পর বাবা মারা গেলে সৎমা তাকে চাচার বাসায় রেখে বাবার বাড়ি চলে যায়। চাচীর সংসারে সব কাজ তাকে করতে হতো। কাজের বিনিময়ে শুধু খেতে দেয়া হত। তারপর তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। দু বছর পর চাচা বিয়ে ঠিক করে চাটখিলের হোটেলে কাজ করা রফিকের সাথে। বিয়ের দুই

মাসের মাথায় রফিক ও তার মা শাহিনুরকে বলে বিদেশে যাবার জন্য চাচার কাছ থেকে টাকা এনে দিতে। চাচা জায়গা জমির বদলে কিছু টাকা দিতে রাজি হয় কিন্তু তাতে সম্পূর্ন খরচ হয়না। আরও টাকা হায়। এরপর শাহিনুরের উপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন চালায় তারা এবং এক পর্যায়ে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয় এবং বাকী টাকা জোগার করলে স্বামীর বাড়িতে জায়গা হবে এটা বলে। এদিকে চাচা টাকা দিতে পারেনা অন্যদিকে স্বামীও নেয়না। এক বছরের একটি সন্তান নিয়ে শাহিনুর এখন বিপাকে। শাহিনুর এখন চাচার কাছেই থাকে। কিছু বলতে পারেনা যদি শেষ আশ্রয়টা হারায়।

৫) গৃহপরিচারিকার কাজ করে পড়ালেখার খরচ জোগায় রেখা
শাহিনুর আক্তার (নোয়াখালী) :
দ্রুত হাতে কাজ করে চলছে মেয়েটি। মুখে ক্লান্তির ছাপ তারপরও দ্রুততার সাথে কাজ করছে। এক বাসার কাজ শেষে যেতে হবে অন্য বাসায়। এ মেয়েটির নাম রেখা (১৫)। তার বাড়ি নোয়াখালী সদর থানার দক্ষিন নারায়নপুর গ্রামে। পাচঁ ভাই বোনের মধ্যে সবার বড় সে। তাই দায়িত্বও অনেক। বাবা সায়েদ মিয়া রিক্সা চালায়। দিনে যা রোজগার হয় তাতে সাত জনের শুধু দুবেলার ভাত জোটে। আর বাবা অসুস্থ থাকলে অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হয়। তাই নয় বছর বয়স থেকে গৃহপরিচারিকার কাজ করে সে। প্রথমে ঢাকায় এক বাসায় কাজ করত। মাসে একশ টাকা করে পেত। সেখানে কাজে ভুল হলে মারত। রেখা বলে- "এখনও ভয় করে সে মারের কথা মনে করলে। বছরে একবারও বাড়ি আসতে দিতোনা।" তিন বছর এভাবে থাকার পর ওখান থেকে বাবার সাথে মাইজদীতে চলে আসেসে। এখন সে এখানে দুই বাসায় কাজ করে পায় মাসে ৪০০ টাকা। এ টাকা দিয়ে ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনার খরচ চলে। রেখা কখনও স্কুলে যায়নি। সে জন্য দঃখ হয়। তবে ছোট ভাইবোনেরা যখন গল্প কবিতা পড়ে তখন পাশে বসে শুনতে খুব ভালো লাগে। ভাই বোন পড়ালেখা করে বড় হবে এমন স্বপ্ন দেখে সে।

৬) শ্রমজীবী কিশোর হারুন।
শাহিনুর আক্তার (নোয়াখালী) :
হারুন বয়স ১৩ কি ১৪। হোটেলে কাজ করে সে। তার বাড়ি চাটখিলের পাল্লা গ্রামে। বাবা নেই তিন ভাই বোন তারা। সে সবার বড়। তার রোজগারের টাকা দিয়ে চলে সংসার। দিনে পচিঁশ টাকা পায়। রাতে সেই টাকা দিয়ে চাল কিনে বাগি ফেরে। ইচ্ছে করলেু ভালো কিছু কিনে খায়না। পাল্লার হোটেলে বাড়ি থেকে রান্না করে এনে বিক্রি করা হয়। সে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করে। তাকে মালিকের বাড়ি যেতে হয় দিনে ১৮-২০ বার রান্না করা খাবার আনতে। একদিন এরকম আনতে গিয়ে রান্নার পাতিল পরে যায় মাথা থেকে। মালিক সেজন্য তাকে অনেক মারে। তারপর সে ছাড়েনি এ কাজ। সব রকম অত্যাচার সহ্য করে এখানে পড়ে আছে সংসারের কথা ভেবে। ছোট বোন রেনু একমাস হয় পাশের বাড়ি কাজ নিয়েছে। হারুন বলে-"মা অনেকদিন ধইরা অসুস্থ, ডাক্তারের কাছে নেয়া দরকার এজন্য প্রতিদিন ১০ টাকা করে জমাই। কবে যে বেশি টাকা হবে?

৭) চরাঞ্চলের নারী জীবন/ বেড়ে ওঠার আগেই বিয়ে দিচ্ছে মেয়ে শিশুদের
আবদুশ্ শাকুর হান্নান (নোয়াখালী) :
"মাইয়া লায়েক হইছে' আর ঘরে ধরি রান যায়না"-নিজের মেয়ে সম্পর্কে এমন উক্তি করলেন নোয়াখালীর সুবর্ন চর এলাকার জাহাজমারার দরিদ্র কৃষক আব্দুল মোত্তালেব। তার তৃতীয় কন্যা রহিমা বিবি ১৩ বছর বয়স। ৫ম শ্রেনীর ছাত্রী ছিলো সে। স্কুলে যাওয়ার সময় এলাকার বখাটে ছেলেদের

উৎপীড়নে মোত্তালেব মিয়া মেয়ের পড়ালেখা বন্ধ করে দেন। শুরু হয় বর খোঁজা। খুঁজে শেষ পর্যন্ত রহিমার থেকে ১৯ বছরের বড় এবং এক কন্যা সন্তানের জনক মাকসুদের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয় সাদা কাগজে একলাখ টাকা দেন মোহরে। বিয়ের পর রহিমা বাবার বাড়িতেই থাকে। মাকসুদ কোনোদিন রাতে এসে পরদিন সকালে চলে যায়। এভাবেই পড়াশুনা ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনে পা পড়ে রহিমার।

একই গ্রামের নাসিমা ১৪ এর বিয়ে হয়েছে মামাত ভাই মালেকের সাথে। বিয়ের পর তিন বছর সংসার করে দুই সন্তানের জন্ম দেয়। বিয়েতে ৫ হাজার টাকা যৌতুক দেয়া হয় কিন্তু কোনো কাবিন হয়নি। কিছুদিন পর মালেক স্ত্রী সন্তানকে রেখে অন্যত্র বিয়ে করে। কাবিন না থাকায় মালেককে আইন স্পর্শ করতে পারেনি।

এ গ্রামের হারিছ (২২) বিয়ে করে একই গ্রামের জব্বার আলীর কন্যা আক্তার বেগমকে। তার বয়স ১৪ বছর। বিয়েতে কোনো কাবিন হয়নি। বিয়ের পর হারিছ ১০,০০০ টাকা ও সাইকেল দাবী করে আক্তারের কাছে। দিতে না পারায় আক্তারকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। আক্তার বলে-"আমি ক্লাশ ফাইব পর্যন্ত পড়ছি। আব্বা জোর করে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলো। কি লাভ হইলো"

রহিমা নাসিমা আক্তারের মত এ চরে অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারনে। এ বিষয়ে গ্রামের প্রধান কামাল উদ্দিন বলেন- "বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে চরের মানুষের ধারণা কম। তাই মেয়েগুলোর জীবনে অন্ধকার নামছে।"

চর জব্বার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ মিয়া বলেন–"দারিদ্রতা, অসচেতনতা, কুসংস্কার, মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় এখানে বাল্য বিয়ে বেশি হয়। এখানে বেশি করে কাজ করা উচিত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার।

সুবর্নচর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ছন্দা সাহা জানান, অধিকাংশ মা বাবা মনে করে বিয়ে মেয়েদের চূড়ান্ত ঠিকানা। তবে বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে আমরা সবাইকে সচেতন করার কাজ করছি।

৮) মাত্র পাঁচ হাজার টাকার ঔষধও ভাগ্যে জোটেনি

কোম্পানীগঞ্জে একই পরিবারের দুই অন্ধ প্রতিবন্ধি শিশুর দূর্বিসহ জীবন

ইকবাল হোসেন মজনু (নোয়াখালী) :

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরহাজারী ইউনিয়নের ৩ নাম্বার ওয়ার্ডের দিনমজুর রফিক উল্লার পরিবারের চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার। পৃথিবীর বুকে রফিকের দুই শিশু ছেলে সাইফুল ইসলাম (০৬) ও মেয়ে ফাহমিদা আক্তার রেখা (০৩) অন্ধত্বের অভিশাপ নিয়ে বড় হচ্ছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য তারা মাত্র পাঁচ হাজার টাকার ঔষধের অভাবে বিনা চিকিৎসায় দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। এদের অন্ধত্বের বিষয়ে কোনো ডাক্তার আজো বলতে পারেনি কেনো তারা একের পর এক অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

২৫ জুলাই ২০০৭ তারিখে সরেজমিনে মোঃ রফিকের বাড়িতে গেলে তিনি কান্না জড়িত কন্ঠে জানান, ২০০৬ সালের জুন মাসে অনেক কষ্ট করে গ্রামীন ব্যাংক, ধানসিড়িসহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ করে ছেলে সাইফুলকে ঢাকা সরওয়ার্দ্দী হাসপাতালে নিয়ে চোখ অপারেশন করেছেন। কিন্তু ঋণে জর্জরিত রফিক অভাবের কারনে ডাক্তারের লেখা মাত্র পাচ হাজার টাকার ঔষধ কিনে ছেলেকে

খাওয়াতে পারেননি। ফলে আর যাওয়া হয়নি হাসপাতালে। সেই থেকে দুই প্রতিবন্ধি সন্তানকে নিয়ে রফিকের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে।

বর্তমানে দেনার দায়ে জর্জরিত রফিক হতাশায় পড়েছেন। একদিকে পাওনাদারের টাকা পরিশোধের তাগিদ অন্যদিকে পরিবারের অন্ন জোগাড় করতে গিয়ে এখন তিনি কি করবেন তা বুঝে ওঠতে পারছেন না। এদিকে রফিকের বাবা সফি উল্লারও (৬০) একই অবস্থা। কর্মঠ সফি উল্লাহ কাজের ফাঁকে চোখে কি যেন বিদ্ধ হয়ে এখন আস্তে আস্তে তিনিও চোখে ঝাপসা দেখছেন।

রফিক জানান, এ কষ্টের সময় কেউ তার খোঁজ নেয়নি সাহায্যও করেনি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কিংবা সরকার থেকেও কোন সহানুভূতির হাত বাড়ানো হয়নি। ঋণদাতারা ঋণ পরিশোধের তাগিদ দেয়ায় তিনি এখন হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মুনির হোসেন খান বলেন- "চরহাজারীর এ অন্ধ প্রতিবন্ধিদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মাওলানা ফজলুল করিম জানান, বিষয়টি তিনি আগে জানতেন না। তাকে কেউ জানায়নি। আগামিতে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা এলে তিনি এ পরিবারের কথা ভেবে দেখবেন।

এদিকে সরকারের এতো জনসচেতনতার পরও কি কারনে চরহাজারী গ্রামের অসহায় এ পরিবারের তিনজন অন্ধ হলো তা আজো কোন ডাক্তার বলতে পারেনি। তিনজন প্রতিবন্ধি নিয়ে পরিবারটি অসহনীয় যন্ত্রণা পোহাচ্ছে। এ অসহায় পরিবারের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের সচ্ছল ব্যাক্তিদের সহায়তা কামনা করেছে এলাকাবাসি।

(৯) রিকশা চালিয়ে স্কুলের খরচ জোগায় কোম্পানীগঞ্জের শিশু শুক্কুর আলী

ইকবাল হোসেন মজনু (নোয়াখালী) :

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের ভিভিটিসি টেকনিকাল স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ আবদুর রাজ্জাক শুক্কুর(১৩) রিকশা চালিয়ে সংসার চালানোর পাশাপাশি নিজের পড়ালেখার খরচ জোগাচ্ছে। সে চরহাজারী ইউনিয়নের দিনমজুর সফি উল্যার ছেলে। শুক্কুরদের ১৩ সদস্যের পরিবারের খরচ চালাতে তার বাবা সফি উল্যাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে তাকে পড়ালেখা বাদ দিয়ে কর্ম করার তাগিদ দিচ্ছে তার পরিবার। কিন্তু কোমলমতি শুক্কুর পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ থাকায় সে এখন সকালে স্কুলে গিয়ে বিকালে রিকশা চালাচ্ছে।

দিনমজুর সফি উল্যা জানান, অভাবের কারণে বিশাল পরিবারের বোজা বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদিকে তার এক ছোট বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার ঋন নিয়ে দেনার

জালে আটকে পড়ে সফি উল্যা। উপয়ন্তর না দেখে দুই বছর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে শুক্কুর রিকশা চালিয়ে বাবার দেনা পরিশোধে সাহায্য করে। কিস্তির টাকা পরিশোধ হওয়ার পর ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাসে সে আবারও একই স্কুলে ভর্তি হয়। স্কুল ছাত্র শুক্কুর এখন রিকশা চালিয়ে নিজের টাকায় স্কুলের বেতন, বই-খাতা, ইউনিফর্ম বানানোসহ সকল খরচ চালিয়ে আসছে।

শুক্কুর জানায়, স্কুলের স্যারদের সহযোগিতা পেলে তার খুব ভালো লাগে। আর বাবার অসহনীয় কষ্ট দেখলে খুব খারাপ লাগে তার। সে পড়ালেখা করে একটি চাকুরি পেতে চায়। যাতে তার বাবাকে বৃদ্ধ বয়সে আর কষ্ট করতে না হয়। শুক্কুরের স্বপ্ন বড় হয়ে নিজের পায়ে দাড়িয়ে সংসারের হাল ধরবে সে নিজেই।

ভিভিটিসি টেকনিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশিদ শাহেদজানান, ছাত্র শুক্কুরের প্রতি সকল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। তিনি আরো বলেন ভবিষ্যতে শুক্কুরকে বিনাখরচে পড়ালেখার সুযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাবেন।

(ছবি আছে)

১০) পাঁচ হাজার শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত
কোম্পানীগঞ্জে ১৫ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই
ইকবাল হোসেন মজনু (নোয়াখালী):

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দুর্গম চরাঞ্চলের ১৫ টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় এ সব এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার বিদ্যালয় গমনেচ্ছু শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে করে সরকারের "সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রম এখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের বড়রাজপুর, ছোটরাজাপুর, উদয়রাজপুর; চরফকিরা ইউনিয়নের চরদিয়ারা বালুয়া, চরঘিনাদৌপা; মুছাপুর ইউনিয়নের ২নং চরধলী, চরমওদুদ, চরএনায়েত, উত্তর মুছাপুর, আদর্শগ্রাম; চরএলাহি ইউনিয়নের চরবালুয়া, দক্ষিণ চরএলাহি, চরকলমি, চরউমেদ ও চররমজান গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

০১ আগষ্ট ২০০৭ তারিখে সরেজমিনে ওইসব এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় বিদ্যালয় গমনেচ্ছু শিশুরা বিভিন্ন শিশুশ্রমের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। এরমধ্যে অনেকে নদীতে মাছধরা, ওয়েল্ডিং কারখানা, বিস্কুট বেকারী, ইটেরভাটা, রিকশাচালকসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। এতে করে ওইসব এলাকায় শিক্ষার হার দিনদিন শুন্যের কোঠায় নেমে আসছে।

চরএলাহির চরবালুয়া গ্রামের পোনামাছ আরোহণকারী আবুল কালাম (৪৫) বলেন, "আমরা গরিব মানুষ, আগে হেড়ে বাত তার হরে হোলাহাইন মানস করন। হোলা মাইয়ারা ইশকুলে জাওনেরতুন মাছ দইরলে

সংসারের রোজগার বালা অয়, আর ব'অইলেতো হেগুনরে এ কামই করি তো খাইতো অইবো" (আমরা গরীব মানুষ, আগে পেটে ভাত তার পরে ছেলে মেয়ে মানুষ করা। ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার চেয়ে মাছ ধরলে সংসারের রোজগার ভালো হয়, আর বড় হলে তারা এ কাজ করেই তো খেতে হবে)।

চরএলাহির চরকলমি গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় আট হাজার। এ গ্রাম থেকে চরএলাহি বাজারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুরত্ব আড়াই থেকে তিন কিলোমিটার। ওই গ্রামের রাবেয়া (১১), সুলতনা (০৮), রিয়াদ(১০), সোহাগ(১২), জাবের(০৮), রাসেল(০৯), রোজিনাসহ(১২) আরো অনেকে জানায়, "আংগো বাইতুন ইশকুল মেলা দুরে। হিয়ারলাই আনরা ইশকুলে যাই না। হিয়ারতুন গোবর টোকাই বানাইলে হইত্তোদিন ১৫-২০ টেয়া করি হাই"। (আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল অনেক দুরে। সে জন্য আমরা স্কুলে যাই না। তার থেকে গোবর খুজে লারকি বানালে প্রতিদিন ১৫-২০টাকা আয় হয়)।
এদিকে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এলাকাবাসির পক্ষ থেকে ৩৩ শতাংশ ভূমি সরকারকে প্রদানসহ কোনো ব্যক্তির নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ করতে হলে অতিরিক্ত তিনলাখ টাকা সরকারকে প্রদান করতে হবে।
চরএলাহী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইদ্রিছ মিয়া জানান, স্থানীয়ভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেও সরকারী নীতিমালার জটিলতার কারণে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভর হচ্ছে না। অন্যদিকে মুছাপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাহফুজ আলম বলেন, মুছাপুরের আদর্শগ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাবেক মন্ত্রীরা বার বার অঙ্গিকার করলেও বিগত ১০ বছরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ মুনির হোসেন খান বলেন-"বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতিমালা অনুযায়ী জনগনকে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধকরন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।"
উপজেলা শিক্ষা অফিসার গোলশান আক্তার জানান, বিদ্যালয় বিহীন গ্রামের তালিকা শিক্ষা কামিটির সুপারিশসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।
(ছবি আছে)

১১) পৃথিবীর আলো দেখতে চায় দুই সহদর কার্তিক ও পলাশ

নাসির উদ্দিন শাহ নয়ন (নোয়াখালী):

সমবয়েসী বন্ধুরা যখন জগতের নৈসর্গিক শোভা বা পৃথিবীর আলো আধারির খেলা প্রত্যক্ষ করছে ঠিক তখন অন্ধত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত দুই সহোদর কার্তিক ও পলাশ কে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে শুধু প্রথিবীর গল্প শুনে। নোয়াখালী সদর উপজেলার বিনোদপুরের জালালিয়া গ্রামে তাদের বাস। পলাশ পার করেছে জীবনের আঠারোটি বসন্ত আর কার্তিক পার করেছে পনেরোটি বসন্ত।
তাদের বাবা নিতাই চন্দ্র পাল মাটির হাড়িপাতিল তৈরির কারিগর আর মা মালতী রানী পাল ও আছেন এ পেশায়। কার্তিক ও পলাশের অবস্থা সম্পর্কে তাদের মায়ের কাছে জানতে চাওয়া হলে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। যেন বুকের ভেতর জমাট কষ্টের দীর্ঘশ্বাসটুকু ফেলার জন্য সময় চাওয়া। তারা জানায়,

জন্মের পর থেকেই তাদের এ অবস্থা । মালতী রানী বলেন-"কেন এমন হলো আমরা জানিনা ভগবান জানেন ।"
পলাশ জানায়, সে দেখতে না পেলেও সব কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে । তবে ভীষন ইচ্ছে করে দেখতে । পলাশের সাথে কথা বলার এক ফাঁকে নিতাই চন্দ্র ও চলে আসে । ছেলেদের কথা জিজ্ঞেস করতেই তার দুচোখে স্রোতধারা বইতে থাকে । কার্তিক তখন বাবার হাত ধরেই দাঁড়ানো ।
ছেলেদের চিকিৎসা বিষয়ে তিনি বলেন -" মাটির হাড়িপাতিল তৈরির কাজ করে তিন বেলা ওদের পেটপুরে খেতে দিতে পারিনা আর চিকিৎসা তো দূরের কথা । তবুও অনেক জায়গায় ওদের নিয়ে গেছি । ডাক্তার বলেছে একমাত্র কেউ যদি কর্নিয়া দান করে তবেই তাদের চোখ ভালো হতে পারে । কিন্তু কে দেবে ?"
কথা বলতে বলতে বিকেল হয়ে যায় । পলাশ গান গাইতে গাইতে হেটে চলে মেঠোপথ ধরে । এ গানের মধ্যেই হয়ত আছে পলাশের না বলা কষ্টের ধ্বনিগুলো ।

১২) শাশুড়ির নির্মম নির্যাতনের শিকার এক গৃহবধু
নাসির উদ্দিন শাহ নয়ন (নোয়াখালী):
যৌতুকের পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে না পারায় দশ মাসের অন্তসত্বা গৃহবধু হাসিনা আক্তার (৩০) স্বামী ও শাশুড়ি কর্তৃক মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হয়েছে । গরম পানি ঢেলে ঝলসে দেয়া হয়েছে হাসিনার শরীর । ঘটনাটি ঘটেছে ৮ মে নোয়াখালী সদর থানার সোন্দলপুর ইউনিয়নের নলুয়া গ্রামে । হাছিনার স্বামী নিজামুদ্দিন ও শাশুড়ি সুফিয়া খাতুন দীর্ঘদিন থেকে তাকে যৌতুকের জন্য চাপ দিচ্ছিল ও শারিরিক নির্যাতন ও করছিলো । ঘটনার দিন তারা হাছিনাকে আবারও টাকা এনে দিতে বলে । সে তার বাবার অক্ষমতার কথা বলে এত ক্ষুব্ধ হয়ে শাশুড়ি সুফিয়া খাতুন চুলার উপরে রাখা এক পাতিল গরম পানি হাছিনার শরীরে ঢেলে দেয় ।
এত তার শরীরের বেশিরভাগ স্থান মারাত্মক ঝলসে যায় । পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভতি করানো হয় । হাসপাতালে আনার পর হাসিনা একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয় । একদিকে ঝলসে যাওয়া শরীরের যন্ত্রনা অন্যদিকে প্রসব বেদনা দুই মিলে হাছিনার কষ্টের দাবানল দাউদাউ করে জ্বলে উঠে । হাসিনার সাথে কথা বলার সময় সে সন্তানের দিকে তাকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে । কোনো কথা বলেনা । হাসিনা যাতে বিষয়টি নিয়ে কোনো মামলা দায়ের না করেন তার তার স্বামীর ভাড়া করা লোকজন নানাভাবে হুমকী দেয় । কি হবে হাসিনার এ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন কর্তব্যরত নার্স ।

১৩) জালালিয়া গ্রামের নারীরা গর্ভকালীন পুষ্টিহীনতার শিকার ।
নাসির উদ্দিন শাহ নয়ন (নোয়াখালী) :
নোয়াখালীর জালালিয়া গ্রামের নারীরা গর্ভকালীন সময়ে নানা ধরনের জটিলতায় ভোগে । অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্রই এর জন্য দায়ী । এ গ্রামে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে গর্ভবতী নারীদের সব রকম সহযোগিতা এখনই প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকে । সরেজমিন জালালিয়া গ্রাম পরিদর্শন, ভুক্ত ভোগে নারী ও তার পরিবারের সাথে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে ।

জালালিয়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র । এখানকার নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে কিছুই নেই । অপরিষ্কার পরিবেশের মধ্যেই তাদের বসবাস । গর্ভকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে গেলে কুলসুম (৩৫) বলে- আমরা হারাদিন নাই কাম কাজে শরীল লই চিন্তা করনের টাইম নাই ।" তাদের ধারণা স্বাস্থ্য নিয়ে ভাববে ধনীরা, শিক্ষিতরা । যারা দরিদ্র তাদের শরীর বিষয়ক ভাবনার অবকাশ নেই । অরেকজন সন্তান

সম্ভবা নারী আলেয়া বলেন-"একজন গর্ভবতী কইত হারে তার কত কষ্ট কিন্তু আংগো হোড়া কয়াল এত কষ্ট লইও স্বামীর সংসারে অনেক কাজ কইত্ব হয় ।"
এ বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মী সাহিনা আক্তার বলেন-"এ সময়ে খেতে ইচ্ছে না করলেও প্রচুর পরিমানে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার । ভারি কাজ একদমই করা উচিত না । এত জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে ।"

গর্ভবতী মায়েদের খাদ্য গ্রহণে-র বিষয়ে জালালিয়া গ্রামে আছে অনেক কুসংস্কার । এ বিষয়ে আলাপকালে ষাটোর্ধ জুলেখা বেগম বলেন– "হোয়াতি মাইয়া হোলার এত বেশি খানার কি দরকার । বেশি খাইণে হ্যাডের হোলাহাক্ষনি বড় হইয়া যায়, অইতে কষ্ট অয় ।"

কুসংস্কার সম্পর্কে সন্তানসম্ববা নারী ছামেনা খাতুন বলেন-"আমাকে আমার শাশুড়ি মৃগেল মাছ খেতে দেয়না । উনি বলেন মৃগেল মাছ খেলে পেটের বাচ্চার মৃগী রোগ হয় ।" ইউপি সদস্য রওশন আক্তার লাকি বলেন-"গর্ভবতী মায়েদের খাদ্য বিষয়ে এ গ্রামে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে । এলাকায় এখন স্বাস্থকর্মীরা কাজ করছেন ।
কয়েকজন জানান, এখনও কিছু বয়স্ক মানুষ আছেন যারা নানা ধরনের কুসংস্কারকে পুষে রাখছেন । যেমন মুরব্বীরা বলেন-কলা খেলে শিশুর ঠান্ডালাগে, ইলিশ মাছ ও শাকসবজি খেলে বুকের দুধ পান করা শিশুর পেট খারাপ হয় ইত্যাদি ।
এসব ধ্যান ধারনা পাল্টাতে পারে সব স্তরের সানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে । আর এ কাজটি করতে পারেন মূলত স্বাস্থকর্মীরা পাশাপাশি গ্রামের অন্যান্য সচেতন লোকজন বলে মনে করছেন অনেকেই ।

১৪) বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে সাদ্দাম
রনজিৎ চন্দ্র দাস (নোয়াখালী) :
"ইচ্ছা আছে কিন্তু উপায় নেই, স্কুলে যাবার সময় পাব কোথায় আর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবে কে ? নিজেন নাম লিখতেও পারিনা - কথাগুলো বলেন নোয়াখালী সদরের সেনবাগ হোটেলে চাকুরিরত বয় সাদ্দাম হোসেন (১৪) ।
সেনবাগ শহরের নামকরা তাজনাহার হোটেলে গ্লাসবয়ের কাজ করে সে । বাবা মারা গেছে সাদ্দামের ছোটবেলায় । মা গৃহিনী আর বড়ভাই রিক্সা চালিয়ে প্রতিদিন ৮০-৯০ টাকার মত পায় । তবে সবদিন রিক্সা চালায়না । সাদ্দাম হোটেলে কাজ করে পায় প্রতিদিন ২৫ টাকা । আর যদি কোনো গ্লাস ভেঙ্গে যায় সাদ্দামের কারনে তবে ১০ টাকা কেটে রাখা হয় বেতন থেকে । এভাবে অন্যান্য জিনিস ভাঙ্গলেও জিনিসের দাম অনুযায়ী টাকা কাটা হয় । কখনও কখনও কাজ করতে দেরী হলে মালিকের চর থাপ্পর ও খেতে হয় । ভোর ৫ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় । তবে দুপুরের পরে কাস্টমার যখন কম থাকে তখন এক ঘন্টার ছুটি নেয়া যায় । বেশির ভাগ রাত হোটেলেই কাটে সাদ্দামের । প্রতিদিন যা টাকা পায় তা সংসারে দিয়ে দেয় । বাকি আরও কিছু টাকা সে নিজে জমানোর জন্য রাখে । তার আশা এভাবে একদিন অনেক টাকা হবে । তখন আর তার হোটেলে বয় এর কাজ করতে হবেনা । সে বিদেশে যাবে এটাই তার একমাত্র স্বপ্ন ।

১৫) নিজে কষ্ট করে ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতে চায় জাবেদ
রনজিৎ চন্দ্র দাস (নোয়াখালী) :
রিকশা চালক জাবেদ হোসেন (১৫) । বাড়ি তার নোয়াখালীর সেনবাগের অর্জুন তলায় । জাবেদের বাবা রিক্সা চালক ছিলেন কিন্তু এখন অসুস্থ থাকায় আর রিক্সা চালাতে পারেননা । আর এ অবস্থায় সংসারের

বড় ছেলে হিসেবে জাবেদকে দায়িত্ব নিতে হল। রিক্সা চালিয়ে সে পায় প্রতিদিন ৭০-৮০ টাকা। এ টাকা দিয়ে চলে তাদের সংসার, ছোট ভাইবোনদের পড়াশুনা।
বাবা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে জাবেদ এ গুরু দায়িত্ব পালন করছে। জাবেদ বলে-"আমি যদি রিক্সা না চালাই তবে বাসার সবার না খেয়েই থাকতে হবে।" রিক্সা চালাতে খুব কষ্ট হয় জাবেদের। তার উপর যাত্রীদের নানা কথা শুনতে হয়। প্রথম প্রথম বেশি খারাপ লাগত। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। জাবেদ একদিনের কথা মনে করে বলে সেদিন সে এক যাত্রীকে নিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। যাত্রী তাকে অনেক মারধর করল। শেষে পাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করল। তারপর থেকে সে সতর্কতার সাথে রিক্সা চালায়। জাবেদের এখন আর নিজেকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন নেই। তার স্বপ্ন ঘিরে আছে থার ভাই বোনেরা। ওদের মানুষের মত মানুষ করতে পারলেই তার শ্রম সার্থক হবে বলে সে মনে করে।

১৬) ইয়ানুর সংসার নিয়ে সুখী হতে চায়

রনজিৎ চন্দ্র দাস (নোয়াখালী):

"রাইচ মিলে ধান সিদ্ধ করতে গিয়ে এক হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে হয় আর আগুন দিতে হয় চুলার মধ্যে। অন্যহাতে এক বছরের ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াতে হয় "- কথাগুলো বললেন রামগতির আলেকজান্ডারের ইয়ানুর আক্তার।
সেনবাগ শহরের মাঝামাঝি জায়গায় খায়রুল আলমের রাইসমিল। এখানেই কাজ করে সে। দুই ছেলে এক মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে তার সংসার। স্বামীর একার আয়ে সংসার চলেনা। রাইচ মিলে কাজ করে জীবন চালানোর স্বপ্ন দেখেন তিনি। মাঝে মধ্যে বাড়ির মানুষের সাথে দেখা করতে বছরে ৩-৪ বার বাড়িতে যান তিনি।
তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত কাজ করে এক বেলা খাওন পাই আর ২০-২৫ টাকা পারিশ্রমিক পাই। এ টাকা দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর। তার মধ্যে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করাবেন কিভাবে ? তবু ও তিনি সুখী হতে চান এ সামান্য কাজ নিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আর একটু বেতন বাড়লেই ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন তিনি।

১৭) নিজাম চায় উপোসহীন জীবন আর রাতের নিশ্চয়তা

সাজিয়া ফেরদৌস পান্না (নোয়াখালী):

ছোট্ট নিজাম উদ্দিন। আটে পা দিয়েছে সবেমাত্র। হাতে চটের ব্যাগ। সারাদিন মাইলের পর মাইল পথ হেটে কাগজ টোকায় সে। যে বয়সে সতীর্থদের সাথে খেলবে, স্কুলে যাবে, নতুন স্বপ্ন দেখবে ঠিক সে বয়সে নিজাম বেছে নিয়েছে টোকাইয়ের কাজ।
নোয়াখালীর অশ্বদিয়ার আলপুির গ্রামে থাকে নিজাম। দু ভাই তিন বোনের সংসার। বাবা রিকশা চালায় আর মা অসুস্থ। বড় ভাইবোন মানুষের বাড়িতে কাজ করলে ও সংসার চলেনা। বাধ্য হয়ে তাকে হতে হয়েছে টোকাই। প্রতিদিন সকালে বের হয়ে বিকেল পর্যন্ত কাগজ, কাঁচ, বোতাম ভাঙ্গা কুঁড়ায়। সন্ধ্যায় মালিকের দোকানে বিক্রি করে ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরে নিজাম। কাগজ প্রতিকেজি ৬ টাকা দরে, কাঁচ ৮ টাকা দরে, প্লাস্টিক ৬ টাকা দরে বিক্রি করে প্রতিদিন আয় হয় ৫০-৬০ টাকা।
বয়স কম হলেও জীবন যাপনে সে শিশু হয়ে থাকতে পারেনি। সংসারের দায়িত্ব পড়েছে ঘাড়ে। পরিবর্তন এসেছে কাজকর্ম ও আচার আচরনে। শিশু মাথায় জীবিকার চিন্তা। সারাদিন কয়েকটি টাকার জন্য ব্যস্ত থাকা। কারন সন্ধ্যায় এ টাকা বাবা মায়ের হাতে তুলে দিতে না পারলে ভাত জুটবেনা। অল্প বয়সে কাজ করো কেন জানতে চাইলে নিজামের উত্তর- "আমরা গরীব, কাম না কইরলে খামু কী ? হড়তে তো চাই কিন্তু কামের লাই স্কুলে যাইতে হারিনা। আঙ্গো পড়ালেহারখরচ কে চালাইবে?"

১৮) জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছেনা মিজান

ফয়জুল ইসলাম জাহান (নোয়াখালী) :

এক সময় তারও দূরন্ত কৈশোর ছিল । হাতে বই নিয়ে পায়ে হেঁটে স্কুলে যেত । খেলাধূলায় মেতে থকত অনাবিল ছন্দে । হঠাৎ করে সেই স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন ঘটল । মোঃ মিজান যার কথা বলছি । সেই মিজান এখন ২০ বছরের শারীরীক প্রতিবন্ধী যুবক । প্রায় ৯ বছর আগে সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয় । এই ঘাতক রোগের নির্মমতায় তার দুপায়ের শক্তি হ্রাস পায় এবং স্বাভাবিক চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায় । চার ভাই দুবোনের মধ্যে মিজান সবার বড় । আড়াই বছর অআগে বাবা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরন করে । এর পর তার মাও রোগে শোকে, সংসারের চিন্তায় বৃদ্ধা হয়ে পড়েন ।

এখনো তিনি সংসারের ঘানি টেনে চলছেন । কিন্তু এতগুলো মানুষের ভরন পোষনের ব্যবস্থা করা তার একার পক্ষে সম্ভব হয়না । তাই মিজানকেও রুজি রোজগারের চিন্তা করতে হয় । যা তার পক্ষে কষ্ট সাধ্য হয়ে দাড়ায় শারীরীক প্রতিবন্ধকতার জন্য ।

নোয়াখালীর মাইজী হাউজিং এস্টেটের মোড়ে মিজানের ছোট্ট বাক্সের দোকান । পান সিগারেট আর টুকিটাকি অন্য জিনিসপত্র । এ সামান্য ব্যবসায় তার দৈনিক আয় একেবারে নগন্য ।

পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে সে । সামান্য আয়ে তার সংসারের স্বচ্ছলতা আসেনা । অবার অন্য কিছু করার সামর্থও তার নেই ।

অর্থের অভাবে যেখানে সংসারে দুবেলা অন্নের সংস্থান করা সম্ভব হয়না সেখানে অন্য চাহিদাগুলো কেবল দ্বীর্ঘশ্বাস বাড়ায় । এরপরও ছোট ভাই ও দু বোনকে কোনোভাবে পড়াশুনা করালে অন্য দু ভাই তা করতে পারছেনা । দুই বছর আগে পাক্ষিক লোক সংবাদে তাকে নিয়ে লেখার পর সে একজন এনজিও কর্মকর্তার কাছ থেকে একটি হুইল চেয়ার পায় । যা দোকান থেকে বাড়িতে আসা যাওয়ার পথে ব্যবহার করে ।

অসহায় যুবক মিজান সরকারি বা বেসরকারি ভাবে সহযোগিতা প্রত্যাশী । তার বিশ্বাস কেউ যদি এগিয়ে আসে তাহলে তার পায়ের চিকিৎসা হবে, সংসারের অভাব দূর হবে, তার মায়ের মুখে হাসি ফুটবে । ভাই বোনেরা সবাই পড়াশুনা করতে পারবে । সেই সহযোগী দুটো হাতের প্রত্যাশায় মিজান দিন গুনছে ।

১৯) টোকাই শিশু ওরা / ওদের পথই আপন ঠিকানা

ফয়জুল ইসলাম জাহান (নোয়াখালী) :

টোকাই, ছিন্নমূল শিশু, পথশিশু যে নামেই ডাকা হোকনা কেন ওদের পথই বাড়ি, পথই ঘর । শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট, হোটেল রেস্টুরেন্ট, অফিস আদালতের সামনে ওদের বিচরন, দিনরাত জীবন যাপন । এসব শিশুরা বেড়ে উঠছে অধিকার বঞ্চনার অনিশ্চিত জীবনকে সঙ্গী করে । আশ্রয়হীনতা, দরিদ্রতা, জন্ম পরিচয় না থাকার কারনেই ওরা পথশিশু হিসেবে গন্য হচ্ছে ।

মৌলিক অধিকার বঞ্চিত এসব শিশুরা দেশের বোঝা হয়ে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মাঝে বেড়ে উঠছে। পরবর্তীতে তারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এর মত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় এসব শিশুদের পূর্নবাসন, তাদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা গেলে এসব শিশুরা হয়ত সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারবে। নোয়াখালী জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর, উন্নয়ন সংস্থা ও শিশুদের সাথে কথা বলে এ মতামত পাওয়া গেছে ।

নোয়াখালী জেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে এসব ছিন্নমূল শিশুদের দেখা যায় । রমনা ফাস্ট ফুড ও স্বাদ রেস্টুরেন্ট এর সামনে প্রতিদিন গড়ে ১০-১২ জন শিশুকে ভিক্ষুক রূপে দেখা যায় । ওদের বয়স ৫ থেকে

১২ বছরের মধ্যে। রেস্টুরেন্টে ঢোকার মুখে ওরা কারও হাত কারও পা জড়িয়ে ধরতে দেখা যায়। স্বাদ রেস্তরার ম্যানেজার ইকবাল বলেন মালিকের নির্দেশে প্রতিদিনের অতিরিক্ত খাবারগুলো ওদের দেয়া হয়।
আনোয়ার (৮) জানায় তার বাবা তার জন্মের পর আরেকটি বিয়ে করে তার মাকে ফেলে চলে যায়। তার মা চর এলাকা থেকে তাকে নিয়ে শহর এলাকায় আসে কাজের সন্ধানে। তার মা অন্যের বাসায় কাজ করে। রাতে ঘুমায় ওরা সার্কিট হাউস দীঘির পশ্চিম পাড়ের একটা ঝুপড়িতে।
রানী (১০) ও মনি (৬) দু বোন ওরা । বাবা নিখোঁজ। মা অসুস্থ। দু বোনই ভিক্ষা করছে জীবন বাঁচানোর তাগিদে। অবুঝ মনি টাকা না পেলে বড় বোন রানী তাকে মারে বলে অভিযোগ মনির।
হাসনাত (১২) প্লাস্টিক, কাঁচ টোকায়। পরে তা মালিকের দোকানে বিক্রি করে। বাকা মা কারও কথা মনে পড়েনা হাসনাতের। কখনও রেলস্টেশনে কখনও আবার মাইজদী কোর্টের বারান্দায় ঘুমায়। হাসনাত জানায় তার মত এ রকম ১৫-২০ জন রেলস্টেশনে রাতে থাকে আর কোর্টের বারান্দায় থাকে ১০-১৫ জন। লেকের পাড়ে বা গাছের নিচেও ঘুমায় কোনো কোনো রাতে।
এসব শিশুদের সাথে কথা বলে জানা গেছে ওরা পেট ভরে ভাল খাবার খেতে পায়না ঈদ কোরবানী ছাড়া।
ওদের সবার একই কথা ওরা থাকার জায়গা চায়, তিনবেলা খাবার চায়, কেউ কেউ পড়ালেখাও করতে চায়। কিন্তু কে এগিয়ে আসবে এসব ছিন্নমূল শিশুদের জন্য?

২০) নারীদের পরিবেশ সচেতনতা

ফয়জুল ইসলাম জাহান (নোয়াখালী) :

"আমাদের সচেতনতা নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে"- এক ধরনের গর্ববোধ নিয়ে কথাগুলো বলেন গায়ত্রী রানী দাস (২৭)। অথচ আগে পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা তো দূরে থাক পরিবেশ কি তাও জানতেন না তারা। এখন নিজেরা মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে সচেতন করার কাজটিও তারা করেন। নেপালী রানী (৩১) জানান, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ও স্থানীয় সংস্থা প্রান এর সহযোগিতায় দুই মাসের পরিবেশ সচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক উঠান বৈঠক কার্যক্রম পরিচালিত হয় জেলে পাড়ায়।
জেলে পাড়ায় প্রায় ৪০-৪৫ টি পরিবারের বাস। তাদের প্রধান পেশা মাছ ধরা। পাশাপাশি কৃষি কাজও করে।
পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে রেখা রানী দাস জানান- সংস্থার লোকজন তাদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে পরিবেশের নানা দিক নিয়ে অলোচনা করেন। মাটি দূষন, পানি দূষন, বায়ু দূষন ও দূষন রোধ সম্পর্কেও জানেন তারা।
শ্যামলী রানী বলেন- "পারবেশের আরও গুরুত্বপূর্ন দিক যেমন আর্সেনিক, জীববৈচিত্র, পরিবেশের ভারসাম্য, বনভূমি ইত্যাদি বিষয়ে এখন আমাদের যথেষ্ট ধারণা আছে।
জেলে পাড়ার আরও নারীর সাথে আলাপ কালে জানা যায় এ আলোচনা তাদের অনেক উপকারে এসেছে। তারা এখন অনেক বিষয়ে আগের চেয়ে বেশি সচেতন। কোনোভাবেই তারা তাদের দ্বারা পরিবেশের কোনো ক্ষতি সাধন করতে চায়না।

২১) অনিশ্চয়তার মাঝে বেড়ে উঠছে পথশিশুরা

মর্জিনা আক্তার (নোয়াখালী) :

নোয়াখালী জেলা শহরে অনেক শিশুকে দেখতে পাওয়া যায় ছেড়া জামা কাপড় গায়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কেউ কাগজ টোকায়, কেউ কাঁচ টোকায়, কেউ ভিক্ষা করে এভাবে বেঁচে আছে ওরা।

হোটেলের প্রবেশমুখে বেশির ভাগ সময়ে সকাল থেকে রাত অব্দি ওদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একজন বকুল বেগম (৯)। জন্মের পরই তার বাবা মাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে। ছোট বেলায় তার ইচ্ছে ছিলো পড়াশুনা করবে। কিন্তু সে ইচ্ছে পূরণ হলনা তার।
ছিন্নমূল শিশুদের আরেকজন সুমন (১২) এর সাথে কথা বলে জানা যায় তার বাবা নেই। মা হোটেলে মসলা বাটে। সুমন এমনি ঘুরতে থাকে। কখনও কেই কিছু দিলে খায়। আবার হাত পেতে টাকা চায়ও যখন বোঝে চাইলে পাওয়া যাবে। সুমন আর তার মা যখন যেখানে পারে রাত কাটায়।
হোটেল মালিক সূত্রে জানা গেছে তারা এসব শিশুদের মাঝে মধ্যে খাবার দেয় বিনামূল্যে। ওদের সবাইকে চেনেওনা তারা। তবে কয়েকজন যারা সবসময় আসে তাদের দেখে মায়া পড়ে গেছে।
ছিন্নমূল শিশুদের সম্পর্কে এনজিও কর্মী নুরজাহান বেগম বলেন-"সরকারি বেসর কারিভাবে তাদের ন্য কোনো উদ্যোগ নিলে এসব শিশুদের নিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।"

২২) সেলাই এর কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন যে গ্রামের নারীরা

সাজিয়া ফেরদৌস পান্না (নোয়াখালী) :

নোয়াখালী পৌর এলাকার মাইজদী গ্রামের পাটওয়ারী বাড়ির নারীরা ঘরে বসে কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায় এ গ্রামে প্রায় ২৫০ টি পরিবার রয়েছে। বেশির ভাগ লোকই নিরক্ষর। পুরুষদের বেশিরভাগ রিক্সা ও ভ্যান চালায়। কেউ ক্ষেত খামারে বদলা দেয়। নারীদের মধ্যে অধিকাংশ হস্ত শিল্পের কাজ করে তার স্বামীর পাশাপাশি আয় করে সংসারের কাজে লাগায়।
রোকেয়া (৪০) স্বামী ভ্যান চালায়। যা আয় হয় তাতে সংসার চলেনা। অনেক কষ্ট করেছেন রোকেয়া তার জীবনে। এখনও যে খুব ভাল আছেন তা নয়। তবুও কিছুটা সহযোগিতা করতে পারে স্বামীকে। রোকেয়া জামা সেলাইয়ের কাজ করেন। কামিজের জন্য সে নেয় ৫০ টাকা, সালোয়ারের জন্য ২০ টাকা নন আর বাচ্চাদের জামা ৩০-৪০ টাকায় তৈরি করে দেন। এভাবে আগের থেকে কিছুটা ভাল অবস্থায় আছেন তারা।
গৃহবধু শিল্পী (৩৫) তার স্বামী দিনমজুর। স্বামীর একার রোজগারে ৭/৮ জনের সংসার চলেনা। তাই সে পাশের গ্রামের লিলি বেগমের কাছ থেকে টুকটাক সেলাই শেখেন। এরপর ঘরে নিজেদের কাপড় বানানো থেকে শুরু করেন এবং একটা সময়ে আশে পাশের লোকদের তার কাছে সেলাই করতে দেয়ার অনুরোধ করেন। তার পর থেকে আর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কম টাকায় নানা ডিজাইনের কারুকাজ করে দেয় দেখে তার কাছে সবাই আসে। তার কথায়- "আমি এখন ভালো আছি, কোনো প্রশিক্ষণ নিতে পারলে আর ও ভালো করতে পারতাম।"
শিল্পী ও রোকেয়ার মত এ গ্রামের আরও অনেক নারী সেলাই এর কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

২৩) দারিদ্র বাঁধা হয়ে দাড়ায় চরের শিশুদের পড়ালেখায়।

আবদুশ শাকুর হান্নান (নোয়াখালী) :

"মুহাম্মদপুর স্কুলে ক্লাশ টু লাগাত হড়ছি। হিয়ার হর বাবা আলআমিন বাজারে গফুরার জার দোকানে কামে লাগাইছে"- কথাগুলো বলে রুবেল (৮)। রুবেলের বাড়ি নোয়াখালীর সুবর্ন চর এলাকার চর ওয়াপদার মোহাম্মদপুর গ্রামে। বাবা মোঃ মিজানুর রহমান তিন বছর যাবত বেকার। সে খেয়েদেয়ে মাসে ৩০০ টাকা বেতনে চাকুরী করে। মাস শেষে বেতন পুরোটাই তুলে দেয় বাবার হাতে। পাঁচ ভাইবোন ওরা। বড় ভাই শহরে একটি বাসায় কাজ করে। তাদের দু ভাইয়ের রোজগারে চলে পুরো সংসার। স্কুলে যেতে ভাল লাগে রুবেলের আরও ভাল লাগে সহপাঠিদের সাথে খেলতে। কিন্তু সব ভাল লাগার জলাঞ্জলি দিয়ে আজ রুবেল চায়ের দোকানে বাসন মাজে।

চর বৈশাখী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বাদাম বুট বিক্রি করে মোঃ আব্দুর রহিম (১২)। বাড়ি তার ওয়াপদা ইউনিয়নের আজাদ নগর গ্রামে। তার ছেলে বেলায় মা মারা যায়। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে। সংসারে তার সৎ মা। বাবা রফিক উল্যাহ অসুস্থ তাই তাকে বাদাম বুট বিক্রি করে সংসার চালাতে হয়। তার বয়েসী অন্যছেলে মেয়েরা যখন থাকে ক্লাশরূমে তখন সে স্কুলের মাঠে বসে তাকিয়ে দেখে। রহিমের কথায়–"যহন দেহি অরা হরা লেহা কইরছে তহন আর ভাললাগেনা। বেইচতে ইচ্ছা হরেনা।"
রুবেল রহিমের মত একই কথা জানালো বাজারের তরকারি বিক্রেতা সুজন (১২)। তার পরিবারেও ছয় জন সদস্য। বাবা মোঃ মহিউদ্দিন তরকারি বিক্রি করেন। কিন্তু একা সব সামলাতে পারেননা বলে তাকে দোকানদারি করতে হয়। সে বলে- "আমার পড়ালেখা কইরা বিমান চালাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বাবা আমার কথা পাত্তাই দেয়না।" মহিউদ্দিন জানান, সংসারে তারা ছয়জন। একা সামলাতে পারেননা বলে ছেলেকে দোকানে রেখে দিয়েছেন। ছেলে তাকে বলে পড়ালেখা শেখার কথা কিন্তু অভাবের কারনে তা পেরে উঠছেন না।
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মোঃ নুরনবী জানান, এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় বেশ আগ্রহী কিন্তু দারিদ্র তাদের এ আগ্রহকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। চরবৈশাখী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অনীল চন্দ্র দাস বলেন-"দরিদ্রতার কারনে অনেক বাবা মা তাদের সন্তানদের স্কুলে আসতে দেয়না। তবে মৌসুম অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ওঠানামা করে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে ও ধান কাটার মৌসুমে উপস্থিতির হার একেবারে কমে যায়।
চর ওয়াপদা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনির আহমেদ জানান, এ এলাকায় বেশির ভাগ মানুষ হতদরিদ্র। দারিদ্রের কারনে এ এলাকার অধিকাংশ শিশুর কাজকর্ম করে খেতে হয়। ইউনিয়নে প্রায় ৮ হাজার স্কুলে গমোনপোযোগী শিশু রয়েছে। এখানে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। আর অভিভাবকরা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াতে রাজী নয়।

২৪) নিঝুমদ্বীপে শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত

ইসমাইল হোসেন কিরন (নোয়াখালী) :

"আই গরু চরাই, ইস্কুলে যাইনা। পাশে দাঁড়ানো তার ভাই বেলালকে ইংগিত করে বলে ভাই ইস্কুলে যায়। বেলার নিঝুম দ্বীপ রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র। নিয়মিত স্কুলে যায় কিনা জিজ্ঞেস করতেই সপ্রতিভ হয়ে উত্তর দেয় বেলাল মাঝে মাঝে যায়। অন্য সময়ে দুভাই মিলে গরু চরায়। নিঝুম দ্বীপে নামার বাজারে সেলাইয়ের কাজ করে মিলাদ (১২)। পরিবারে বাড়তি আয়ের যোগান দিতে সে বই খাতার পরিবর্তে হাতে তুলে নিয়েছে সুই সুতা।
নোয়াখালীর সর্ব দক্ষিনের জনপদ নিঝুম দ্বীপের শিশুদের অবস্থা এমনই। কোন আগন্তুক দেখলে দলবেধে ভীড় করে ওরা। দ্বীপের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ও স্কুলের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে এখানে স্কুল গমনোপোযোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ২২ শ। যাদের মধ্যে ২৫ ভাগ স্কুলে ভর্তি হয়না। যারা ভর্তি হয় তাদের অর্ধেকের বেশি শিশু স্কুলে যায়না।
নিঝুমদ্বীপে ২ টি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবং দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ৫ টি স্কুল রয়েছে যাতে ১ম থেকে ৩য় শ্রেনী পর্যন্ত পড়ানো হয়। দ্বীপে একটি মাত্র নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আখতার হামিদ জানালেন নিজেরা স্বেচ্ছা শ্রমে কাজ করছেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছে বেতন চাইলে স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয় তারা। পরীক্ষার ফি ও দেয়না। তখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ধরে আনতে হয়। ৫ম শ্রেনী পাশ করা ছাত্র ছাত্রীদের ২৫ শতাংশের বেশি ঝরে যায়।

(ছবি আছে)

২৫) কৃষিকাজে নারীর বৈষম্য

ইসমাইল হোসেন কিরন (নোয়াখালী) :

গ্রামীন নারীদের কাজের ধরন পাল্টে গেছে। ঘর গৃহস্থলির পরিচিত আঙিনা ছেড়ে এখন তারা সরাসরি মাঠে নেমে কৃষি কাজ করছে। তবে এসব কাজে নারী শ্রমিকরা মজুরী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ভূমি মালিকদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। নিজেরা সংগঠিত না থাকার কারনে মজুরী নির্ধারন ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা। হাতিয়া উপজেলার চর ইশ্বর, রাজার হাওলা, চৈতন্য বাজার এবং লক্ষীদিয়া এলাকা ঘুরে নারী শ্রমিক, ভূমি মালিক ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।

দ্বীপজেলা হাতিয়ায় মেঘনার ভাঙ্গনের ফলে শত শত পরিবার নিঃস্ব হয়েছে। এতে উপার্জনের স্থায়ী উপায় বন্ধ হয়ে গেছে অনেকেরই। এ পরিস্থিতিতে শুধু পুরুষের আয়ে সংসার চলবেনা এ সত্য বুঝে গেছে সবাই। তাই নারীরা এসেছে কাজে। এ জনপদে কৃষি হচ্ছে শ্রমবিনিয়োগের বড় ক্ষেত্র। কর্মসংস্থানের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা এখানে গড়ে ওঠেনি। এলাকার ইউপি সদস্য চাপা রানী দাস বলেন- "এলাকার ৫০ ভাগ নারী কৃষিকাজে জড়িত। অভাবী নারীরা কোনো কাজ না পেয়ে ক্ষেতে কাজ করছে।"

নারী শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার ছুঁয়ে যেতে পারে জানালেন নারী শ্রমিকদের সর্দার বিমলা দাস। আবার চৈতন্য বাজার এলাকার কৃষক জয়নাল আবেদিন জানালেন নারী শ্রমিকদের সংখ্যা আগাই হাজার ছাড়াবে। যে যে মন্তই করুক না কেন কৃষিকাজে এখানকার নারীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। মূল ভূখন্ডে কৃষিকাজে নারীদের উপস্থিতি তেমনভাবে চোখে পড়েনা।

নারী শ্রমিক অনিলা দাস (৫৫) জানালেন আগে এরকম ছিলোনা। ১৯৭০ এর বন্যার আগে মাঝে মধ্যে হয়ত দু'একজন নারীকে চোখে পড়ত। কিন্তু ৫/৬ বছর ধরে প্রায় সব ঘরের মহিলারা কৃষিকাজে নেমেছে। কেন হঠাৎ এ পরিস্থিতি জানতে চাইলে স্থানীয় কাজী বাজারের প্রতিষ্ঠাতা কাজী নজরুল আলম বলেন–"এনজিও কার্যক্রমের প্রভাবে নারীদের চোখের শরম উঠে গেছে। বিশেষ করে ১৯৯১ কালের বন্যার পর হাতিয়াতে অনেকহুলো এনজিও কাজ করছে। তারা তাদের কাজে নারীদের প্রাধান্য দিয়ে আসছে।"

অন্যদিকে বৃদ্ধ কৃষক আবেদ জানান মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে দেখাদেখি। পাশের বাড়ির একজন যখন কাজে যায় তখন ঘরে অভাব নিয়ে মহিলারা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনা।

নারী শ্রমিক সীতা মজুমদারের কলেজে পড়ুয়া ছেলে প্রদীপ মজুমদার বলেন-"প্রয়োজনের তাগিদেই একের পর এক নারী নেমে পড়েছে মাঠে। তাদের চাহিদা ও উৎসাহই মূলত এর পেছনে কাজ করেছে।"

নারী শ্রমিক প্রার্থনা দাস বললেন -"এলাকার পুরুষ শ্রমিকরা বেশি মজুরী পাওয়ার জন্য সারা বছর ফেনী, চট্টগ্রামে কাজ করে। তাই এখানে শ্রমিকের সংকট থাকে। কৃষিকাজে নারীদের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলছে।"

স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তপন দাস মনে করেন পুরুষের তুলনায় কম মজুরীতে নারী শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো যায় বলেই নারী শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে।

নারী শ্রমিক রেবতি দাস ও পুরুষ শ্রমিক মনোরঞ্জন দাস জানান, নারীদের কারে যেতে হয় সূর্যোদয়ের সময় আর ফিরে আসতে হয় সূর্যডোবার পর। অন্যদিকে পুরুষ শ্রমিকদের কাজ বেঁধে দেয়া থাকে। নারীরা সারাদিন পর পায় এক কেজি চাল বা ২০ টাকা আর পুরুষদের মজুরী প্রায় দ্বিগুন। নারীরা কোন প্রতিবাদ করেনা বলেই এটা হচ্ছে বলে মনে করেন তারা।

(ছবি আছে)

২৬) সোনাইমুড়ীর রহিমা বেগম স্ত্রীর অধিকার বঞ্চিত

এ.এস.এম.রিজোয়ান (নোয়াখালী) :

রহিমা বেগম (৪২) সোনাইমুড়ীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মাওলার স্ত্রী। ভরন পোষন বঞ্চিত হয়ে তিন সন্তানকে নিয়ে প্রায় ১৪ বছর যাবত অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

বজরা ইউনিয়নের পূর্বচাঁদপুর সকু কেরানী বাড়ির গোলাম মাওলানা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতা উত্তর গোলাম মাওলানা রহিমা বেগমকে বিয়ে করেন। রহিমা জানায় ১৪ বছর পূর্বে তিনি স্ত্রীর কোনো অনুমতি না নিয়ে চট্টগ্রামে এক গার্মেন্টস কর্মী মনোয়ারা বেগমকে বিয়ে করে সেখানে বসবাস করেন। তিনি রহিমা ও তার সন্তানদের কোনো ভরন পোষন দেননি।

রহিমা এখন মেয়ে গুলনাহার (১৮), নুর জাহান (১৬) ও ছেলে রফিককে নিয়ে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করছেন।

মেয়ে গুল নাহার (১৮) বলে- "আমি অনেক কষ্টে পড়ালেখা করে দশম শ্রেনীতে উঠেছি। কিন্তু টাকার অভাবে ছোট বোন ও ভাইটার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে। রফিক এখন ওয়ার্কশপে কাজ করে।"

রহিমা জানায় তার স্বামী বাড়িতে না আসায় ও তাদের উপযুক্ত কোনো সন্তান না থাকায় কোনো ভাবে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তার স্বামীর নামে মুক্তিযোদ্ধা ভাতাও অর্ন্তভূক্ত হয়নি। স্বামীর বাড়িতে বসবাসের ঘরটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। এখন তিনি সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকেন। সরকারিভাবে ও কোনোদিন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে কেই সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। কিভাবে মেয়েদের বিয়ে দেবেন, বাকি দিন কি করে চলবে এ চিন্তায় দিশেহারা রহিমা।

(ছবি আছে)

২৭) ছকিনার জীবন বদলে দিয়েছে আর্থ ফাউন্ডেশন

এ.এস.এম.রিজোয়ান (নোয়াখালী) :

সামান্য ১৮'শ টাকার চাকুরীটি বদলে দিয়েছে ছকিনার জীবন। খেয়ে না খেয়ে কাটানো কষ্টের দিন এখন আর নেই তার। নিজের আয়ে পছন্দমত চলতে পারছে ছকিনা। তাতেই সে নিজেকে সুখী ভাবছে।

চৌমহুনী পৌরসভার গনিপুরে নিঃসন্তান ও স্বামী পরিত্যাক্তা ছকিনা বেগম (৩২) বাস করেন। চারমাস আগেও সে ভিক্ষা করে জীবন চালাত মে মাসে আর্থ ফাউন্ডেশনের বেগমগঞ্জ শাখায় এক লোকের সহায়তায় বাবুর্চীর চাকুরী পায়। ছকিনা জানায় এত তার কষ্ট দূর হয়ে গেছে। থাকে আর অনাহারে থাকতে হয়না। ভিক্ষার মত জঘন্য পেশা সে ছাড়তে পেরে সে মহা খুশি।

ছকিনা স্বামী তাকে ছেড়ে গেছে অনেক আগে। বাবা মা মারা গেছেন তিন বছর আগে। দুই ভাই তার খোঁজ খবর নেয়না। নিজেদের সংসারে ব্যস্ত তারা। আর সন্তানতো নেই ই। তাই সবাইকে ছেড়ে একেবারে একা ছকিনা। ছকিনা বলে-"আমার মত মহিলার জীবনটা পাল্টে দিয়েছে আর্থ ফাউন্ডেশন। তা হলে ভিক্ষা করে চলতে হইত।"

ছকিনার প্রসংগে কথা হয় আর্থ ফাউন্ডেশনের নোয়াখালী জেলা ম্যানেজার আনোয়ার হোসেনের সাথে। সে জানায়, শুধু ছকিনা নয় আর্থ ফাউন্ডেশন নারীদের একটা কর্মক্ষেত্র। ছকিনার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে দেখে ভালো লাগছে। তার জীবনটা সুন্দর একটা জায়গায় পৌঁছাক এটা সবার চাওয়া।

২৮) পাঁচ বাড়িয়ায় এতিম শিশু শিক্ষার্থীরা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে।

এ.এস.এম.রিজোয়ান (নোয়াখালী) :

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীর পাঁচ বাড়িয়া আহমাদিয়া এতিম খানা মাদ্রাসার অধিকার বঞ্চিত তিন শতাধিক শিক্ষার্থী মানবেতর জীবন যাপন করছে।
মাদ্রাসা মোহতামিম মাওঃ মোঃ আলী হোসাইন জানান মরহুম ফয়জুল হক আল কাদরীর একক উদ্যোগে এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১935 সালে। তার মৃত্যুর পর তিনি দায়িত্ব নেন। অর্থাভাবে এতিমখানার এতিম ও দুস্থ শিশুদের মৌলিক অধিকার গুলো নিশ্চিত করা যাচ্ছেনা।

কুমিল্লা থেকে আসা এতিম শিশু জাবেদ (৭), যোবায়ের (১৩), মাকসুদ (১২), রামগতির দিদার হোসেন (১২), মঞ্জুর হোসেন (১২), ফেনী থেকে আসা রায়হান (১০) জানায় ৫/৬ বছর আগে পড়াশুনা করতে এখানে ভর্তি হয়। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। মা-বাবা নেই কেউ দেখতে আসেনা। দিদার বলে –"আমার মা বাবা নেই তাই মাদ্রাসায় টাকা দিতে পারিনা, যাদের আছে তারা টাকা দেয় ভাল খাবারও পায়। কিন্তু আমরা ভাল খাবার পাইনা।"
কয়েকজন শিশু জানায় তাদেরকে এখান থেকে তেমন বাল কোনো কাপড় দেয়া হয়না। মাসুদ বলে- "আমার মাত্র দুটা জামা। নতুন জামা কিনবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কে দেবে?" জানা যায় তাদের কে তেমন খেলাধূলাও করতে দেয়া হয়না। অনেকেই বলে তাদের খেলতে ইচ্ছা করলেও শিক্ষকদের ভয়ে খেলেনা। এ বিষয়ে মোহতামিম আলী হোসাইন বলেন-"অনেক সমস্যা আমাদের এ মাদ্রাসায়। আবাসিক ভবন নেই, মাঠ নেই, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নেই, খেলার সরঞ্জাম নেই, রান্না ঘর নেই। এত সব সমস্যার মধ্যে শিশুদের থাকতে হয়। ওদের তো অভিযোগ থাকবেই।"
এতিমখানা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান জানান প্রতিবছর এখানে প্রায় সাড়ে আট লাখ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু আয় হয় মাত্র পাঁচ লাখ টাকা। বাকি টাকা ঋণ করতে হয়। বর্তমানের সমস্যা সমাধান করতে হলে ২০ লাখ টাকা প্রয়োজন। আমাদের যতটুকু সাধ্যের মধ্যে আছে শিশুদের ততটুকু দেয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু এতে তাদের সব চাহিদা পূরন হয়না। তাদের জীবন মান উন্নত করতে সকলের সহযোগিতা দরকার।
(ছবি আছে)

২৯) চাটাই শিল্প হাজেরার পথ চলা
সেলিনা আক্তার শেলী (নোয়াখালী) :
একটুও সময় নেই হাজেরা খাতুনের। ৬০ বছর বয়সেও মুক্তি নেই তার। বৃদ্ধ বয়সে এসে তার জীবনটা আষ্টে-পৃষ্ঠে মিশে গেল হোগলা পাতার সাথে। কাজের সময় কারো সাথে মাথা তুলে কথা বলতে চায়না বিবি হাজেরা। কথা বললে তার সময় নষ্ট হবে। চাটাই বুননে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। হাজেরা তিন সন্তানের জননী। স্বামী মৃত আবদুল লতিফ চাটাই ব্যাবসায়ী ছিলেন। চার বছর আগে এক অসুখে মারা যান। স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসারে এক মহা দুর্যোগ নেমে আসে। চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে থাকে। এ দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য বৃদ্ধ বয়সে চাটাই বুননের কাজ শুরু করতে হয় তাকে। কষ্টে নিশ্বাস ফেলে হাজেরা খাতুন জানান। যত দিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমাকে কষ্ট করে যেতে হবে। সংসারে স্বামী না থাকলে নারীদের জীবন আঁধার। বড় ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। আর এক মেয়েকে বিয়ে দিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। এখন মা আর মেয়ে মিলে চাটাই তৈরি করেন। হাজেরা সপ্তাহে দুই দিন চাটাই নিয়ে খলিফার হাটে যান। চাটাই বিক্রি করে আবার পাতার আটি কিনে আনেন। দুই দিন চাটাই বিক্রি করে হাজেরার ৪০/৫০ টাকার মত লাভ হয়।
ঐ টাকায় তার সংসারে অভাব বিন্দুমাত্র লাঘব হয়না। টানাটানির মধ্যে কোন রকমে চলে। হাজেরা ভাবে তার পরেও তো বেঁচে আছি। অবশ্য মেয়ের জামাই মাঝে মাঝে সাহায্য করে। চৈত্র বৈশাখ মাসে

হাজেরার বেশি কষ্ট হয়। ঐ সময় আবহাওয়ার জন্য চাটাই কম তৈরি করতে হয়। তাই ঐ সময় বেশির ভাগ সময় উপোস থেকে অথবা একবেলা আধবেলা খেয়ে কোন রকমে দিন চালাতে হয়। হাজেরা বলেন-"যার কপাল পোড়া তার সব দিকেই পোড়া। কয়েক দিন আগে মেম্বারের কাছে গিয়েছিলাম ভিজি এফ কার্ড করার জন্য। কিন্তু মেম্বার কার্ড করতে দেননি ছেলে আছে বলে।" এভাবে পাওয়া না পাওয়ার অনুভূতিকে সম্বল করে বেঁচে আছে হাজেরা।

৩০) যৌতুকের জন্য মানসিক নির্যাতনের শিকার অশ্বদিয়ার নারী
সেলিনা আক্তার শেলী (নোয়াখালী) :

ফাতেমার বয়স ১৭, এক সন্তানের জননী। বছর দুয়েক আগে শ্যামপুর গ্রামেরই দিন মজুর মজিবরের (২৬) এর সাথে ১০ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে বিয়ে হয়। স্বামী আরো চাইছেন। ফাতেমা বলেন, "টিয়া না দিলে বাইত তোন বার করি দিবো"। (টাকা না দিলে বাড়ী থেকে বার করে দিবে)

রূপসীর বাড়ী পূর্বনূরপুর গ্রামে। বাবা নেই মা মানুষের বাড়ীতে কাজ করেন। রূপসীর মায়ের মুখ চিন্তার রেখায় আঁকা। যৌতুক না দিতে পারলে বিশ বয়সী মেয়েটাকে পাত্রস্থ করা যাবে না।
রূপসীর মা অথবা বিবাহিত ফাতেমার মতো অনেক কিশোরী মানসিক চাপের মুখে দিন কাটাচ্ছে। নোয়াখালী জেলার অশ্বদিয়া ইউনিয়নে, সোনাপুর থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত এই ইউনিয়নে আনুমাসিক ৮০ হাজার লোকের বসবাস। কৃষিকাজ, মুদি দোকানের কাজ চালানো মানুষের পাশাপাশি প্রবাসী পরিবারও এই ইউনিয়নে কম নেই। পেশাভিত্তিক জীবনযাত্রা যাই হোক না কেন ঘরে বেড়ে ওঠা মেয়েটির বিয়ের যৌতুক নিয়ে কম বেশি মানসিক চাপে ভোগে প্রায় প্রতিটি পরিবার। উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেতে মা- বাবা যেমন চিন্তিত থাকেন তেমনি চাপের মুখে থাকে বিবাহিত অবিবাহিত নারী। অশ্বদিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফিরোজা খাতুন। তার বাবা মার কাছে প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে। ফিরোজা বলেন- "যৌতুক ছাড়া আমাদের সমাজে বিয়ে হয় না। এটাই এখন রীতি। ঘরে যখন বিয়ে ও যৌতুক নিয়ে কথা হয় তখন খুবই খারাপ লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়"।

কেবল অবিবাহিত নয়। যৌতুক নিয়ে চরম মানসিক চাপে আছেন বিবাহিত ও সন্তানের জননীরা। সুফিয়ার(৩০) সন্তান পাঁচটি। তারপরও তার স্বামী আতাউর এখনো বাপের বাড়ী থেকে যৌতুক আনতে চাপ দেন। সময় অসময়ে মারধর করেন।

অশ্বদিয়া ইউনিয়ন নারী সংহতি সভা (প্রাণ) এর সভাপ্রধান ফেরদৌসি সুলতানা (৩৫) মন্তব্য করেন, শারিরীক নির্যাতন ছাপিয়ে অশ্বদিয়ার নারীরা স্বামী পরিবারের হাতে মানসিকভাবে নির্যাতিত হয় সবচেয়ে বেশি। দু-একবার মারের দাগ শরীরে পড়ে বলে দেখা যায়। কিন্তু অহর্নিশ মানসিক অত্যাচারের দাগ কারোরই চোখে পড়ে না। মানসিক চাপের মুখে থাকা নারীরা সংসারে নানান ঝক্কি মোকাবেলা করেন, বাচ্চা লালন পালন করেন, শ্বশুর শ্বাশুড়ির দেখাশুনা, হাঁস মুরগী পালন সব কাজেই অস্থির মানসিকতার ছাপ পড়ে। একই সাথে দিন কাটতে থাকে গভীর হতাশার বর্ননাতীত আতঙ্কে।

পারিবারিক অশান্তি তৈরি হবার পাশাপাশি যৌতুকের দায়ে শারিরীকভাবে প্রস্তুত হচ্ছে প্রতিনিয়ত অসংখ্য নারী। মায়ের প্রতি বাবার আক্রোশ অবোধ শিশুদের বিকাশে দারুনভাবে প্রভাব ফেলে।

অশ্বদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তাহমিনা সুলতানা (৩০) মন্তব্য করেন, "একজন বাবা যৌতুকের দায়ে কেবল মাকেই প্রহার করে না নিজের আগত অনাগত সন্তানের ওপরও অকথ্য নির্যাতন করে" ।

ভুক্তভোগী পক্ষ মনে করেন, সমাজের সকলের মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র যৌতুক রীতির নিরোধ সম্ভব । প্রতিটি পরিবার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা যৌতুক দেবেও না নেবেও না তা হলেই যৌতুক নিয়ে পরিবারে অশান্তি বিরাজ করবে না । বাবা মা, বিবাহিত অবিবাহিত কিশোরী যৌতুক নিয়ে বিব্রত হবে না ।

৩১) শিক্ষাক্ষত্রে নারী

সেলিনা আক্তার সেলী (নোয়াখালী) :

সামাজিক সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই । মানুষের মনের মধ্যেই তার বৈষম্য, বিদ্বেষ ও বিবাদের বীজ রোপিত হয় । এই মানসিক অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্ত করার সর্বোত্তম হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা ।

সচেতনতা, উজ্জীবনী চেতনা উন্মেষের অনুঘটক হিসাবে শিক্ষার দায়িত্ব অপরিসীম । তবে শিক্ষা বিস্তারের কৌশল নির্ধারনে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য যদি সু- নির্দিষ্ট না হয় তবে দিক ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় । একুশ শতক আজ আমাদের দোর গোড়ায় । নুতন শতাব্দীর নবতর প্রাথমিক আভাষের প্রভাবে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নারীর সম্পৃক্তি অহরহই চোখে পড়ে । এই দৃশ্যমান পটভূমিকায় ধীরে ধীরে নারীর অংশগ্রহণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে । ক্রম সম্প্রসারন সামাজিক গতিশীলতার মধ্যে নারী আজ অনিবার্য ঘটক । তবুও আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন কতটুকু সংঘটিত হয়েছে? সামন্ত চেতনার পিতৃতান্ত্রিকতায় পুরুষের নারীর প্রতি অধ:স্তনতার বাধমুক্তি কি ঘটেছে? পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির অচলায়তন কি এখনো আমাদের সমাজে নারী মুক্তির সব থেকে বড় বাঁধা নয়? একুশ শতকে উত্তরণের পূর্বেই নারীর "কর্ম সহচরী" রূপের বিন্যাস ঘটাতে না পারলে এক অসম্পূর্ণ বিকাশের ঘোলা জলের আবর্তে অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকবে ।

জীবনে লক্ষ্য ঠিক করার বহুবিধ উপায়ের অন্যতম বাহন হচ্ছে শিক্ষা, সামাজিক সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম হাতিয়ার এই শিক্ষা । সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে নারী পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কৃতির আচরনে এর প্রায়োগিক বৈপ্যরীত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । সমাজের এই অন্তর্নিহিত বৈষম্যের কারনে শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । এমন একটা সময় ছিল যখন নারীর শিক্ষা গ্রহণ করাটাও সামাজিক অনাচার হিসাবে বিবেচনা করা হত । তবে সাম্প্রতিককালে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপের কারনে সমাজে নারী শিক্ষার বিস্তারে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । সামাজিক প্রয়োজনেও শিক্ষা এখন অত্যন্ত আবশ্যিক অনুষঙ্গ । এছাড়া রাষ্ট্র ও শিক্ষার অগ্রগন্যতা স্বীকার করে নিয়ে আরো অধিক হারে বিনিয়োগ করছে । ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাশ হয় । এই আইন পাশ হওয়ার পর উল্লেখযোগ্য হারে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে । সরকারী হিসাব মতে বর্তমানে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতকরা ৯২ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে । প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারেহ্রাস পেয়েছে । প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা ছাড়াও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম, শিক্ষার ভৌত সুবিধা বৃদ্ধিকরন,

উদ্ভাবন মূলক কার্যক্রম প্রচলন এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৫৩:৪৭। এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী ২/৩ বছরের মধ্যেই এই অনুপাত সমান সমান হয়ে যাবে। বিগত ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯০) নারী উন্নয়নেরবিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারায় অধিক হারে সম্পৃক্তকরনের লক্ষ্যে নিুলিখিত উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারন করা হয়।

১. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা,ব্যবসা, চাকুরি এবং অন্যান্য সেক্টরে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধিকরন।
২. নারী শিক্ষার হার শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত করণ।
৩. নারীর স্ব- কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরন।
৪. নারীর দারিদ্র বিমোচন।
৫. নারীর নিজ স্বত্তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করন।

চতুর্ধ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নারী শিক্ষা উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়।

সারাদেশে ৪৬০ টি থানায় ছাত্রী বেতন মওকুফ ৪টি উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ১৯৯৪ সন থেকেই প্রকল্পগুলি চালু হয় ।নারী শিক্ষা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পগুলিকে সরকার বিপুল পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রীদের অধিক সংখ্যায় আকৃষ্ট করার ফলে মাধ্যমিক স্তরেও ভর্তির হার বেড়ে গেছে। এই সকল ছাত্রীদের নানা রকম উৎসাহ প্রদান করার ফলে পরবর্তী শিক্ষার স্তর গুলিতেও মেয়েদের অংশ গ্রহনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় মেয়েরা আগের তুলনায় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আসছে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। জাতিগঠন মূলক উন্নয়ন সংস্থাগুলি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের সূচক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহন এখন অনিবার্য ও আবশ্যিক। নারী শিক্ষা বাস্তবায়নে আজ অনেক বেসরকারী সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের এরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যক্রমের উদ্যোগ আজ বিপুল প্রশংশিত।

নারী শিক্ষার কারনে সমাজে আজ নারীর অবস্থান পূর্বের মত নয়। শুধু মাত্র শিক্ষাই পারে সমাজের উন্নয়নের জন্য নারী মুক্তির এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার হতে।

তথ্যসুত্র:--মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৩২) হিল্লা বিয়ে থেকে রক্ষা পেল একটি পরিবার

মর্জিনা আক্তার (নোয়াখালী) :

নোয়াখালী অশ্বদিয়া ইউনিয়নের পূর্ব নূরপুরে মনির আহমেদ তার স্ত্রী বিবি ফাতেমাকে সম্প্রতি মাতাল অবস্থায় মুখে মুখে তালাক বললে এলাকায় এ বিষয়ে নানামুখী আলোচনা তৈরি হয়। একঘরে করে দেয়া হবে, মনিরের বাবা মাকে মারধর করা হবে, হিল্লা আয়োজন করা, ফাতেমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া ইত্যাদি নানা ধরনের হুমকিতে ফাতেমা আর মনিরের একসাথে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে সুবিধাবাধী কিছু পক্ষ টাকার বিনিময়ে সামাজিক ফয়সালার প্রস্তাব দেয়। এদিকে তালাক প্রদান করা হয়েছে এ মর্মে ইউনিয়ন পরিষদে মনির কোন নোটিশ প্রদান না করলেও ফাতেমা বাদী হয়ে ইউনিয়ন

পরিষদে মামলা দায়ের করে। মামলা করার সাথে মনিরের নামে সমর জারী করা হয়। পরদিন নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি শেষ হয়ে যাবার কারণে ফাতেমা ও মনির চার সন্তানসহ একসাথে বসবাস শুরু করে। কিন্তু এলাকার কিছু লোকজন এ নিয়ে সমস্যা তৈরী করতে থাকে। তারা বলেন, ফাতেমার হিল্লা বিয়ে দিতে হবে, নতুবা তারা একসাথে থাকতে পারবেনা। উন্নয়ন সংগঠন প্রান কর্মীরা এ বিষয়টি জানতে পারলে তারা ফাতেমার বাড়িতে যায় এবং ফাতেমা, তার মা, মনির ও মনিরের পরিবারের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, পুরুষ-নারী সদস্যদের আলোচনা করেন। তারাও এ জাতীয় তালাক আইনগত নয় এ মর্মে মতামত দেন এবং প্রান'র কর্মীদের প্রয়োজনীয় সাহায্যর আশ্বাস দিয়ে কাজ করার জন্য বলেন।

একই সাথে এলাকার লোকজনকে এ তালাক আইনগতভাবে হয়নি বলেও জানিয়ে আসে। গ্রাম পর্যায়ে যাওয়া আসা এবং নানা পক্ষের সাথে আলোচনার ফলে এলাকার পরিস্থিতি ইতিবাচক পর্যায়ে আসতে থাকে। পরবর্তীতে মনির ও ফাতেমা প্রত্যক্ষ সহায়তার জন্য প্রান'র কাছে আবেদন করে। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রান ফাতেমা ও মনিরের সাথে আইনজীবী অ্যাডভোকেট গোলাম আকবরের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। অ্যাডভোকেট গোলাম আকবর মনিরের বাড়ি পরিদর্শন করে তাদেরকে মুসলিম পারিবারিক আইন মোতাবেক তালাক হয়নি এ মর্মে লিখিত আইনী পরামর্শ প্রদান করেন। বর্তমানে ফাতেমা ও মনির স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন। মানবাধিকার ও সুশাসন প্রকল্পের আওতাধীন এলাকায় ইস্যুভিত্তিক মোবিলাইজেশনের কাজ করছেন উন্নয়ন সংস্থা পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান)। এই কার্যকক্রমের ধারাবাহিকতায় অশ্বদিয়া ইউনিয়নের পূবৃ নুরপুর গ্রামের মনির আহমেদ ও তার স্ত্রী বিবি ফাতেমাকে আইনী পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে তাদের এ জাতীয় কর্মকার্য অব্যহত রেখেছে।

৩৩) অনগ্রসর সমাজ ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ঠ নিঝুম দ্বীপের নারীরা

মিরন মহিউদ্দিন (নোয়াখালী) :

বৈষম্য, অবহেলা, বঞ্চনা আর অনগ্রসর সমাজ ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে নিঝুম দ্বীপের নারীরা। সরকার কিংবা বেসরকারী কোন সংস্থা এগিয়ে আসেনি তাদের মৌরিক অধিকারগুরো নিশ্চিত করতে।

সরেজমিনে নিঝুম দ্বীপে গিয়ে দেখা যায়, এ দ্বীপের ১৬ হাজার জনগনের প্রায় অর্ধেক নারী। যেহেতু বাল্যবিবাহ আর বহুবিবাহ সেখানকার নারীদেরকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে।

প্রায় ১২-১৩ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় ফলে প্রতিনিযত বাড়ছে কুমারী মাতার সংখ্যা। এ দ্বীপের অধিকাংশ পুরুষ মাছ ধরার সাথে জড়িত। দারিদ্রতার নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত অভিভাবকরা মেয়ে বড় হলেই বোঝা মনে করেন। উঠে পড়ে লাগেন বিয়ে দিতে। তখনই সামনে আসে যৌতুকের খড়গ। যৌতুক দিতে না পারলে বিয়ে হয়না। আবার কারো কারো সংসার ভাঙে। এ সুযোগে এক শ্রেনীর দালাল ফয়দা হাসিল করে।

ধান কাটার মৌসুমে ও মাটি কাটার সময় হলে হাতিয়াসহ বিভিন্ন স্থান থেকে মেঠো শ্রমিকেরা এ দ্বীপে ভিড় জমায়। এদের অনেকেই আবার এ দ্বীপে বিয়ে করে। দালালদের সহায়তায় অভিভাবকরা যৌতুকের হাত থেকে রক্ষা পেতে মেয়েকে বিয়ে দেয় এ সকল শ্রমিকদের সাথে। কিছুদিন যেতে না যেতেই কেউ কেউ স্ত্রী-সন্তান ফেলে সটকে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ সকল স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের বিয়ে হয়না আর স্থানীয় ইউপি সদস্য জানালেন নিঝুম দ্বীপে স্বামী পরিত্যাক্তা নারীর সংখ্যা প্রায় ৭শ।

বসুন্ধরা গ্রামের শেফালী বেগম (৩৫)। ৬ সন্তানের জননী। ঘরে স্বামী অসুস্থ, যতটুকু জমি জিরাত ছিল তাও বিক্রি করে সংসার জীবন চালিয়েছেন। স্বামী অসুস্থ তাই অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। যৌতুকের টাকা না দিতে পারায় তার বড় মেয়েকে বিয়ে দেবার কিছু দিনের মাথায় শেফালী বেগমের স্বামী সংসার ফেলে নিরুদ্দেশ হয়। মেঝ মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন আপন বোনের ছেলের কাছে। কথা ছিলো যৌতুক হিসাবে তিন হাজার টাকা দেয়ার-তাও দিতে পারেননি। যাতায়ন গুচ্ছ গ্রামের রেহানা বেগম জানালেন মেয়ের বিয়েতে যৌতুকের টাকা যোগাড় করতে জমিতে চাষাবাদের কথা বলে একটি এনজি থেকে ৩ হাজার টাকা ঋন নিয়েছেন। যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় বসুন্ধরা গুচ্ছ গ্রামের আমেনা বেগম (৩০) কে নির্যাতন করে তিনটি সন্তান সহ পিতার সংসারে ফেরত পাঠিয়েছে শ্বশুরপক্ষ। নিঝুমদ্বীপে এমন ঘটনা অসংখ্য।

একই সংগে নিঝুমদ্বীপে ভয়াবহ হাড়ে বাড়ছে জনসংখ্যার হার। অধিকাংশ পরিবারেই পাঁচ জন থেকে ১২/১৩ জন সন্তান রয়েছে। বহুবিবাহের ফলে এটি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নিঝুম দ্বীপে কোনো সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা স্বাস্থকর্মী না থাকায় প্রজনন স্বাস্থ্য, গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যসেবা মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। এতে করে একদিকে যেমন জনসংখ্যা বাড়ছে তেমনি গর্ভকালীন সময়ে মৃত্যু ঝুঁকির মাত্রা বাড়ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে নিঝুম দ্বীপে ১০ শতাংশের বেশী কুমারী মাতা প্রসবকালীন সময়ে মারা যায়। এ দ্বীপের মানুষ অধিকাংশই দরিদ্র হওয়ায় তারা হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স কিংবা নোয়াখালী সদরে রোগীকে আনতে পারেনা। তাছাড়া দীর্ঘ নদীপথ পাড়ি দিতে গিয়ে ভোগান্তির অন্ত থাকেনা। তাই বাধ্য হয়ে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক কিংবা লোকজ চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। যাদের আর্থিক সামর্থ কম কিংবা নেই তাদেরকে প্রকৃতির ওপরই নির্ভর করতে হয়।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মী শিউলি আক্তার জানান, এখানকার মানুষের মাঝে সচেতনতার অভাব রয়েছে। সরকারী কোনো স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স না থাকায় তাদের সংস্থার পক্ষে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। তিনি আরো জানান, প্রতিমাসে দুবার তাদের মেডিক্যাল টিম আসে নিঝুম দ্বীপে। তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যেমে তারা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইউপি সদস্য তাজুল ইসলাম বলেন-"এখানে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই বলে সরকারী স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার ব্যবস্থ্য নেই। মানুষ বাধ্য হয়েই গ্রাম্য চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।" যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পাশাপাশি যৌতুক ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা গেলেই নিঝুম দ্বীপের নারীরা যাপিত জীবনে মুক্তির স্বাদ পাবে বলে মনে করেন এলাকাবাসী।

৩৪) পঁচাত্তর বছর বয়সে অবসর নেই আয়েশা খাতুনের

সুমাইয়া আক্তার রিপা (নোয়াখালী) :

পঁচাত্তর বছরেও আয়শা খাতুনের অবসর নেই। বাড়ি বাড়ি গৃহপরিচারিকার কাজ করে চলে তার জীবন-জীবিকা। সংসারে স্বামী -সন্তান সবই আছে। শুধু নেই তার সুখ।

দু'মুঠো ভাতের জন্য তাকে খাটতে হয় সারা দিনমান। নোয়াখালী পৌরসভার মাইজদী গ্রামের শিকারী বাড়িতে আয়শার বাস। স্বামী আবদুল্লাহ এক সময় রিকসা চালিয়ে সংসার চালাতেন। বয়সের ভারে এবং বিভিন্ন রোগের কারণে আজ সে অক্ষম। আয়শা খাতুনের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বিবাহিত ছেলে-মেয়েরা মা-বাবাকে কোনো রকম সহযোগিতা করেনা। বড় ছেলে শাহাজাহান মা-বাবাকে নিজের ঘরে ঠাঁই দিলেও আর্থিক সাহায্য করে না বরং আলাদাভাবে খাওয়ার জন্য বাধ্য করে। নিরুপা হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে আয়শা ঝি এর কাজ বেছে নিয়েছে। শত দুঃখ কষ্ট এবং রোগের মাঝেও আয়শার মুখে হতাশার ছাপ নেই। এ বয়সে এত পরিশ্রম করছেন জানতে জাইলে আয়শা খাতুনবলেন—"গরিবের কপাল খারাপ।

আল্লাহ আমাদের দুঃখ দিয়া দুনিয়াতে পাঠাইছে, ঘরে বসে থাকলে তো পেটে ভাত জোটবেনা। আমাগোরে কাজ করে খাইতে হবে।"

আয়শা আরো জানান, প্রতিদিন ৭-৮ বাসায় দু'বেলা করে পানি দেন। এছাড়া কাপড় ধোয়া, মসলা বাটা, থালা- বাসন মাজা, ঘর মোছার কাজ করে। আবার সুযোগ পেলে নিজের বাড়ির রান্না করে। দিনে ২০-৩০ টাকা আয় হয়। এ টাকা দিয়ে সংসার চালায়। নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই, বড় ছেলে শাহজাহানের বাসায় সে আর তার স্বামী থাকে। তাই ছেলের বউয়ের কথায় চলতে হয়।

বয়স্ক ভাতা কি এটা দিয়ে কি হয় তা আয়শা বেগম জানেন না। অথচ বাংলাদেশের বয়স্কভাতার নীতিমালা অনুসারে আয়শা বেগম বয়স্কভাতা পাবার যোগ্য। আয়শা বেগম সাহায্যের আশায় স্থানীয় বিত্তবানদের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কেউ তার প্রতি সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেননি। বয়স্কভাতা সমাজের অনেকে পেলেও তার ভাগ্য জোটেনি, এ সম্পর্কে তার ধারণা নেই। নিরক্ষরতা এবং দরিদ্রতা তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে অন্ধকারে। সমাজে তার কোনো মূল্য নেই। আছে শুধু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

৩৫) নোয়াখালীর রাইচ মিলের নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্যর শিকার

সুমাইয়া আক্তার রিপা (নোয়াখালী) :

জীবনের ঝুঁকি, অধিক শ্রম ও ন্যায্য মুজুরি না পাওয়ায় নোয়াখালীর রাইচ মিলের নারী শ্রমিকরা চরম দূর্ভোগের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, অসচেতনতা, মালিকের প্ররোচনা এবং শ্রম আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় তারা পরিণত হচ্ছে শ্রমদাসে।

সরেজমিনে নোয়াখালীর ২৩ নং ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের বড় পুলের পাশে বিসমিল্লাহ রাইচ এন্ড ফ্লাওয়ার মিলস এবং আজাদ রাইচ মিলসে গিয়ে এ চিত্র দেখা যায়। নোয়াখালীতে কর্মরত রাইচ মিলের শ্রমিকদের বেশীরভাগই বাইরের। কাজের ব্যপক চাহিদা থাকায় বরিশাল, ফরিদপুর, লক্ষ্মীপুর চরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নারী পুরুষ শ্রমিকরা জীবন জীবিকার তাড়নায় এখানে ছুটে আসে। কিন্তু মালিকের কাছ থেকে ন্যায্য মুজুরি পায়না বলে অভিযোগ করে শ্রমিকেরা। সঠিক নীতিমালা অনুসরণ, শ্রম আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, আর্থিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চুক্তির পূর্বে কাজ সম্পর্কে জেনে নেয়া গেলে রাইচ মিলের নারী শ্রমিকদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন ফিরে আসবে বলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা জানায়। নারী শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, মালিকের সাথে চার পাঁচ বছরের চুক্তি নিয়ে শ্রমিকরা তাদের পরিবারসহ এখানেই বসবাস করছে। মালিক থাকার জন্য খুপরি ঘর হিলেও তা যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। খাদ্যের ব্যবস্থা করলেও বেতন থেকে কাটে, আবার গুরুতর অসুস্থ হলে আর্থিক সহায়তা করে তবে অতিরিক্ত কাজের বিনিময়ে। অক্ষর জ্ঞান না থাকায় পরিবারের সবাই এ পেশায় নিয়োজিত। তার মধ্যে নারী শ্রমিকের খাটুনি গুরুতর। ধান সিদ্ধ, শুকানো, মাড়াই করে বস্তায় ভরা, আবার চালের বস্তা মাথায় তুলে জায়গা স্থানান্তর করা যা নারী শ্রমিকের জন্য খুবই কষ্টকর। সংসারের কাজ গোছানো এবং মিলের দৈনিক ২০-৩০ মণ ধানের কাজ দুটোই তাদের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম। কিন্তু সে অনুযায়ী মালিকের কাছ থেকে ন্যায্য মুজুরি পায় না। ফলে অল্প আয়ে পরিবারের ভরন-পোষন চালানো সম্ভব হয়না।

বিসমিল্লাহ রাইচ এন্ড ফ্লাওয়ার মিলে প্রায় ২০-৩০ জন শ্রমিক কাজ করে তার মধ্যে বেশির ভাগ নারী শ্রমিক। মজুরি সম্পর্কে শ্রমিক রুপালি বেগম (২৫) জানান সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। এ কাজে অনেক খাটনি, এখানে কাজ করতে গিয়ে আঘাত খেয়েছি অনেক। কাজের তুলনায় শ্রমিক সংখ্যা কম। তারপরও দিনের কাজ দিনেই শেষ করতে হয়। নয়ত বেতনভাতা পাওয়া যায়না। রুপালী আরো জানান, প্রতিমণ ধানের জন্য ৫ টাকা করে দেয়। নারীর শ্রমিকরা ১০-১২ মণ ধানের কাজ করলে জনপ্রতি পারিশ্রমিক ৫০-৬০ টাকা। আর পরিষি শ্রমিকের মুজুরি ১০০-১৫০ টাকা। স্বল্প বেতনে

সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। শ্রমিক রহিমা খাতুন (৫২) বলেন, আমরা আগুনে ধান সিদ্ধ করি, রৌদে শুকাই আমাগো মাথার ঘাম পায়ে পড়ে। বুড়ো বয়সে অচল শরীরে খাটনি করেও ন্যায্য মুজুরি পাই না।

রহিমা আরো বলেন আমার সংসারে ছেলে মেয়ে পাঁচ জন। টাকা পয়সার অভাবে তাদের লেখাপড়া করাতে পারিনি। তিন মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত। কিন্তু টাকার অভাবে বিয়ে হয়না। তিন বেলার খাবার যোগান, কাপড়, অসুখের খরচসহ টানা পোড়া সংসার চালানো দূর্বিসহ। তবুও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য অধিক পরিশ্রম করে যাচ্ছে রহিমা। শ্রমিক আনোয়ার হোসেন (৫০) জানান, বেতনভাতা বাড়ানোর জন্য মালিককে জানানো হয়। কিন্তু মালিক এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি, উল্টো তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে চায় বলে শ্রমিকরা জানান। আজাদ রাইচ মিলের শ্রমিক আসমা বেগম (২২) বলেন-"এক বছর যাবৎ আমি রাইচ মিলে কাজ করেছি। এখানে নয়জন পুরুষ এবং ২৫ জন নারী শ্রমিক কাজ করছে। পুরুষের সমান কাজ করেও আমরা সমান মুজুরি পাই না।" তিনি আরো জানান, দীর্ঘদিন ঝুকিপূর্ণ পেশায় কাজ করলে হাত-পা, কোমর, ঘাড়ে ব্যথা কিংবা ফোস্কা পড়ে। সামান্য চিকিৎসা সুবিধা দিলেও সেটা কাজ করার স্বার্থে করা হয়ে থাকে।

আজাদ রাইচ মিলের মালিক আবদুল মন্নান (৫০) জানান, শ্রমিকের পেশা ঝুকিপূর্ণ এবং কঠিন। তাই অনেকেউ কাজ করতে চায় না। আর কিছু সংখ্যক কষ্ট হলেও পেটের দায়ে এ পেশায় আসে। তিনি জানা পাটি থেকে ধানের কেজি ১৪ টাকা করে নেয়। কাস্টমারের কাছে বিক্রি হয় ১৮-২০ টাকা করে। আবার সেখান থেকে শ্রমিকের মজুরি কাটা হয় ৫ টাকা। এতে লাভের পরিমাণ হয় কম। এছাড়া মিলের যাবতীয় জিনিসের ক্ষয় ক্ষতি প্রত্যেক বছরে লেগে থাকে। সেগুলো মেরামত করতে অনেক টাকা খরচ হয়। তাছাড়া ধানের মৌসুম চলে গেলে কাজ হয় না। লাভের পরিমান কম হওয়ায় শ্রমিকদের বেতনভাতা বাড়ানো সম্ভব না বলে জানান মিলের মালিকগণ।

৩৬) সুখের আলো দেখছেন অশ্বদিয়ার রোকেয়া

সুমাইয়া আক্তার রিপা (নোয়াখালী) :

কষ্টের গ্লানি মুছে রোকেয়া বেগম (৩৫) এখন সুখেই আছেন। জীবনের অন্ধকারময় দিনগুলি পেরিয়ে এখন ধীরে ধীরে পুষে রাখা স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করছেন। নিজেকে তার সমাজের নারী হিসাবে ভাবতে ভালই লাগে।

নোয়াখালী অশ্বদিয়া ইউনিয়নের মধ্যম করিমপুর গ্রামে রোকেয়ার বাস। ছোট কুটিরে স্বামী জাহিদুল হক এবং এক ছেলে তিন মেয়ে নিয়ে তার সংসার। জাহিদুল হক একসময় বিএডিসিতে কাজ করতো। ১৯৯২-৯৩ সালে বিএনপি সরকার আমলে সারাদেশে বিএডিসি থেকে কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছাটাই করার সময় জাহিদুল হক ছাটাই হন। সে সময় এককালীন সাত লাখ টাকা পেয়ে জাহিদুল হক তার দুই ভাইকে বিদেশ পাঠান এবং বাকি টাকা দিয়ে পুকুরে মাছ চাষ করার উদ্যেগ নেন। এ ব্যাপারে এক আত্নীয়কে দায়িত্ব দেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ওই আত্নীয় মাছ চাষের লাভটুকু আত্নসাৎ করে নেয়। এদিকে বিদেশ পাঠানো ভাইয়েরা আর কোন খোঁজ নেয়নি। স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে জাহিদুল অসহায় হয়ে পড়েন। সংসারে শুরু হয় টানা-পোড়েন। ঠিক তখনই বেঁচে থাকার কঠিন প্রত্যয়ে রোকেয়া বেগম একটা কাজে যোগ দেন।

১৯৯৪ সালে রোকেয়া প্রথম এনআরডিএস প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে শিক্ষকতা ও স্বাস্থ্যকর্মীর কাজ শুরু করেন। দশম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়ার কারণে রোকেয়া এ সুযোগ পান। মহব্বতপুর, শ্রীপুর, মধ্যম কারিমপুরে ৩০ জন করে তিনটি সংগঠনে তিনি লিডার হয়ে কাজ করেন। সকল কর্মীকে স্ব্ক্ষরতা জ্ঞান, ওয়াটার-স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি দল থেকে তার

মাসিক আয় ৫০০ টাকা। জানা যায় কর্মীদের দিশারী, গোলাপ, একতা নামে তিনটি গ্রুপ ফান্ড ছিল। প্রত্যেকে ১০-২০ টাকা করে জমা রাখত সে ফান্ডে।

এনআরডিএস থেকে সবজি চাষ ও মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে রোকেয়া শুরুতে তার জমানো ৬০০ টাকা এবং ২ হাজার টাকা ঋন নিয়ে নিজ জমিতে টমেটো, ধনিয়া, মরিচ, সরিষা ইত্যাদি সবজি বাগান এবং পুকুরে মৎস্য চাষ করেন। এতে তিনি নিজবাড়ির চাহিদা মিটিয়ে মাছ ও সবজি বিক্রির লাভ দিয়ে সংসার ও ছেলেমেয়েতের পড়াশুনার খরচ মেটাতে থাকেন। একই সাথে ঋনের টাকা পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে নারী-পুরুষের বৈষম্য ও সমতা বিষয়ক জেন্ডার এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির উপর প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে আরো ৬ হাজার টাকা ঋন নিয়ে ১০টি ক্যাম্বেল হাঁস ও ১১টি দেশী মুরুগি কিনে নিজ বাড়িতে খামার করেন। এ খামার থেকে প্রতি সপ্তাহে ২০-৩০ টি পেতো ,তার আয় হতো ৮০-১২০ টাকা। আয়ের কিছু অংশ থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতেন। এভাবেই শিক্ষকতা, স্বাস্থ্যকর্মী, সমিতির মাধ্যেমে রোকেয়া তার নিঃস্ব জীবনের সমাপ্তি ঘটান।

জীবনের অতীত কষ্টকে মুছে সফলতার প্রান্তে এসে রোকেয়া এখন কেমন আছেন জানতে চাইলে বলেন - "আমি এখন সুখেই আছি। এমন সময় গেছে তিন বেলার খাবার যোগাড় করতে কষ্ট হয়েছে। সামান্য ভিটে বাড়ি আর ছোট্ট একটি পুকুর ছাড়া তেমন কোনো সম্পত্তি ছিলনা। পরিশ্রম করে আমি আমার অবস্থার পরিবর্তন করেছি। বড় ছেলেকে এমএ পাশ করিয়েছি এবং দু'মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। এখন আর আমাদের আর্থিক অভাব নেই। সমাজের প্রভাবশালী লোকদের কাছে আমাকে সাহায্যর জন্য যেতে হয় না।"

৩৭) মেয়েরা শিশুবেলা থেকেই বৈষম্যর শিকার

নাসির উদ্দিন (নোয়াখালী) :

শত ইচ্ছা থাকলেও আট বছরের মল্লিকা আর দশটি ছেলের মত রাস্তার পাশে কিংবা গ্রামের মাঠে, গোল্লাছুট খেলতে পারছেনা তার বড় সাধ গোল্লাছুট খেলার মাঝে মধ্যে ছেলেদের সাথে খেলতে নেমে যায়। কিন্তু মনে খুব ভয় এ বুঝি বাবা-মা দেখে ফেললো। একদিন তার মা তাকে অনেক খোঁজা-খুজির পর দেখে সে ছেলেদের সাথে গোল্লাছুট খেলছে। তার মা তাকে ডেকে নিয়ে অনেক বকাবকি করেন, বলেন তুমি কি ছেলে যে মাঠে গোল্লাছুট খেলতে যাও, মাঠে চেলো খেলে মেয়েরা নয়। জন্মের পরই এভাবে বঞ্চিত করা হয় কন্যা শিশুকে, হাসি আনন্দ থেকে, ছেলে-মেয়ে ব্যবধানটা ওখান থেকেই শুরু হয়।

মানুষের জীবনে শিশু বেলাটা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিশু বেলাতে যদি কন্যা শিশুকে এভাবে বৈষম্য নিয়ে বড় হতে হয় তাহলে একটা ভীতি নিয়েই যেন সে বেড়ে উঠলো। মেয়ে হয়ে জন্মানোর ফলে সমাজের নির্ধারিত কতগুলো বাধা নিষেধ, অবহেলার বোঝা কাঁধে নিয়েই তাকে বেড়ে উঠতে হয়। একটি শিশু প্রধমে একজন মানুষ তারপর সে কন্যা সন্তান অথবা পুত্র সন্তান এই চির সত্য কথাটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভুলে যায়। সৃষ্টিগত বৈষম্য বাইরে মানুষ সৃষ্ট সমাজ, নারী - পুরুষ যে বৈষম্য করা হয় এর ফলে কন্যা শিশুর বিকাশতো রুদ্ধ হয় সঙ্গে পুরো জাতির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথে ব্যপক বাধার সৃষ্টি হয়। এসব কারণে আমাদের দেশে বেশীরভাগ কন্যা শিশু কিশোরী এর পরে নারী পদে পদে পোহাতে হয় হতাশা বঞ্চনা, বৈষম্য, অবহেলা, আদিকাল থেকে কন্যা শিশু জন্ম নেওয়া যেন এক মহা অন্যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অনাহর অবহেলায় বেড়ে উঠে কন্যা শিশু, খাদ্য বন্টন থেকে শুরু করে, শিক্ষা, চিকিৎসায় কন্যা শিশুর প্রতি তেমন কোন মনোযোগ থাকে না। অনেক পরিবারে অর্থনৈতিক অনটন দেখা দিলে কন্যার পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

আজকে সংসদ, সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা, নারী আন্দোলন, নারী মঞ্চ এসব করেও জেন্ডার বৈষম্য থেকে যাচ্ছে। নারী নয় মানুষ এ ভাবনাটা শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় ভাবনা হবেনা। সে জেনাডার বৈষম্য একই বৃত্তে ঘুরপাক খাবে বা একই চক্রে পূণরাবৃত্তি হবে। মূলত পুরুষতন্ত্রী অজ্ঞতা ও সামাজিক বৈষম্যর জটিল প্রক্রিয়া এই চক্রকে নিয়ন্ত্রন করে। কন্যা সন্তানের প্রতি সব ধরণের বৈষম্য বিলোপ, কন্যা সন্তানের অধিকার বাড়ানো এবং কার্যকর করা, কন্যা শিশুর চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এসব মূল বিবেচ্য বিষয় হতে হবে। শুরু থেকেই কন্যা শিশুকে বৈষম্যর শিকার করলে কখনও আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়া যাবেনা এবং অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

৩৮) পথ শিশুদের কণ্ঠে ভেসে উঠে সমাজ বদলের কথা

মোঃ নাসির উদ্দিন (নোয়াখালী) :

কত হবে ওদের বয়স আট নয় কিংবা দশ এগারো। অনাদরে অনেক শিশুর গা ফেটে গিয়েছে, কানের গোড়ায় ময়লা জমেছে, কারও গায়ে ছেড়াঁ কাপড় আছে, কারও গায়ে তাও নেই, কেউ বালতি ব্রাশ হাতে ধোয়ার কাজে ব্যস্ত, কেউ রিকসা চালায়, কেউ রাস্তার পাশে ছোট চা দোকানের শ্রমিক, অনেকে বড় ঝোলা হাতে ছুটে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ওরা পথ শিশু, ওরা টোকাই, নিরীহ, সুবিধাবঞ্চিত এ শিশুরা কেউ কাগজ কুড়ায়, লোহা লক্কর কুড়ায়, প্লাষ্টিক কুড়ায়, কেউ ওয়েল্ডিং এর মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। তাদেরকে কাজের জন্য তাগিদ দিতে হয়না। ক্ষুধা, দারিদ্র তাদেরকে কাজ করার তাগিদ দেয়। পথ শিশুরা খুব স্বাধীনচেতা, মুক্ত থাকতে চায় তারা। সরেজমিন পরিদর্শনকালে এদের সাথে কথা বলতে চাইলে টুকু, লালু, মানিক, বেলাল একসাথে বলে উঠে আমাগো সময় নাই কি হইব আপনের কথা কই। অনেক অনুরোধে জানতে চাইলাম, প্রতিদিন কত টাকা আয় হয়, মানিক বললো ৩০/৪০ টাকা। এই টাকা দিলে কি করো জানতে চাইলে বলে -"নিজেরা খাই টাকা বাচলে বাবা মাকে দিই।" রিক্সা চালক বেলালকে এত অল্প বয়সে এত কষ্টের কাজ কেনো করছে জানতে চাইলে সে বলে–"অন্য কাজে কম টাকা উপার্জন হয় যা দিয়ে পঙ্গু বাবা-মা সহ ভাইবোনদের নিয়ে সংসার চলেনা।" লালু, টুকু, মানিককে বাসা বাড়িতে কাজ কেন করছেনা জিজ্ঞেস করলে বলল -"ওরা আমাগো খাইতে দেয় না, শুধু মারে, টিভি পর্যন্ত দেখতে দেয় না। টিভি ঘরে যাওয়া একদম নিষেধ।" লালু বললো -"এক বাসায় কাজ করতাম একবার উকি দিয়ে একটু টিভি দেখতেছি অমনি বাসার বেগম সাহেব এসে আমাকে এমন মাইর দিল, আমার চোখ খুলে ফেলতে চাইলো। ধনীরা মানুষ না, ওরা শুধু অত্যাচার করে, না খেয়ে মরে গেলেও বাসা বাড়িতে কাজ করতে যাবোনা। ওরা খুব জ্বালাতন করে, ওদের বিচার কেউ করে না। ওরা আমাদেরকে মানুষ মনে করে না।" মানিক বলে উঠলো -"আমি যদি মাতব্বর হই,তাহলে ওদেরকে আর শিশুদেরকে মারতে দেব না। ধনীরা আমাদের চেয়ে কুকুর বিড়ালের যত্ন করে বেশি।"

৩৯) অনিরাপদ শৈশবের বাসিন্দারা

খালেদা আক্তার লাবনী (নোয়াখালী) :

সেলিনার বয়স বারো বছর। নোয়াখালীর পৌর বাজারে বস্তা কাঁধে নিয়ে ঘোরে। আধপচা আলু সবজী দু একটা হলদে শাকপাতা তার লক্ষ্য। সকালে বিকালে বাজারের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু অনেক লোকের ভিড়ে কখনোই যায়না। কারণ জানতে চাইলে বলে -"মাইনসে গায়ে আত্ দেয়।"
হোটেল বয় রাসেল। সারাদিন হোটেলের ময়লা থালা বাসন মাজে। ফলে তার আঙুলের ফাঁকে জমেছে লাল দগদগে ক্ষত। ভোট কাধে সংসারের বড় বোঝা চেপে আছে বলে ঔষধের খরচ জোটে না তার। আবার পলি নামের মেয়েটি রতে ঘুমাতে পারেনা অনিশ্চিত আতংকে। কুকড়ে পড়ে থাকে ময়লা বিছানার

কোনে। না জানি কখন নড়ে ওঠে দরজার পাল্লা। টোকা দেয় গৃহকর্তা নাকি বাড়ির বখাটে বড় ছেলেটা। শব্দময় প্রতিদিনের নিঃশব্দ এই সব নির্যাতন দাগ ফেলে যায় সেলিনা, রাসেলের মনে। দেখা যায়না বলেই হয়তো আমাদের মনেও এসব আবেদন যোগায় না। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশের শিশুর সংখ্যা অর্ধেকের চেয়েও বেশি। জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী তাদের বয়স ষোল বছরের কম। এই শিশুদের বিরাট অংশ জড়িত শিশুশ্রম এবং তারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আর নিপীড়ন চলছে ছেলে শিশু মেয়ে শিশু বিচার না করেই।

ওয়েল্ডিং কারখানার শিশুটি মাস্ক পড়লো কিনা মালিক পক্ষ কখনোই তার খবর রাখেনা। লেদ মেশিনে কাটা আঙুলের হদিস আহত শিশুটি ব্যতিত অন্য কেউ জানে না। আগুনের ফুলকিতে অন্ধ প্রায় শিশুদের ভবিষ্যৎ কেউ রাখেনা, তেমনি ডান হাতের আঙুল হারানো কিশোরটির কথা ভুলে যায় সবাই। অথচ এদের জন্যেই ১৯৯৪ সালে প্রনীত হয়েছে জাতীয় শিশুনীতি। সেখানে শিশুদের উন্নয়ন, নিরাপত্তা, কল্যান, শিক্ষা সমৃদ্ধ ভীতিহীন নিরাপদ শৈশবের প্রত্যয় উল্লেখ করেছে স্বাভাবিক বিকাশের পথ থেকেই এখন অনেক দূরে। অন্যদিকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিকতায় বাসায় সহায়তাকারী শিশুটি কাজের লোক নামে পরিচিত। এই শিশুটির শিশু পরিচয় চলতি সমাজে আরো কঠিনভাবে বদলে যায়। মেয়ে শিশুটি শিশু নামটি ছাপিয়ে নারী অথবা মেয়ে রুপে বদলে যায়। আর সে জন্যই অনিমার মতো ৪-৫ বছরের মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়।

বঞ্চনার শিকার শিশুরা নিরাপত্তার মত বঞ্চিত শিক্ষা থেকে, নাম সাক্ষর করতে জানে না অনেকেই। সুতরাং প্রতিবাদের ভাষা যেন শব্দ সংকটে পড়ে যায়। শুধু হাত সরব থাকে ঘরের ভারী কাজে, থালা-বাসন ধোয়ায় বা কাগজ কুড়ানোর কাজে। সারাদিনে ১৫ ঘন্টা সময় জুড়ে এই কাজ করতে গিয়ে সম্ভ্রম হারানোর ঝুঁকিতে থাকে অনেক মেয়ে শিশু। আবার এদেরই সম্ভ্রম রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে সনদে। বলা হয়েছে সনদে সাক্ষরকারী প্রতিটি দেশ সকল প্রকার যৌন অপব্যবহার ও উৎপীরন থেকে শিশুকে বাঁচাবে, প্রয়োজনে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সকলে নিবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে।

- কোন বেআইনী যৌন কর্মে লিপ্ত হতে প্ররোচিত বা বাধ্য করা
- পতিতাবৃত্তি বা অন্যান্য বেআইনী তৎপরতায় ব্যবহার করা
- অশ্লীলতাপূর্ণ ক্রিয়াকর্মে অথবা বিষয়বস্তুকে শিশুসে ব্যবহার করা।

কিন্তু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে প্রথম সাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম দেশ বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রগুলি বারবার লংঘন করছে। ১৯৭৯ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রনীত এই পূর্ণর্বার সাক্ষর দিয়েও ৫৪ নীতির এই মালা এখনো বাংলাদেশগুলোতে ঝুলছে। জাতিসংঘ প্রনীত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনা পত্রে কারো প্রতি নির্যাতন অথবা অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরন করা যাবেনা বলা আছে। অথচ ব্যক্তি আমরা নিজের ঘরের কাজের মানুষটির খবর নেই না। রাস্তার সেলিনা রাসেল দূরে থাক। ক্রসফায়ারে নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানতে আমরা যতটা আগ্রহী সে পরিমাণ অনাগ্রহ আমরা পথ শিশুদের জন্য দেখাই না। তাদের নিপীড়ন কমাতে অগ্রসর হই না।

এই নিরব নির্যাতনের কোন বিচার আমরা দেখতে পাইনা। সাক্ষী প্রমাণ থাকেনা বলে অভিযোগ কেউ দায়ের করে না। সাক্ষী সাবুদ যোগাড় হলেও বিচারের বানী নিরব থাকে। কেননা রক্ষকের হাতে ইয়াসমিনের মতো কিশোরি নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরন করেছে। বিশ্ব পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রনীত করা হয়। বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই উন্নয়ন সম্ভব। আমরা চাই না কর্মজীবি শিশুরা বঞ্চিত, নিপীড়তদের প্রতিনিধি হয়ে থাক। আমরা তাই তাদের কর্মক্ষেত্র শৈশব হোক নিরাপদ ভীতিহীন।

৪০) অজানা আশঙ্কায় বিহ্বল বয়সন্ধিকালের শিশুরা কিশোরী....

খালেদা আক্তার লাবনী (নোয়াখালী) :

আমি কি মারা যাচ্ছি, এটা কি মরণের লক্ষণ এই ধারনা নিয়ে অজানা শংকায় বিহ্বল সময় কাটাচ্ছে নোয়াখালী জেলার কিশোর- কিশোরীরা। স্বাভাবিক জীবনের শারিরীক পরিবর্তন অনিশ্চিত হতাশায় ভূগছে তারা। নোয়াখালী সদর ও দক্ষিনাঞ্চলের বয়ঃসন্ধি কালীন কিশোর কিশোরীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, এই সময়টুকু সম্পর্কে তারা জানেনা বলেই নানান ধরণের ভীতি তাদের মাঝে কাজ করে। তথ্য না জানার সমস্যার সাথে আরো যুক্ত হয়েছে বয়োঃজেষ্ঠ্যদের দেয়া ভূল তথ্য। ভ্রান্ত ধারণা, বাবা মায়ের সাথে শারিরীক পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা না করা, এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে বা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্য না থাকা ইত্যাদি। বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরী, পরিবারের সদস্য, শিক্ষকসহ অন্যান্য পক্ষের সাথে কথা বলে জানা যায় বাবা মায়ের, শিক্ষকের পূর্ণ মনযোগ ও সঠিক তথ্যের অবারিত উৎস এ বয়সীদের ভীতি দূর করে পূর্ণ ব্যক্তিত্ববান করে তুলতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালীন শুরু হয় সাধারনত ১০ বছর থেকে, শেষ হয় ১৯ বছর বয়সের মধ্যে। এই সময়ে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক আবেগীয়, শারিরীক পরিবর্তন শুরু হয়। একই সাথে তৈরি হয় পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের প্রতি ভিন্নরকম চাহিদা হয়। মনে পরিবর্তন আসে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর আবেগ অস্থিরতা কাজ করে। নোয়াখালী জিলা স্কুল এর দশম শ্রেনীর ছাএ রহমান (১৫) মন্তব্য করেন - "আমার হঠাৎ ভালো হয়ে যায় আবার বিনা কারণে খারাপ হয়।"

এ সময়কার কিশোর-কিশোরীরা কেউ কেউ সৌন্দর্য সচেতন হয়ে উঠে। আবার অনেক মানুষের সামনে যেতে চায় না। শিশুকাল ও যৌবনকালের মাঝামাঝি এ সময়ে আবেগের পরিবর্তনের পাশাপাশি সবচে বেশি চোখে পড়ে শারিরীক পরিবর্তন। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি নিগ্রহের শিকার হয় অধিকাংশ কিশোরী। অনু (১৭) নামের কিশোরী বলে-"আমার পরিবর্তনের সময় আমার মা আমাকে মানসিকভাবে কোন সহায়তাই করেনি। বরং আমাকে সবসময় আলাদা করে রাখতেন। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অনেক মা-ই খুলতে রাজী হন নি। কেননা এ বিষয়ে কথা বলার বিষয়টি লজ্জাজনক।" রোকেয়া বেগম (৪৫) মন্তব্য করেন- "সঠিকভাবে সকল তথ্য আমরা অনেক অভিভাবকই জানিনা। শিক্ষকবৃন্দ এ বিষয়ে বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন হয়তো কিছু।"

এ বিষয়ে কথা হয় নোয়াখালী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আরতী সাহার সাথে তিনি বলেন -"এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় সহায়ক কোন অধ্যায় সাধারণ কোন অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত নেই। গার্হস্থ্য অর্থনীতি যারা বেছে নেয় তারা শ্রেনীতে সামান্য ধারণা পেলেও ছেলেদের সাথে কথা বলার মতো সুযোগ কোন শিক্ষকের হয় না। প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে এমন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ইউএনএফপিএ। নোয়াখালী শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত ডাঃ ফিরোজ এর সাথে কথা বলা হয় শিক্ষকদের তথ্য সরবরাহ করার সম্ভাবনা নিয়ে। তিনি বলেন-"জেলা শিক্ষক সমিতির মিটিং এ "নিজেকে জানো" নামক বইটি বিনামূল্যে বিতরণ করার কথা বলছিলাম। ছাত্র-ছাত্রী পাঠ উপযোগী নয় এই কারণ দেখিয়ে শিক্ষক মহলই আমাদের সবার আগে প্রত্যাখান করেছে।"

প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে জনমনে নানা জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা বিরাজমান আছে। ছেলেদের জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত কোন উৎস নেই। মৃধার হাট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র মালেক (১৬) মন্তব্য করেন- "স্থানীয় যুব সংগঠন এর লাইব্রেরীতে কৈশোরের ছেলে- মেয়েদের জন্য তথ্য সম্বলিত বই থাকলে ভালো হত। আমরা আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পেতাম।"

সোন্দলপুর ইউনিয়ন চেয়ানম্যান মোঃ আব্দুর রহিম বলেন-"এই সমস্যা সমাধানে আমাদের বাবা মায়ের হাতে তথ্য তুলে দেবার কাজ করতে হবে। গণমাধ্যমে ব্যপক প্রচারণা নিতে হবে।" অশ্বদিয়া ইউনিয়নের উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হাচিনা বেগন (৩৫) মন্তব্য করেন- "পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে পাঠ্য অন্তর্ভূক্ত করা

উচিত, যাতে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করা হয়।" সব মিলিয়ে সম্মিলিত তথ্য জানার প্রচেষ্টা ও এ বিষয়ক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা কৈশরের কিশোর-কিশোরিদের নিশ্চিত করতে পারে, নিরাপদ করতে পারে।

৪১) একজন মেহেরুন নাহারের সাফল্য গাঁথা

মোঃ নাসির উদ্দিন (নোয়াখালী) :

নারী নিজ দক্ষতা এবং কর্মগুনে অনেক অসামান্য অবদান রেখে চলেছে হাজার সীমাবদ্ধতার মধ্যে। কেউ কেউ কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও সততা ও কর্মদক্ষতা দিয়ে অলংকৃত করেছেন নিজ কর্মকে, গৌরবান্বিত করেছেন নারী জাতিকে। কিন্তু তাদের সাফল্যের কথা দেশব্যাপি পৌঁছায় না, তাদের সুখ দুঃখ তুলে ধরার কাউকে পাওয়া যায় না। এমনি এক সফল নারী মেহেরুন নাহার নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার সাত্রাপাড়া গ্রামের খোসাল হাজী বাড়ির গোলাম মাওলানার মেয়ে। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে সবার বড় তিনি। তার স্বামী সৌদি প্রবাসী নুরনবী খোকন, দুই মেয়ে বড় মেয়ে নারগিস সুলতানা রুপা মিরপুর বাংলা কলেজে অনার্স পড়ছে, ছোট মেয়ে ফাতেমা আক্তার সেতু চাটখিলের খিলপাড়া হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেনীতে পড়ছে। বিশ বছর ধরে সেলাইর কাজ, সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিকের কাজ করে আসছেন। এ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপসী রাবেয়া, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, মুন্নুজান, বেগম খালেদা জিয়া হল, ওয়াবদা ও জুট মিল কলোনী, ঢাকার মিরপুর, পাইকপাড়া, টাঙ্গাইলের আই এলও সেন্টার, চাটখিল যুব উন্নয়ন কেন্দ্রসহ উপজেলার সাত্রাপাড়া, শ্রীনগর, সিংবাহুরা গ্রামের দারিদ্রক্লিষ্ট, বৈষম্য বঞ্চনার বিপর্যস্থ প্রায় দশহাজার নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভালো একজন কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার প্রানান্তর চেষ্টা করেছেন। বহু নারী তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আজ ভালো কারিগর হয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন।

ছোটবেলা থেকে বৈষম্য বঞ্চনার শিকার মেহেরুন নাহার। ষষ্ঠ শ্রেনীতে থাকতে বিয়ে হয় চাটখিলের শ্রীনগর গ্রামের বেকার নুর নবী খোকার সাথে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র- ছাত্রী পড়িয়ে নিজে দশম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। মেহেরুন নাহার স্বামীর সংসারের দারিদ্রতার কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে রাজশাহী যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেন। অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেই একজন প্রশিক্ষক হন। তিনি শেখেন সেলাইর কাজ, ব্লক বাটিক, এমব্রোডারী, কনফেকশনারী, কেক, ফুটিং তৈরী, চাইনিজ রান্না, ফুল তৈরি, জ্বালানো মোম তৈরি। এসব শিখতে ও কাজ করতে গিয়ে স্বামীর অনেক অত্যাচার বঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছে। তার থেকে স্বামী নুর নবী খরচের টাকা নিলেও সবসময় জ্বালাতন করতো। মেহেরুন নাহারের সফলতা দেখে এক সময় স্বামী তার প্রতি খুব মুগ্ধ হয়। নিজ উপাজর্নের টাকা দিয়ে ২০০৪ সালে তার স্বামীকে সৌদি আরব পাঠান। মেহেরুন নাহার ১৯৯৮ সালে সিঙ্গার সুইং স্কুল অব দি বেস্ট রাজশাহী হন। তিনি ব্লক বাটিকের কাজ করে সিঙ্গার কোম্পানী শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কোম্পানীর সম্পূর্ন খরচে ২০০০ সালে ব্যাংকক সফর করেন। সেলাই কাজে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি সিঙ্গার সুইং ঢাকা হাইস্ট অব দি ইয়ার ২০০২ পুরস্কার পান। ব্লক বাটিক ও সেলাই কাজে সফলতার জন্য তিনি বিভিন্ন কোম্পানীর পক্ষ থেকে সফর করেন ব্যাংকক, ভারতের সিলং আগরতলা, নয়াদিল্লি সহ দেশের বহু স্থানে। শ্রাবনের পড়ন্ত বেলার কথা বলতে বলতে মেহেরুন নাহার বলেন-"আমি শহরে ভালো ছিলাম ভালো থাকতে পারতাম। কিন্তু আমাকে একটি স্বপ্ন তাড়া করে গ্রামে নিয়ে আসে। গ্রামের সুবধা বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত নিরীহ মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শালীনতার মাধ্যেমে একটি কুটির শিল্প বা মিনি গার্মেন্টস তুলবো। তাই গ্রামে এসে গড়ে তুলেছি 'এসো জীবন গড়ি নারী সংগঠন'। এই সংগঠনের অধীনে এখন প্রায় ২০০ প্রশিক্ষনার্থী আছে। এখানকার অধিকাংশ মেয়ে নিরীহ অভাবী সংসারের মেয়ে, পারিবারিক সুবিধাবঞ্চিত। পিনু (১৬), সেতু (১৫), ফাতেমা (১৭), ফেন্সী (১৮), রিনা (১৭), আরজু (১৫), রোজিনা (১৩) জানান, আপা খুব ভালো, তাদের অত্যন্ত যত্ন করে কাজ শেখান। সেলাই,

ব্লকবাটিক কাজের বাহিরে শিখান পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হয়। তারা আবও জানায়, আপার কথা হলো তার ভাসুর এবং গ্রামের বখাটেরা তাকে নিয়ে যতই কুৎসা রটাক, সে প্রথা ভাঙ্গতে চায়। বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামালের মত হতে চায়।
মেহেরুন নাহার বলেন-"আমার ভাসুর এবং গ্রামের বখাটেরা আমার স্বামীর কাছে প্রবাসে ফোন করে তাকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে, আমার স্বামী যদি ভুল বোঝে, আমার কোনো দ্বিমত নেই। তবু আমি আমার সংগঠনকে অনেক দূর নিয়ে যেতে চাই। স্বামীর এবং আমার অর্থে স্বামীর ভিটায় দালান করেছি। ওখানেই প্রশিক্ষণ দিই। আমার মেয়েরা বড় হয়েছে, ওরা আমার কাজে সহযাগিতা করে। আমার মেয়েদের এবং প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই।" তিনি জানান, বিগত ২০ বছর ধরে কাজ করছেন কিন্তু কোন ব্যাংক, সংস্থা থেকে ঋণ বা অনুদান নেননি। তারপরও এসো জীবন গড়ি নারী সংগঠনের আছে ১০টি সেলাই মেশিন, ১ হাজার ব্লক, ১টি এমব্রোডায়ারী মেশিন, টেবিল, ব্লাক বোর্ডসহ বিভিন্ন সেলাইর সরঞ্জামাদী। তিনি বলেন-"আমি মনে করি একটি সংগঠন দাঁড় করাতে আরো অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। যদি সরকারী বা বেসরকারীভাবে আর্থিক সহযোগিতা পাই এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সহযোগিতা পাই তাহলে এই সংগঠন অধিকারবঞ্চিত নারীদের স্বপ্ন গড়ার জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।"
(ছবি আছে)

৪২) মাইজদীতে কর্মহীন নারীরা জড়িয়ে পড়ছে ভিক্ষাভিত্তিতে

রাবেয়া সুলতানা নাজনিন (নোয়াখালী) :

বিবি মরিয়ম, নুরজাহান, আলেয়া, জোবেদা এদের প্রত্যেকের একটা সোনালী অতীত ছিল। ছিল সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন। কিন্তু একান্ত আপনজনদের অযত্ন, অবহেলা, নিষ্ঠুরতা, আর কিছু দূর্ঘটনা তাদেরকে ঠেলে দিয়েছে অনিশ্চয়তার পথে। যে পথে আছে শুধু ধিক্কার আর অপমান। কিন্তু সবার লাঞ্চনা আর গঞ্চনা শিকার সহ্য করেও বেঁচে থাকার অন্য কোন পথ না পেয়ে তাদেরকে আগাতে হয়েছে ভিক্ষা বৃত্তিতে। বিবি মরিয়মের (৬০) স্বামীর বাড়ি ছিলো রামগতি থানার সেবা গ্রামে। স্বামীর ব্যবসা বানিজ্য ছাড়াও ছিলো চাষাবাদের অনেক জায়গা জমি। তাদের সুখের সংসারে আর বাড়তি সুখের ছোয়া নিয়ে আসে ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান। যে সন্তানকে নিয়ে স্বামী- স্ত্রী দুজনেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ভাবে নিজেরা লিখতে পড়তে না জানলেও ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে। কিন্তু একমাত্র ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার আশা বুকে বাধার পাশাপাশি মরিয়মের স্বামীর শরীরে কখন বাসা বেঁধেছে কঠিন এক ব্যধি তা কেউ বুঝতে পারেনি। তাই সঠিক সময়ে চিকিৎসাভাবে মারা যান তার স্বামী। স্বামীকে হারিয়ে মরিয়ম শারিরীক ও মানসিকভাবে অনেকটা দূর্বল হয়ে পড়লেও আর্থিকভাবে তখনও ছিলেন সবল। কারণ তার সম্বল ছিল স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদগুলো। যে গুলো পরিচালনা করে মা ও ছেলের ছোট সংসারটি সুন্দরভাবে চালাতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। কারণ মেঘনার ভয়াল থাবা কেড়ে নেয় মরিয়মের ভবিষ্যতের সম্বলগুলো, এমনটি ভিটে মাটিটুকু। আর তাই ভাটা পড়ে মরিয়মের সব আশার।
সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব মরিয়ম ছেলেকে নিয়ে চলে আসেন মাইজদী শহরে। এখানে এসে একটা কাজের আশায় অনেক ঘুরেছেন তিনি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরও একটা কাজের যোগাড় করতে পারেননি তিনি। অবশেষে বাধ্য হয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে, পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে হাতে তুলে নেন ভিক্ষার ঝুলি। সেই থেকে দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ ভিক্ষা করে যাচ্ছেন মরিয়ম। আর এতটা সময়ের ব্যবধানে বড় হয়ে যায় মরিয়মের সেই ছেলেটি। সে এখন বিয়ে করে বৌ নিয়ে আলাদা থাকে, বৃদ্ধা মায়ের কোন খোঁজ নেয়না। কিন্তু সহায় সম্বলহীন মরিয়ম ভেবেছিলেন বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল।

নুরজাহান (৭২) নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামে থাকেন। তিনি জানান, এক সময় তার স্বামী সন্তান সবই ছিলো, ছিলো সাজানো গোছানো সংসার। যে সংসারে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য স্বামী -স্ত্রী দুজনেরই চেষ্টা ছিলো। নুরজাহানের স্বামী ছিল বাস চালক, আর নুরজাহান বাড়তি আয়ের জন্য সেলাইয়ের কাজ করতেন। আরও বলেন তারা দুজনে মিলে যে আয় করতেন তার পুরোটা ব্যয় করতেন চার সন্তানের পিছনে। ভাবেননি নিজেদের ভবিষ্যতের কথা। আশা ছিল এ সন্তানরাই হবে তাদের ভবিষ্যদের সম্বল, যে সন্তানদের উপর বৃদ্ধ বয়সে নির্ভর করতে পারবেন তারা। কিন্তু সড়ক দূর্ঘটনায় বাবার মৃত্যুর পরে সন্তানরাই মাকে একা রেখে আলাদা হয়ে যায়। কোন খবর রাখেনি অসুস্থ মায়ের। তাই বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে লাঠি ভর দিয়ে ভিক্ষা করতে হয় নুরজাহানকে। যেদিন শরীরটা খুব বেশি খারাপ লাগে সেদিন ঘরে উপোস শুয়ে থাকেন তিনি। নুরজাহান বলেন-"একদিন হয়তবা ঘরে মরে পঁচে থাকবো কেউ জানবেনা, এমনকি আমার ছেলেমেয়েরা, আমিও চাইনা ওরা জানুক।"
জোবেদা (৪৫) জানান,তার এক ছেলে এক মেয়ে। স্বামী বর্তমানে বেকার হলেও এক সময়ে তিনি ভ্যান চালিয়ে ভালোই রোজগার করতেন। এখন অসুস্থ হওয়াতে তিনি কাজে যেতে পারছেন না। তাই জোবেদাকে এখন সংসার চালাতে হয়। জোবেদা খুব ভোরে ঘর থেকে বের হন একটু সাহায্য পাবার আশায়। কিন্তু সাহায্যতো দূরের কথা অনেকেই তাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে। তাদেরকে দেখলে দরজা বন্ধ করে দেয়। জোবেদা বলেন-"ভিক্ষা করি বলে সমাজের কেউ আমাদের সম্মান দিয়ে কথা বলে না, সবাই খুব ছোট ভাবে।" জোবেদার ভালো লাগেনা এ অপমানকর পেশা। জোবেদার মত সবাই ঘরে আসতে চায় এ পেশা থেকে। হাতে নিতে চান না ভিক্ষার থালা। তারা বলেন-"শুনেছি সরকার বয়স্ক আর বিধবাদের নাকি ভাতা দেয় কিন্তু আমরা কখনো সেই ভাতা পাই নি। এমনকি সরকারী বেসরকারী কোন সংস্থার সহযোগিতাও না। যতি সরকারী বেসরকারী সংস্থাগুলো আমাদের জন্য কর্ম সংস্থানের কোন সুযোগ সৃষ্টি করতো তাহলে খুব ভালো হত। আমরা ভিক্ষা নয়, কাজ করে যেতে চাই, মুক্তি পেতে চাই এ পেশা থেকে। চাই সম্মানজনক কোন কাজ যে কাজ করলে কেউ আর আমাদের ছোট ভাবতে পারবে না। পারবে না অপমান করতে।"

৪৩) সাহাপুরে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে বাল্য বিয়ের হার

রাবেয়া সুলতানা নাজনিন (নোয়াখালী) :

অশিক্ষা, কুসংস্কার, অভাব আর অজ্ঞতার কারণে সাহাপুরে বাল্যবিয়ের হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এর ফলে সাহাপুরের নারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শারিরীক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের দিক থেকে।
পর্যাপ্ত নারী শিক্ষার হার বাড়িয়ে, কুসংস্কারাছন্ন মনোভাব দূর করে এবং বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে ব্যপক প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে এ সমস্যা নিরসন করা যাবে বলে ভুক্তভোগী, জনপ্রতিনিধি, অভিভাবক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান। নোয়াখালীর সদর উপজেলার পৌরসভার অন্তর্গত সাহাপুর গ্রামে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বসবাস। এক সময় সেখানে ছিল বিস্তৃত খাল, আর এই খাল থেকে জেগে ওঠা চরেই বাস করছে গ্রামবাসীরা। কিন্তু তারপরেও সরু হয়ে যাওয়া খালটিতে বয়ে যাচ্ছে পানি। ঠিক যুগযুগ ধরে যেভাবে বয়ে আসছে, এতে যেমন কোন পরিবর্তন হয়নি, তেমনি পরিবর্তন হয়নি এ গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবন মানসিকতা। এখানকার অধিকাংশ অভিভাবক এখনো নারী শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন। তারা মনে করেন মেয়েদের পড়ালেখা করালেও তাদের কোনো কাজে আসবেনা। তেমনি অভিভাবক আবুল কাশেম (৫০) বলেন -"মেয়েদেরকে বেশি পড়ালেখা শিখিয়ে কোন লাভ নেই।" এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন-"ওরাতো আর টাকা পয়সা উপার্জন করে আমাদের খাওয়াতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক সেইতো শশুরবাড়ি গিয়ে ভাত রান্না করতে হবে।" আর এ ধারণা পোষন করে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন একমাত্র মেয়ে জেসমিনের।

জেসমিন (১৯) জানায়, তার লেখাপড়া করার ইচ্ছে থাকলেও বাবা মায়ের কারণে পারেননি । আর অনেক কিছু সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে স্বামীর সাথে মতের মিল না হওয়ায় প্রায় ঝগড়াঝাটি হত তাদের। আর এরই রেষ ধরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাদের। জেসমিনের এখন একটাই চিন্তা তার ফুলের মত বাচ্চা মেয়েটার এখন কি হবে? কি তার ভবিষ্যত?

কুড়িতে নাকি মেয়েরা বুড়ি হয়ে যায় এ কুসংস্কার বিশ্বাস করে আর ধর্মীয় গোড়ামীর কারণে জোৎস্নাকে বিয়ে দেন তার বাবা। বয়স কম হওয়ার কারণে অনেক কিছুই জানতো না জোৎস্না। আর তাই গর্ভাবস্থায় শরীরের ঠিকমত যত্ন নিতে না পারায় গর্ভকালীন জটিলতায় ভোগেন তিনি। অভাবের সংসারে মেয়েদের বোঝা মনে করেন অনেক অভিভাবক। আর এই অভাবের কারণে মাত্র তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আলেয়ার। আলেয়া জানান, বয়স কম বলে সংসারের কোন কাজেই তার মতামত নেয়া হয় না। তাই সব সময় হীনমন্যতায় ভোগেন তিনি। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়াতে একাধিক সন্তানের জন্ম দেয়াতে তিনি এখন ভূগছেন নানা ব্যধিতে। অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভূগছেন মা ও সন্তানেরা। এমনকি তিনি এখন শারিরীক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

এলাকায় বসবাসরত প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ধাত্রী ঝর্না (৩৬) জানান, বাল্য বিয়ের কারণে এখানকার মেয়েরা অল্প বয়সে গর্ভধারণ করতে গিয়ে গর্ভকালীন জটিলতায় ভোগে। মা ও শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে, ফলে গর্ভবতী মায়ের রক্তশুন্যতার কারণে মা ও শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা বেড়ে যায়। তিনি মনে করেন মেয়েদের পযাপ্ত সুযোগ দিলে বাল্য বিবাহের অনেকটা রোধ হবে।

এলাকার জনপ্রতিধি তাজুল ইসলাম তাজু বলেন-"বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে বাল্য বিয়ের হার কমানো যাবে।"

একজন অভিভাবক ফারুক (৫০) বলেন -"এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এখনও অসচেতন। আর অসচেতনতার কারণে তারা বিশ্বাস করছে নানা ধরণের কুসংস্কার। তাই এখানকার মানুষের কুসংস্কারের মনোভাব পরিহার করার বাল্য বিয়ের প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস করা যাবে।"

৪৪) মাকে বাবা বলে ডাকে ফাহাদ

রাবেয়া সুলতানা নাজনিন (নোয়াখালী) :

হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা পাঁচ বছরের ছোট শিশুটি যখন কচি মুখখানিতে একরাশ বিষন্নতা নিয়ে মা হাছিনাকে জিজ্ঞেস করে মা আমার কি হয়েছে, আমি কি আর বাঁচবোনা, আমি কি আর খেলার মাঠে গিয়ে খেলতে পারবোনা মা? ফাহাদের ছোট্টমুখে এতবড় কথা শুনে অবাক হয়ে যান তিনি। আর ভাবতে থাকেন আসলেই কি আমার ছেলে বাঁচবেনা, আর কখনো আমাকে মা বলে ডাকবেনা? তখন কি নিয়ে বাঁচবেন? কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবেন? কার নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে ভুলে থাকবেন তার দুঃখ কষ্ট। কারণ এ ছেলেই যে তার একমাত্র অবলম্বন।

নোয়াখালীর সদর উপজেলার সাহাপুর গ্রামে ফাহাদ নামের এ অসুস্থ শিশুটি তার নানার বাড়িতে থাকে। এখানেই তার জন্ম, এখানেই তার বেড়ে ওঠা। ফাহাদ যখন তার মায়ের গর্ভে তখনই তার যৌতুক লোভী বাবার নির্যাতন সইতে না পেরে তার মা হাসিনা চলে আসে বাবার বাড়িতে। এরপর থেকে তার বাবা আর কোন খোঁজ-খবর নেননি। ফাহাদের মা বলেন তাকে বিয়ে করার আগে তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করে, যা গোপন রাখা হয়। এমনকি এখন সে আরেকটি বিয়ে করেছে। এটা জানার পর তারা থানায় মামলা করে, কিন্তু এখন আর মামলার খরচ চালাতে পারছেন না। যার ফলে পাচ্ছন না মামলার ন্যায্য বিচার। পারছেন না অবুঝ বাচ্চাটিকে বুঝাতে কে তার বাবা। কারণ ফাহাদ জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তার বাবাকে এক মূহুর্তের জন্য দেখেনি। ফাহাদ কখনো জানতে চায়নি তার বাবা কোথায়, কেন

তার বাবা আসেনা। কারণ ফাহাদ তার মাকেই বাবা বলে ডাকে। কিন্তু তার মা মনে করেন তিনি তার ছেলের প্রতি বাবার দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। না হলে আজ প্রায় দু বছর যাবৎ ফাহাদ কিডনী সমস্যায় ভুগলেও কেন তার সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছেন না। আর পারবেনই কিভাবে, বাবার তালি দেয়া সংসারে মা ও ছেলে দুজনে কোন রকমে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার উপর আবার একমাত্র ছেলের এ কঠিন ব্যধি কিভাবে ছেলের চিকিৎসার টাকা যোগাড় করবে তাই ভেবে দিশেহারা তিনি।

৪৫) অকালে ঝরে পড়তে চায় না সীমা নামের মেয়েটি

রাবেয়া সুলতানা নাজনীন (নোয়াখালী) :

সীমাহীন কষ্টে কাটছে সীমা (১৩) জীবন। অনেক সাধের এ জীবন এখন আর ভালো লাগে না সীমার। দিন রাত বিছানায় শুয়ে থেকে জরাজীর্ণ বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা আকাশের দিকে তাকিয়ে সীমা কার দীর্ঘশ্বাস লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। ভাবে এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকতে হবে। তার এ কষ্টে জন্য সে তার ভাগ্যকে দোষারোপ করে। না হলে কেন রিকসা চালক বাবার সংসারে তার নাম না জানা অসুখ বাবা মায়ের কষ্টের ভার আরও বাড়িয়ে দেবে। কেন তার চিন্তায় তার বাবা মা একটা রাতও ঠিকমতো ঘুমাতে পারবে না।

সীমার বাবা মায়ের একটাই চিন্তা কি হবে তাদের মেয়ের। অসহায় বাবা মায়ের চোখের সামনে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের মেয়েটি। কিন্তু কি করবে তারা, তারা যে নিরুপায়। নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলার সাহাপুর গ্রামের ছোট্ট একটা ঘরে সীমার পাঁচ ভাইবোন সহ তার বাবা মা কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে। সীমাদের জোড়াতালি দেয়া সংসারে অভাব থাকলেও তারা একেবারে অসুখী ছিল না। কিন্তু সীমার অসুখ এসে কেড়ে নিয়েছে তাদের যত সুখ। সুখ গেলেও যায়নি তাদের আত্ম সম্মানবোধ। তাই শত কষ্টে থেকেও কারো কাছে ছোট হওয়ার ভয়ে কখনো হাত পাতেননি সীমার বাবা আলী (৪০)। অসুস্থ আলী ছেলেমেয়ের মখে একমুঠো ভাত তুলে দেয়ার জন্য রিকসার প্যাডেলে চাপ দিয়ে রিকসার চাকা ঘুরাতে পারলেও পারেননি জীবনের চাকা ঘুরাতে। তার ধারণা জীবনের চাকা ঘুরাতে পারে শিক্ষা। কিন্তু তিনিতো লেখাপড়া জানেন না, তাই অসুস্থ শরীরে শরীরে রিকসা চালিয়ে উপার্জন করতে হবে তাকে। কারণ তার দিকে চেয়ে আছে অনেকগুলি মুখ। তিনি নিজে লেখতে পড়তে না পারলেও ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে তার আগ্রহের কমতি ছিল না। কিন্তু দারিদ্রতার কারণে বড় দুই মেয়েকে লেখাপড়া করাতে না পারলেও সীমার প্রবল ইচ্ছার কারণে তাকে ভর্তি করিয়েছিলেন ষষ্ঠ শ্রেনীতে। পড়াশুনায় খুব ভালো ছিল সীমা। স্কুলের ম্যাডামরা খুব আদর করতো তাকে। সীমার খুব ইচ্ছা ছিল কষ্ট হলেও লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। নিজেকে নিয়ে পরিবারকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল সীমার। যে চোখ দিয়ে সীমা স্বপ্ন দেখতো আজ সে চোখে ঝরে শুধু পানি। সীমার স্বপ্নগুলো আজ ঝাপসা হয়ে গেছে। নিজেকে এখন সে পরিবারের বোঝাভাবে, কারণ তার যে অসুখ হয়েছে তার চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়।

সীমা বা তার পরিবার জানে না কি সে রোগ। তবে সীমা যখন খুব বেশি অসুস্থ হয়ে যায় তখন তাকে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে কতর্ব্যরত চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন সীমাকে ঢাকায় এনে ভালোমত চিকিৎসা করানোর জন্য। কিন্তু ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করানোর মত সামর্থ্য না থাকায় সীমার বাবা মা তাকে স্থানীয় এক কবিরাজের কাছে নিয়ে গেলে কবিরাজ সীমার মাথার বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়ে যাওয়া অংশ থেকে এক ধরণের পোকা বের করে, যা সীমার বাবা মাকে আরও চিন্তায় ফেলে দেয়। দিন যতই যাচ্ছে সীমার শরীরের অবস্থা ততই খারাপ হয়ে পড়ছে। সহপাঠীরা যখন স্কুলে যায় সীমা তখন অপলক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরিবারে কারও সাথে ঠিকমতো কথা বলতে চায় না, এখন ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করে না। শুধু দিন রাত ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। সারাদিন উপোস থেকেও যার মুখের হাসি মলিন হয়নি সে মুখে আজ নেই হাসির রেখা। সীমা এখন হাসতে ভুলে গেছে, কারণ

অনিশ্চতার সাগরে ভাসছে আজ সীমার জীবন। কিন্তু সীমা বাচঁতে চায় সুন্দর এ পৃথিবী থেকে ঝরে পড়তে চায় না।

৪৬) শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, শ্রেনীকক্ষ আর দায়িত্বশীলতার অভাব

বেগমগঞ্জের দ: পূ: একলাশপুর প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত

গোলাম মহিউদ্দিন নসু (নোয়াখালী) :

বেগমগঞ্জের দ: পূ: একলাশপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র স্বল্পতা এবং স্থানীয় অভিভাবকের সচেতনতা ও দায়িত্বশীলদের আন্তরিকতার অভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সরেরজমিন ঘুরে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপে এ তথ্য জানা গেছে। একলাশপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকায় দ: পূ: একলাশপুর প্রাইমারী স্কুলের অবস্থান, এলাকার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যাবস্থা নিুমানের। এখানে কোন ভাল শিক্ষক চাকরি করতে আসেন না। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা একেবারেই রুটিনমাফিক স্কুল পরিদর্শন করেন। বর্তমানে দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তিনজন শিক্ষক। ৪ টি শ্রেণীকক্ষে অপ্রতুল আসবাবপত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের জায়গার সংকুলান হয় না। শিক্ষা উপকরণের অভাব আর ব্যাবহার অনুপোযোগী খেলার মাঠের কারনে সহপাঠ শিক্ষা কার্যক্রম নাই বললেই চলে। বিগত ৩/৪ বছর পাশের হার শূণ্য। গত বছর পঞ্চম শ্রেণীতে পাশ করেছে ১৭ জনে ২ জন। গ্রামবাসীর অভিযোগ শিক্ষকরা সময়মতো আসে না, ঠিকমতো পড়ায় না। এ কারনে ক্ষমতাবানরা তাদের ছেলে মেয়েকে অন্য স্কুলে অথবা পাশের নূরানী মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকরা অগ্রহ করে পড়ায় না বিধায় একসময় তারাও আসে না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অভিভাবক বলেন-“সহকারী শিক্ষক মফিজউল্যা ৮/৯ বছর যাবত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তার বাড়ীও এখানে। তিনি ভাল শিক্ষকও নয় তাছাড়া সময়মতো স্কুলে আসেন না।”

প্রধান শিক্ষকের কক্ষে স্কুল চলাকালীন সময়ে নানা সালিশ দরবার চলে। ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি কামাল মিয়ার সাথে আলোচনায় জানা যায় তার মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে, রোল নাম্বার কত, ১ম সাময়িক পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কত পেয়েছে তার কিছুই সে জানে না। সর্বপরি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব কি তাও বুঝেন না। সভাপতি পারভেজ বললেন- “হেড মাষ্টার নিজ ইচ্ছায় সব করেন আমাদেরকে তেমন কিছু জানান না। নিদিষ্ট সময়ের আগে স্কুল ছুটি হয়ে যেত। বিষয়টির সত্যতা পেয়ে সরকারী কর্মকর্তারা ৩/৪ বছর যাবৎ উপবৃত্তি বন্ধ করে দেয়।”

জানা যায় একটি বেসরকারি উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠান ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) এক সভায় দেয়া ওয়াদার ভিত্তিতে শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা কর্মকর্তা সম্প্রতি উপবৃত্তি পুন: চালু করার ব্যাবস্থা করেছেন। ৪র্থ শ্রেণীর কুলসুম বলে-“আমরা সবসময় স্কুলে আসি, আমাদের উপবৃত্তির টাকা দিলে, দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করলে আরো ছাত্র- ছাত্রী বাড়বে।”

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মফিজউল্যা জানান, স্থানীয় জনগনের সচেতনতার অভাবে ছেলে মেয়েরা স্কুলে কম আসে। স্কুলের শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র আর শিক্ষা উপকরণের অভাবে পাঠদান ব্যাহত হয়। মাঠের অভাবে খেলাধূলা ও সহপাঠমূলক কার্যক্রম করা যায় না। স্থানীয় মেম্বার চাঁদ মিয়া জানালেন বলেন- “স্কুলের কোন সমস্যা নিয়ে কেউ আমাদের জানায়নি”। চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান বলেন- “শিক্ষা অফিসার সাহেবরাই চান না - গ্রামের স্কুল গুলিতে ভাল লেখাপড়া হোক। যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই ভাল মন্দ মিলিয়ে শিক্ষক দিতেন। নিয়মিত পরিদর্শন করতেন। যাদের অপরাধে উপবৃত্তি বন্ধ হলো, ছাত্র-ছাত্রী কমে গেল -অবশ্যই তাদের শাস্তি হতো”।

তিনি আরও বলেন-"রাস্তার পাশের স্কুলগুলিতে চাকরির জন্য সবাই তদবির করে, গ্রামের স্কুলগুলিতে কেউ যেতে চায় না একলাশপুর প্রাইমারি স্কুলে ৪ শত জন ছাত্রের জন্য ১০ জন শিক্ষক তন্মধ্যে ৯ জনই মহিলা। তিনি শিক্ষা কর্মকর্তাগণ এ সব অন্যায় অনিয়মকে জেনেশুনে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষা কর্মকর্তাগন সততার সহিত দায়িত্বশীল হলে আমরা যে কোন সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত আছি।" সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আক্তার জামান জানালেন, বন্ধ থাকা উপবৃত্তি পূনরায় চালু করা হয়েছে। ৩ জন শিক্ষক পদ শূন্য আছে। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পেলেই আরেকজন পোষ্টিং দেয়া হবে।

৪৭) ধানের টাকা নিয়ে
একলাশপুর গ্রামের নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারছে না।
গোলাম মহিউদ্দিন নসু (নোয়াখালী) :
সরকারী-বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠনগুলি নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা ধরনের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকৃতপক্ষে ঋণ প্রদাণের উদ্দেশ্য যাচাই না করে অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলি পারস্পরিক সমন্বয় না করে একেবারেই ব্যাবসায়িক দৃষ্টিকোনে ঋণ বিতরণ করছে। ফলশ্রুতিতে বেগমগঞ্জের একলাশপুর এলাকার শত শত নারী নি:স্ব থেকে নি:স্ব হত দরিদ্র হয়ে নানা রকমের হয়রানির শিকার হচ্ছে।

কৃষি ব্যাংক, সমাজকল্যান বিভাগ, আনছার-বিডিপি অফিস, গ্রামীন ব্যাংক, আশা সমিতি, বি আর ডিবি সহ বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রামের গরীব নারীদের মাঝে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ বিতরন করছে। নামমাত্র সমিতি করে ৫/১০/১৫/২০ হাজার টাকার মতো ঋণ দিয়ে চড়া সুদ যোগ করে টাকা আদায় শুরু করে। হাঁস মুরগি পালন, গবাদি-পশু পালন, শাক-সবজির বাগান, মৎস্য চাষ সহ ইত্যাদি প্রকল্প দেখিয়ে ঋণ বিতরন করা হলেও মূলত: এসব কাজে ঋণের টাকা ব্যবহার হয় না। ঋণ নিয়ে অনেকেই ঘর বানায়, যৌতুক দিয়ে মেয়ে বিয়ে দেয়, অভাবের দিনে ঋণের টাকা দিয়ে সংসার চালায়। ঋণ পরিশোধকালে বাধ্য হয়ে ঘটি-বাটি বিক্রি, ধার কর্জ আর অন্য সমিতি থেকে আরেকটি লোন নেওয়ার ধান্দায় থাকে। এক সমিতির দেনা শোধ করার জন্য অন্য সমিতি থেকে আবার ঋণ গ্রহণ করে। এভাবেই ঋণের বোঝা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে ঋণের দায়ে নি:স্ব থেকে নি:স্ব হয়ে আস্তে আস্তে হতদরিদ্রে পরিনত হয়।

মধ্য একলাশপুর গ্রামের মর্জিনা (২৮) কৃষি ব্যাংক, গ্রামীন ব্যংক আর আনছার বিডিপি অফিস থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। স্বামীকে বিদেশ পাঠাতে সে টাকা খরচ করে। বর্তমানে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে পালিয়ে বেড়াতে দেখা যায়। তৈয়বের নেছা (৪৫) কৃষি ব্যাংক, গ্রামীন ব্যংক থেকে টাকা নিয়ে ঘর বানিয়েছে। নিয়মিত কিস্তির টাকা শোধ করতে না পেরে আশা সমিতি থেকে আবার ঋণ নিয়ে কিস্তি দেয়ার চেষ্টা করছে। মোল্লা বাড়ীর ফজর বানু (৪৬) মৎস্য ঋণ নিয়ে ঘর করেছে। কিছু টাকায় দোকান দিয়ে পুঁজি হারিয়ে বসত ভিটার আংশিক জায়গা বিক্রির চেষ্টা করছে।

শামছুন্নাহার ব্রাক থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নেয়। ঋণের কিছু টাকা ভাই নিয়ে যায়। বাকী টাকা স্বামী খরচ করে। ঋণ দাতা সংস্থাগুলি ঋণের টাকায় প্রকৃত কাজ হচ্ছে কিনা এসব বিষয় তদারকি না করার ফলেই এসব সমস্যা তৈরি হয়। ব্রাকের মাঠ কর্মকর্তা মনির খানের সঙ্গে আলাপ কালে বলেন-"ঋণ কার্যক্রম আমাদের করতেই হয় তাই অনেক কিছুই দেখা সম্ভব হয় না। একই এলাকায় অনেক সংগঠন কাজ করে। তাছাড়া পারস্পরিক সমন্বয় রাখার কোন সুযোগ নাই। সে কারনে একই ব্যক্তি কয়েক জায়গা থেকে লোন নিতে পারে।" গ্রামীন ব্যাংক ম্যানেজার হারুন হাজারি বললেন-"আমাদের মাঠ

কর্মকর্তার মাধ্যমে সমিতি গঠন করি। নানা উন্নয়ন কার্যক্রম প্রশিক্ষিত করে ঋণের টাকা হস্তান্তর করি। অন্যান্য সংগঠনগুলির অনেকেই এসব নিয়ম রক্ষা করতে পারেনা। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সমন্বয় তৈরি করতে পারলে এলাকায় উন্নয়ন তরান্বিত হতো। ঋণের প্রকৃত ঋদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতো।" চেয়ারম্যান জানান, ঋণের টাকা বিতরনের সময় কেউ কিছু জানায় না। সমস্যা হলে ঋণের টাকা উসুল করতে অভিযোগ নিয়ে আসে। ঋণ বিতরনের সময়ে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা আরো গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।

৪৮) যেমন চলছে যোবায়ের বাজারের নারী মার্কেট

গোলাম মহিউদ্দিন নসু (নোয়াখালী) :

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিত চরাঞ্চলের নারী মার্কেট প্রকল্পটি বড়ই দুর্দশাগ্রস্থ। স্থানীয় চাহিদা যাচাই না করা, পুঁজির অভাব আর পরিকল্পনা বিহীন উদ্দ্যোগই এ জন্য দায়ী। সংশ্লিষ্ট জনদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁশ, বেত, পাটি পাতা সহ স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। সরেজমিন ঘুরে নারী মার্কেট দোকানী, বাজার কমিটি, ভোক্তাসহ অভিজ্ঞজনদের সাথে আলাপে এ তথ্য জানা যায়।

নোয়াখালী শহর থেকে ৪০ কি: মি: দক্ষিণে ২০০৪ সালে ২২ লক্ষ্য ৪৮ হাজার ৭ শত ১৬ টাকা ব্যয়ে সুবইচর উপজেলার যোবায়ের বাজারে ৯ কক্ষের একটি নারী মার্কেট নির্মিত হয়। চরাঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আত্ম-নির্ভর করার লক্ষ্যে ইউ এস আইডি এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্যাবসার শুরুতে স্থানীয় চাহিদা বা ভবিষ্যত পরিকল্পনা যাচাই না করে স্থানীয় প্রভাবশালী আর ধনাঢ্যদের পরামর্শে অদক্ষ নারীদেরকে দোকান ঘর বরাদ্ধ দেয়। প্রতি জনকে ৫ হাজার টাকা পুঁজিও দেয়। অপরিপক্ক দোকানীরা মুদি-মনোহারী, পান-সুপারির ব্যবসা শুরু করে। বাজারের পুরোনো ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতায় এক বছরের মধ্যেই পুঁজি শেষ। এ বাজারের মোট ক্রেতার ৪০/৫০ জন নারী হওয়ার পরও টিকলো না নারী মার্কেট।

আসমা পান বিতানের মালিক নারী মার্কেট সভানেত্রী অনিমা রানী বলেন-"মাঠে কাজ করতাম, ডাল, মরিচ, ধান ইত্যাদি কেনা বেচা করতাম। সাহেবদের পরামর্শে পান -সুপারির দোকান দিলাম প্রথমে এ ব্যবসা বুঝতাম না। এখন কিছুটা বুঝলেও পুঁজির অভাবে চালান করতে পারি না। দোকানে যে আয় হয় তা দিয়ে চলে না। ছেলে-মেয়েদের এখনও মাঠে কাজ করতে হয়। পান-সুপারি কম-বেশী সবাই কিনে বিধায় এখনও কোন রকমে টিকে আছি।"

জানা যায় পুঁজির অভাবে মুদি দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। ৯ জন দোকানীর মধ্যে দু'জন এখনও টিকে আছে। বাকীরা বাঁশের খাচা, ওরা, লাই, ডুলা, খারি, খাঞ্চি, পাটি পাতার পাটি ইত্যাদি তৈরি করে স্থানীয় বাজারগুলিতে সরবরাহ করছে। অন্য প্রশ্নের জবাবে অনিমা জানায় হিসাব লিখতে জানিওনা, রাখিওনা, যখন যা লাগবে খরচ করি। হিসাব রাখার দরকার হয় না। নারী মার্কেট সেক্রেটারী হাছিনার কসমেটিকস দোকান সকাল ১১ টায় বন্ধ করে চলে যায়। এ ব্যবসায় পোষায় না। বাড়ী গিয়ে বাঁশ-বেতের কাজ করে, পাটি বানায়। এসব করে দোকান থেকে ভাল আয় হয় মেম্বার-চেয়ারম্যানসহ উদ্যোগী সংস্থা স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে বাজার সৃষ্টির ব্যবস্থা নিতে পারে। স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে দোকানগুলিতে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম শুরু করার সুপারিশ করেন।

যোবায়ের বাজার কমিটির সেক্রেটারী বেলালউদ্দিন জানায়, ৭০/৮০ জন দুস্থ নারীদের মাঝে ইন্টারভিউ নিয়ে চেয়ারম্যান ৯ জনকে বাছাই করেছেন। তবে এ ব্যবসায় তারা টিকছে না টিকবেও না। এখানে

বাঁশ, বেত পাটিপাতার কাজ নেয়া হলে ভাল করবে। এ কাজ তারা নিজেরাও জানে। প্রশিক্ষণ দিলে আরো ভাল হবে। এলাকার ক্রেতারা মাইজদী থেকে এসব জিনিস ক্রয় করে। পরিকল্পনামতে বিক্রয় সহায়তা দিলে অল্প পুঁজিতে এ কাজের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি জোরালো অভিমত দেন।

ব্যবসায়ী ইব্রাহিম জানান, বাজার কমিটি নিষ্ক্রিয় প্রভাবশালীরা যা বলে তা । এসব উন্নয়ন কাজে তাদের আন্তরিকতা থাকলে বাজারের উন্নয়ন ঘটে, নারীরাও উৎসাহিত হয়। দেশের স্বনির্ভরতা তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন সরকারের বিঘোষিত নীতি। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সাথে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনের দিক নির্দেশনা আরো বেশি আন্তরিক এবং গুরুত্ববহ হওয়া উচিত। সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় চর মজিদ যোবায়ের বাজারে গড়ে উঠতে পারে একটি সফল বাঁশ-বেত প্রকল্প।

৪৯) ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত মাইজদী কোর্টের শিশু শ্রমিকেরা

সাজিয়া ফেরদৌস পান্না (নোয়াখালী) :

মাইজদী শহরে ছোট বড় মিলিয়ে দেড় শতাধিক কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় কর্মরত প্রায় ৮ শত শ্রমিকের অধিকাংশই শিশু, যাদের বয়স ১২ থেকে ১৪ অথচ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) শিশু শ্রম নিষিদ্ধ হলেও সেটি মানছে না কেউ। তার উপর শ্রমিকদের সঠিক মজুরি পরিশোধ না করায় মানবেতর জীবন যাপন করছে মেটাল শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেরা।

সামান্য মজুরি কঠিন পরিশ্রম, নোংরা পরিবেশ, শব্দের কারনে রোগ, ঝালাইয়ের আলোর কারনে চোখের সমস্যা, মাথা ধরাসহ নানা সমস্যার মাঝ দিয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হয়।

শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি, লেবার কোঠার ভ্রাম্যমান পরিদর্শন, কাজের নিরাপত্তা, মালিক কর্তৃক শ্রমিকের উপর নির্যাতন বন্ধ করা এর মেটাল শ্রমিকদের জন্য আলাদা সমিতি অনেকাংশে কমে আসবে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

মাইজদী শহরে অনেক অলিতে গলিতে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ রয়েছে তন্মোধ্যে সেলেপুর, দত্তের হাট, মাইজদী, মাইজদী বাজার, উজ্জলপুর সহ প্রায় ১৫০টির বেশি ছোটবড় মোট দোকান রয়েছে। এ সকল দোকানে কাজ আনুমানিক ৮০০ শ্রমিক। অধিকাংশ শ্রমিকের বয়স ১২-১৪ বছরের মধ্যে। কাজের জন্য শ্রমিকের হাতুরি, ছেনা, কাটার মেটিং শাবল, ওয়েলডিং মেশিন সহ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তৈরী করে আলমারি, আলনা , খাট, ডিমসেইপ, জুতার স্ট্যান্ড, দোকানের স্যাটার, দরজা , জানালা, গেইটসহ আরো অনেক কঠিন পরিশ্রম করে এসব বানিয়ে সঠিক মজুরি তো পায়না বরং কাজ করতে গিয়ে স্টীলের পাত, লোহার রড ও ঝালাইয়ের কাজ করার সময় বিভিন্ন ধরনের শিকার ছাড়া ও মালিক দ্বারা নির্যাতিত হন।

সরেজমিনে পরিদর্শন করে জানা যায়, মেটাল দোকান গুলোতে দক্ষ ও অদক্ষ দু'শ্রেনীর শ্রমিকই কাজ করে। আবার কেউ কাজ শিখে তাদের কোন বেতন দেয়া হয় না। অসুখ বিসুখ হলে ঔষধ খাওয়ার জন্য সামান্য টাকা দেয়া হয় না। আহসান মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ শিশু শ্রমিক বাবুল (১৩) বলে-"এখানে আমরা তিন চার জন কাজ শিখি। দৈনিক ১২ ঘন্টা আমাদেরকে কোনো বেতন দেয় না, খাওয়া দেওয়া দেয়না। মাঝে মধ্যে চা খাওয়ায়, এ দিয়ে সংসার চলে না । বাবা নেই, মা বাসা বাড়িতে ঝি-য়ের কাজ করে। তাই এখানে কাজ শিখি। মালিক বলেছে ২ বছর কাজ শেখার পর বেতন দিবে। আহসান মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ শ্রমিক আলাউদ্দিন (১২) বলে -"আমার মা, বাবা নেই। ফুফুর বাড়িতে থাকি, ফুফুর সংসারে অভাব। তাই আমাকে এখানে কাজ শিখতে হচ্ছে। অথচ সারাদিন এখানে কাজ করি,আমাকে বেতন দেয় না। একবার কাজ শিখতে গিয়ে লোহার আগুন দিয়ে হাত পুড়ে গেছে। অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম। মালিক কিছু ঔষুধ কিনে দিলেও আর কোন খবর নেয়নি।

শফিক (১৬) বলে-"এখানে আমরা মাসিক বেতনে কাজ করি। বড় মিস্ত্রি বেতন পায় ৩ হাজার টাকা। আর দ্বিতীয় মিস্ত্রি বেতন পায় ২ হাজার টাকা। আর যারা কাজে সহায়তা করে তারা পায় মাসে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা।" তিনি আরও বলেন-"এতো ঝুঁকি এ কঠোর পরিশ্রম করে এই সামান্য বেতনে আমাদের চলেনা। অন্য কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় জীবিকা নির্বাহের জন্য কম মজুরি পেয়েও এই কাজ করে থাকি।"
শিশু শ্রমিক রিয়াজ বলে-"গ্যাস ওয়েলডিং ঝালাইয়ের কাজ করার সময় ওয়েলডিংএর আলো চোখে লাগে, এজন্য চোখ জ্বালা পোড়া করে, রাতে ঘুম হয়না। এই চোখের সমস্যা নিয়ে পরের দিন আর কাজে যেতে ভাল লাগে না তবুও যাই।" শ্রমিক বাবুল (১৩) বলে-"এখানে দীর্ঘ ৩ বছর কাজ করছি। প্রথম প্রথম বেতন পেতাম না। এখন কাজ পারি তাই বেতন পাই। তবে দৈনিক ১২-১৩ ঘন্টা কাজ করে ১৫০০ টাকা পাই তা দিয়ে সংসার চলে না। অসুস্থ্য থাকলে, কাজে না আসলে বকাঝকা করে।"
আল বাবুল ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সবুজ (১৪) বলে - "আমাদের কোন সমিতি নেই। তবে মালিক পক্ষ যদি শ্রমিকের কল্যানের কথা ভেবে সমিতি গঠন করে দেয় তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে।"
শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে মালিক পক্ষের সাথে আলাপ করলে তারা জানান, তাদের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা। আহসান ইন্ডাষ্টিজের মালিক আহসান জানান,বর্তমানে লোহার দাম বেড়েছে, মেটাল ব্যবসায় এখন আর লাভ দেখা যায় না। তাই শ্রমিকদের সমস্যাগুলো জানা থাকা সত্বেও আমরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছিনা। অনেক টাকা পুঁজি খাটিয়েও আমরা ব্যবসায় লাভ করতে পারছি না। শিক্ষানবীস শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলেন , তারা কাজ শিখছে মাত্র । আমরা যতটুকু সম্ভব যাতায়াত ভাতা দেওয়ার চেষ্টা করি।
মজুরি বৃদ্ধি, পরিস্কার পরিবেশে কাজের ব্যবস্থা করা, মালিক পক্ষের শ্রমিকদের শারিরিক নির্যাতন বন্ধ করা, এর সমিতি গঠনে সহায়তা ও ঝুঁকিপূর্ন করার সময় হ্যান্ড গ্লাভস ও চশমা এর মোটা ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করলে সমস্যার সমাধান হবে বলে শ্রমিক পক্ষ জানান।

(৫০) সোনাইমুড়িতে গভীর রাতে কিশোরী অপহরণ বিচারের নামে তালবাহানা

মর্জিনা আক্তার (নোয়াখালী) :

নোয়াখালী সোনাইমুড়ী উপজেলার পিতাম্বর গ্রামে গভীর রাতে এক কিশোরীকে অপহরন করে নিয়ে যাবার সময় স্থানীয় আমকী বাজারে লোকজনের নিকট ধৃত হয়। পরে অপহরণকারীদের পক্ষে দেউটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দিদার মিয়াসহ তাদের লোকজন অপহরণকারীদের ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও স্থানীয় লোকজন আটককৃতদের ১নং জয়াগ ইউনিয়ন পরিষদের ভবনে আটক রেখে পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল ওহাব মিয়াকে অবহিত করে। ঘটনাটি ঘটে ১৮ জুন রাতের বেলায়। জয়াগ ইউপি চেয়ারম্যান বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে পরিষদ ভবনে মেম্বার এবং স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে অপহৃত জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে। পরদিন ২৯ জুন তারিখ দেউটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দিদার ও কুতুব চেয়ারম্যান বিষয়টি মিমাংসা করার আশ্বাস দিয়ে জয়াগ পরিষদের জিম্মায় থেকে অপহরণকারীগণ ও জান্নাতুল ফেরদাউসকে নিয়ে আসেন। কিন্তু পরবর্তীতে দিদার চেয়ারম্যান রহস্যজনক কারনে অপহরণকারীদের ছেড়ে দেয়। অপহরণকারীরা হলো পিতাম্বর গ্রামের ফকরল ইসলাম (১৮), বাচাইয়ের গাও আমিশা পাড়ার পারভেজ (১৯), শাকতলা নঘনা ইউপির খোকন (১৮)। জান্নাতুল ফেরদাউস (১২) কে তার পিতা মো:বাচচুর জিম্মায় দিয়ে পরবর্তীতে ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু ন্যায় বিচার তো দুরের কথা উল্টো অপহরনকারীরা মেয়ের পিতা বাচচু সহ সকলকে এই বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য চরমভাবে হুমকি ধামকি শুরু করে। দরিদ্র বাচচু উপায়ন্তর না দেখে উল্টো

আসামিদের ভয়ে নিরুপায় হয়ে সজন মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট এবং লিগ্যাল এইডস এর সহযোগিতা নিয়ে সোনাইমুড়ী থানায় মমিলা করতে গেলে থানায় তার মামলা গ্রহণ করেনি। এদিকে গত ০৩/০৭/০৭ ইং তারিখে রাতের বেলায় গ্রামের একটি দোকানে বসা অবস্থায় বাচচুকে চেয়াম্যান দিদার মিয়া ও তার লোকজন জোর করে চেয়ারম্যানের বাড়ী নিয়ে আটক করে তার কিশোরী মেয়েকে অপহরনকারী তিনজনের মধ্যে একজনের নিকট বিয়ে দেওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করে এবং বাচচুকে মসজিদে নিয়ে শপথ করায়। এ সময় বাচচু ও তার স্ত্রী হাসিনা প্রানভয়ে চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে রাজী হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করেন। চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে রাজী না হলে তাকে নাজেহালসহ মারধর করে আসামী পক্ষের লোকজন। বর্তমানে অপহরণকারীদের হুমকির ভয়ে বাচচু মিয়া এলাকা ছেড়ে গত ২/৩ দিন যাবত মাইজদীতে অবস্থান নিয়ে অপহরনকারী ফকরল ইসলাম, পারভেজ, খোকন , এনায়েত উল্যাহ, নুরুল আমিন, আলী আকবরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে পুলিস সুপার নোয়াখালী বরাবরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। উল্লেখ্য ঘটনার তারিখ রাতে জান্নাতুল ফেরদাউস প্রকৃতির ডাকে ঘর থেকে অপহরণকারীরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার সময় আমকি বাজারে ধরা পড়ে। জান্নাতুল ফেরদাউস পিতাম্বর উচচ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্রী।

৫১) এখনও খোঁজ মিলেনি শারমিনের।

আনোয়ারা বেগম আরজু (নোয়াখালী):

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । এ সত্য উপলব্ধির ছোঁয়াটা এখন সব মানুষকে স্পর্শ করেছে । উচচ বিত্তের গন্ডি পেড়িয়ে মধ্যবিত্ত, নিম্ন বিত্ত সব শ্রেনীর মানুষের অনুধাবনে স্থান করে নিয়েছে শিক্ষা। তাই সব বাবা-মা কষ্ট করে হলেও নিজের সন্তানকে চান শিক্ষিত করে তুলতে। স্বপ্নের মনিকোঠায় স্থান করে নেয় শিক্ষিত সন্তানের অস্তিত্ব। এমনি স্বপ্নদ্রষ্টা শাহজাহান, মেঘনা নদীর কোল ঘেষে স্থান করে নিয়েছে লক্ষীপুরের একটি থানা রামগতি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সে সব লীলা ভূমি,শ্যামল বাংলার প্রকৃতির কথা যেন থানাটিতে ছুঁয়ে আছে। এই থানার একটি জায়গা রামদয়াল। প্রান্তের মানুষের কোলাহলতা জায়গাটিতে সব সময় সরব করে রাখে। সে সরব প্রকৃতির আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা চঞ্চলা চপলা কিশোরী শারমিন আক্তার (১৫),বাবা মায়ের স্বপ্নের বাস্তব রুপ দিতে প্রানান্ত প্রচেষ্টা শারমিনের। তাই পড়া বেশ মনোযোগী হয়ে ওঠে সে। কখনো কোনো ক্লাসে ফেল করেনি সে বরং প্রতিটি ক্লাসে সন্তোষ জনক ভাবে উর্ত্তীন হয়েছে। এভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মনোরম পরিবেশে থেকে জ্ঞান অর্জনের মতো মহান কাজটি চালিয়ে যাচিছল শারমিন। হঠাৎ একদিন একটি ঝড় এসে সস তছনছ করে দেয়। সলিল সমাধি ঘটে স্বপ্ন নামের অস্বিস্তে। প্রতিদিনকার মতো লক্ষীপুর রামদয়াল বাজার সংলগ্ন আজিজিয়া উচচ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয় ৯ম শ্রেনীর মেধাবী ছাত্রী শারমিন। দিনটি ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৭। পথিমধ্যে সন্ত্রাসী আবু বকর ছিদ্দিকের নেতৃত্বে কয়েক সন্ত্রাসী শারমিনের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কোনো কিছু বোঝার আগেই তারা জোড়পুর্বক বেবিটেক্সিতে করে উঠিয়ে নিয়ে যায় শারমিনকে। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পরও শারমিন বাড়ী না যাওয়ায় তার পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। কিন্তু তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। মেয়ের সর্বনাশের কথা চিন্তা করে পাগলের মতো হয়ে যায় তার বাবা শাহজাহান। কি করবে ভেবে পায় না। ছুটে যায় থানায়। মামলা দায়ের করে যার নম্বর-৩৩৩/০৭। এদিকে ২ দিন পর অপরিচিত নাম্বার থেকে স্থানীয় মেম্বার নুরুল আমিনের কাছে একটি মোবাইল কল আসে। এতে অপহরণকারীরা জানায় শারমিন তাদের হেফাজতে আছে। আর তাকে পেতে হলে ১৫ হাজার টাকা পন দিতে হবে। মোবাইল সুত্র ধরে পুলিস অপহরণকারীদের কজনকে গ্রেফতারও করে। কিন্তু ঘটনার কয়েকমাস অতিবাহিত হলেও আদৌও শারমিনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার চিন্তায় নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে তার বাব-মা। তাদের আশংকা শারমিন কি তাহলে ফিরবে না। শারমিনের

দুরান্তপনায় কি নিরবতা ভেঙ্গে কোলাহল পরিবেশে কি আর কি ভরে উঠবে না বাড়ির আঙ্গিনা। তবু আশায় বুক বেঁধে আছে শারমিনের স্বপ্নচারী বাবা শাহজাহান।

৫২) কৃষি পন্য প্রক্রিয়াজাতকারী গ্রামীন নারীদেও শ্রমের মূল্য নেই।

আনোয়ারা বেগম আরজু (নোয়াখালী):

শিক্ষার অভাব, অসচেতনতা,স্বাস্থ্য সেবার অপর্যাপ্ততা, পুরুষদের অসহযোগী মনোভাব ইত্যাদি কারনে কৃষিপন্য প্রক্রিয়াজাতকারী গ্রামীন নারীরা বৈষম্যর শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। গ্রামীন নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি,পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা পুরুষদের সহযোগিতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরির্বতন করা গেলে কৃষিপন্য প্রক্রিয়াজাতকারী গ্রামীন নারীরা অর্থনীতিতে রাখতে পারে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা।

সরেজমিনে জেলার সদর উপজেলাধীন ৬নং নোয়াখালী ইউনিয়নের পশ্চিম উরউরিয়া গ্রামের নারী, পুরুষ এনজিও কর্মী ও স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ কালে এই তথ্য পাওয়া যায়।
জেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কি:মি: দক্ষিনে অবস্থিত পশ্চিম উরউরিয়া গ্রাম। মোট জনসংখ্যা ৮০ শতাংশ লোকই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা বিভিন্ন কৃষিপন্য যেমন- ধান, আলু, মরিচ, বাদাম, ডালসহ নানারকম শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণে অংশগ্রহণ করে অথচ তাদের শ্রমের মুল্যায়ন হচেছ না। আর নারীরা তাদের এই শ্রমের ব্যাপারে সচেতন নয়। এতে করে তারা শারিরীক, মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচেছ।
ধান, আলু, মরিচ, সয়াবিন, সরিষা, বাদাম, ডাল এবং বিভিন্ন রকম শাকসবজি গ্রামের মানুষ উৎপাদন করে। এগুলো প্রক্রিয়াজাতকরে বাজারে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এসব রবি শস্য রোপন থেকে শুরু করে ব্যবহারের উপযোগী করা পযন্ত নারীর ভুমিকা উল্লেখ করার মত। শ্রমের আর্থিক মূল্যায়ন করলে একজন পুরুষ দৈনন্দিন কাজ করে যে অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ উপার্জনকরি নারী এর চেয়ে বেশী সময় শ্রম দেয়। তার এ শ্রমকে আর্থিকভাবে মুল্যায়ন করা হয়না বলে তার শ্রমের কোনো মুল্য নেই।

কার্তিক মাস থেকে শুরু করে পৌষ মাস পর্যন্ত ধান কাটার মৌসুম বলে এ সময় নারীদের কাজের চাপ বেশী থাকে। একজন পুরষ জমিকে উপযোগী করে শুধু ধান রোপন করে। পরবর্তীতে এই ধান পাকলে কাটা থেকে শুর করে মাড়াই, রোদে শুকানো, ঝাড়া, চাউল করা, সন্তান লালন পালন সহ সংসারের আরো নানাবিধ কাজ নারীদের করতে হয়। নারীদের এসব কাজে পুরুষ কতটুকুই বা সাহায্য করেন। এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কৃষক আবুল বাশার জানান, নারীর কাজ নারী করবে, তাদের আবার সাহায্য কিসের। আমাদের কাজ শুধু ফসল করে ঘরে এনে দেওয়া, বাকী কাজ তাদের। এই প্রসঙ্গে সালেহা খাতুন বলেন-"আমগো কাম আমগোই করন লাগবো, বেডারা কি মুখ চাই ভাত খাওয়াইবোনি।"

নারীর শ্রমের মুল্যায়ন সম্পর্কে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মী শাহানা আক্তার বলেন-"কাক ডাকা ভোর থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হয়। এসব কাজ করতে গিয়ে নারীদের যে পুষ্টির দরকার, বিশ্রামের দরকার তা থেকে তারা সম্পুর্ন বঞ্চিত। এই পরিশ্রমের কারনে অসুখে পড়লে তাদের কপালে ঔষধও জোটেনা। তিনি আরো জানান, অনেক গর্ভবতী মহিলা আছে যারা গর্ভাবস্থায় বড় বড় সিদ্ধ করা পাতিল টানতে গিয়ে যে কষ্ট সহ্য করেন তা খুবই অমানবিক নির্যাতনের সামিল। এর কারন নারীরা

তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। এক্ষেত্রে তাদের বিশ্রামের সুযোগ সৃষ্টি করা,সহ স্বাস্থ্য সেবার পর্যাপ্ততা সৃষ্টি করতে হবে এবং পুরুষদেরকে সহযোগী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

৫৩) বিধবাদের প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক।
আনোয়ারা বেগম আরজু (নোয়াখালী):
শৈশব পেরিয়ে একজন নারী যখন যৌবনে পদার্পন করে তখন তার দুচোখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠে। এই স্বপ্ন আর কিছু নয় ঘর বাধার স্বপ্ন। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় সে স্বপ্ন অনেক সময় দু:সহ স্মৃতিতে রূপ নেয়। যখন কিনা এক সময় লাল বেনারশি ছেড়ে সাদা শাড়ী পড়ে তাকে বিধবা সাজতে হয়। জীবনের এই সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় একা মনে হয়। কি পারিবারিক, কি সামাজিক সর্বক্ষেত্রে তার অবমূল্যয়ন হয়। বেঁচে থাকতে হয় অন্যের গলগ্রহে। মূলত এই হচেছ আমাদের সমাজে বিধবা নারীদের প্রেক্ষাপট।

সরেজমিনে নোয়াখালী সদর থানাধীন ৫নং বিনোদপুর ইউনিয়নের গ্রাম পরিদর্শনে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, দরিদ্রতা, সামাজিক কুসংস্কার, সরকারী ও বেসরকারী সুযোগ সুবিধার অভাব প্রভৃতি কারনে গ্রামে বসবাসরত বিধবা নারীরা খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন কর্মসংস্থান অর্খনৈতিক সংকটসহ নানাবিধ অস্থিরতার মধ্যে দিনযাপন করছে।

বিধবাদের জন্য পারিবারিক, সামাজিক, সরকারি ও বেসরকারী সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা গেলে এসব সমস্যাগুলো সমাধান হতে পারে বলে বিধবা ও স্থানীয় লোকজন মনে করেন। জালিয়াল গ্রামের অধিকাংশ পরিবার দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। যার কারনে অধিকাংশ পরিবারের স্বামী মারা যাবার পর অল্প বয়সী স্ত্রীদের আর শ্বশুর বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয় না। তখন তারা বাধ্য হয় পিতা কিংবা ভাইয়ের সংসারে থাকতে। সেখানে এসে ও সুখে থাকতে পারেনা জানান মনোয়ারা বেগম (৩০)। তবে আট বছর সংসার জীবন পার হতে না হতেই তার স্বামী বাস দুর্ঘটনায় মারা যান। মনোয়ারা দু সন্তানের জননী। তার শ্বশুর বাড়িতে তেমন কোনো জায়গা জমিন নেই, যা দিয়ে কিছু একটা করে সে সন্তানদের নিয়ে বাঁচতে পারবে। তখন সে বাপের বাড়িতে আসে। মনোয়ার বাবা নেই। এখন ভাইদের সংসারে এসেও শান্তি নেই। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও ভাই ভাবীরা অকারনে মানসিক নির্যাতন করে। আর যে সংসারে নারীরা একটু বয়স হয়ে বিধবা হন তাদের থাকতে হয় সনতানদের আশ্রয়ে। সেখানে আরেক বিচিত্র জীবন যাত্রা। ছেলে বা ছেলের বৌয়ের কাছে থেকে সহ্য করতে হয় নানা রকম নির্যাতন। ঠিকমত খাওয়া দেয় না, কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়া হয়। তেমনি একজন বিধবা জাকিয়া খাতুন (৬০)। তার স্বামী মারা যায় ৪০ বছর বয়সে। বড় ছেলে রিক্সা চালাত কিন্ত বিয়ের পর ছেলে আর ছেলের বৌ তাকে খাওয়াতে পারবে না বলে দেয়। তাই সে এখন গৃহপরিচারিকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।
গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ লোকজনই বিভিন্ন ব্যাপারে অজ্ঞ। যার কারনে এখনো আমাদের সমাজে পরিবারগুলোতে কিছু পুরোনো ধ্যান ধারনা ও কুসংস্কার বেঁচে আছে। কিছু কিছু পরিবার ও সমাজের ধারনা অল্প বরসী নারীরা বিধবা হলে বলা হয় স্বামী খেকো। তাদেরকে দেখলে যাত্রা শুভ হয় না। আবার কেউ কেউ মনে করেন যারা আল্লাহর খাটি বান্দা অর্থাৎ পুর্নবতী তারা স্বামী বেঁচে থাকতে মৃত্যুবরন করেন। আর যারা পাপী তাদের স্বামী আগে মারা যায়। তেমনি এক শিকার রিনু আরা বেগম (৩০)। তার বিয়ে হয় একই গ্রামের মন্টু মিয়া (৩৫) এর সাথে। বিয়ের ১০ বছরের মাথায় তার স্বামী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কিন্তু সম্পুর্ন দোষ গিয়ে পড়ে রিনুর গায়ে। শ্বশুর বাড়ি থেকে কথা উঠে তার

চরিত্র ভালো না যার কারনে তার স্বামী মারা যায় । বর্তমানে সে তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে বাবার বাড়ির দিনাতিপাত করছে ।
কিন্তু মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে বিধবাদের ও মৌলিক অধিকারগুলো অবশ্যই দরকার । রাস্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র তার এ অধিকারগুলো দিতে বাধ্য । কিন্তু আমাদের গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার বিধবা স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত ।

ইউপি পরিষদের সদস্যদের মতে, বিধবাদের জন্য সরকারী সুযোগ সুবিধা বিধবা ভাতা সামান্য হলে ও আথিক সুবিধা দিচেছ । কিন্তু বিধবা ভাতা পাওয়ার উপযোগী বিধবাদের
তুলনায় সরকারী ভাবে দেয়া বরাদ্দ খুবই সীমিত । জালিয়াল গ্রামে প্রায় তিনশত জন বিধবা আছে । তার মধ্যে বিধবা ভাতা পান প্রায় ২০জন । ফলে অনেক বিধবা ভাতা থেকে বঞ্চিত এবং মানবেতর জীবন যাপন করছে ।

জালিয়াল গ্রামে বিধবাদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে কোন বেসরকারী সংস্থা তেমন কাজ করছে না কয়েকটি সংস্থা শুধুমাত্র ধান র্কমসূচির আওত্তায় এনে বিধবাদের সচল করে তোলার চেষ্টা করছে । আবার কিছু কিছু সংস্থা চড়া সুদ আদায় করছে বলে অনেক বিধবা নারীর পক্ষে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করা সম্ভব হয় না ।

জালিয়াল গ্রামের বিধবা নারীরা মনে করেন, সরকারী ও বেসরকারী সহোযোগিতা, সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং সহযোগিতা পেলে তারাও মানুষ হিসেবে মৌলিক অধিকারগুলো নিয়ে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন ।

৫৪) নোয়াখালী মা ও শিশু কেন্দ্রটির বেহাল দশা

আবদুল শকুর হান্নান(নোয়াখালী):
পর্যাপ্ত লোকবল, প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ এবং যথাযথ প্রচারের অভাবে নোয়াখালীর মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রটি কার্যত জেলার মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের ইতিবাচক ভুমিকা রাখতে ব্যর্থ হচেছ । শুধুমাত্র না জানার কারনে জেলার মা ও শিশুদের একটি বিশাল অংশ এ কেন্দ্রটির সেবা হতে বঞ্চিত হচেছ । কেন্দ্রটি সিএমএসইউ-এর তত্ত্বাবধানে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০02 সালে নির্মিত হয় । মূলত গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য ১০ শয্যা বিশিষ্ট এটি প্রতিষ্ঠিত হয় । এখানে সম্পুর্ন বিনা মূল্যে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভবতী সেবা , স্বাভাবিক প্রসব সেবা, সিজারিয়ান অপারেশন, গর্ভোত্তর পরিচর্যা, এমআর, ৫বছরের কম বয়সী শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য, ইপিআই, পরিবার পরিকল্পনা, খাবার বড়ি, জন্ম নিরোধক ইনজেকশান, ইআইইউডি, নরপ্লান্ট, ভ্যাসেকটমি, টিউভেকটমি সেবা দেয়া হয় । এখানে কয়েকজন নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী দুইটি শিফটে ভাগ করে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচেছ । ২৪ কক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রটিতে রয়েছে পোষ্ট নেটল, মহিলা ওয়ার্ড, ডক ও এ্যাসিসটেন্ট রুম ল্যাবরেটরি, অফিস ও কম্পিউটার রুম এফডাব্লিউভি/এফপিপি- ডাব্লিউভি এমসি এইচ রম এবং একটি উন্নত অপারেশন থিয়েটার । এছাড়াও এ কেন্দ্রে শিশুর জন্ডিস নির্নয়ে ফটো থেরাপি মেশিন আছে ।

কিন্তু এতসব থাকা সত্বেও নারী ও স্বাস্থ্য সেবায় কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারছেনা । হরিনারায়নপুর গ্রাম থেকে আসা হাসিনা আক্তার জানায়, সে ১৫ টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে এসেছে । তার ৬ মাসের শিশুর

প্রচন্ড জ্বর। তাই ডাক্তার দেখানোর জন্য এ কেন্দ্রে এসেছে। কিন্তু এখানে এসে সে অনেকক্ষন বসে থাকার পরেও ডাক্তার না পেয়ে সে জেনারেল হাসপাতালে ফিরে যাচেছ। হাসিনা জানায়, নারী ও শিশুদের জন্য তৈরী করা হলেও তাদের কোনো কাজে লাগে না। সে এবারই প্রথম এসেছে আর কখনো আসবে না বলে জানায়। একই কথা জানালেন মাইজদী কোর্ট স্টেশান থেকে আসা বিবি কুলসুম। সে বলে-"আর জিন্দেগিতে ইয়ানে আর আইতন নো (আর কখনো এখানে আসবো না)"।

হাসপাতালে নিয়মিত ডাক্তার থাকে না। তাছাড়া হাসপাতালে নোংরা ও গন্ধ ছড়িয়ে আছে। এ হাসপাতালে সেবার মান খুবই খারাপ। এটি নারী ও শিশুদের জন্য তৈরী করা হলেও এটি তাদের কোনো উপকারে আসছে না। এ বিষয়ে হাসপাতালের ততত্বাবধায়কের সাথে কথা বললে তিনি জানান লোকবলই হাসপাতালে মূল সমস্যা। কেন্দ্রে ন্যুন্যতম ২২ জন কর্মচারীর প্রয়োজন থাকলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন অর্ধেকেরও কম। যারা কর্মরত আছেন তারা স্থায়ী নন। জরুরী প্রসুতি সেবার জন্য নূন্যতম ৮ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউসি এবং ৬ জন এইচ ডাব্লিউবি দরকার। তাছাড়া ও এখানে মাত্র তিন জন পিয়ন, ১জন ক্লিনার রয়েছে। অফিস সহকারী এবং ড্রাইভারের পদটিও শুন্য। ড্রাইভারের অভাবে হাসপাতালের এ্যম্বুলেন্স অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন-"প্রতিষ্ঠানের নাম মা ও শিশু কেন্দ্র হলেও এখানে শিশুদের এখানে শিশুদের কোন আলাদা ইউনিট নেই। এমনকি তাদের জন্য আলাদা কোন বেড ও নেই। সাধারন রোগীদের মতই তাদের চিকিৎসা দেয়া হয়। আমরা মনে করি সরকারের সংশ্লিষ্ঠ বিভাগ অল্প সময়ের মধ্যে নোয়াখালী মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্যোগ নিবে।"

নোয়াখালী মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রেটি এ অঞ্চলের মা ও শিশু স্বস্থ্য সেবায় কার্যকর ভুমিকা রাখতে স্থাপন করা হলেও তা পুরন হচেছ না। এত সব সমস্যার সমাধান হয়ে উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে এলাকাবাসী মনে করেন।

৫৫) চর মজিদে নারীদের স্বাস্থ্য।

যোবায়েদা আক্তার (সীমা) (নোয়াখালী):

দরিদ্র, সচেতনার অভাব, অশিক্ষার অভাব, কুসংস্কারের কারনে চর মজিদের নারীরাই অন্যান্য বিভিন্ন অধিকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও হচেছ তুলনাতীতভাবে বঞ্চিত। সরেজমিনে আলাপকালে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

দারিদ্র মোচন, শিক্ষা, কুসংস্কার দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব সমস্য উত্তোরন করা সম্ভব হবে বলে অনেকে মনে করেন।

নোয়াখালী জেলার সুর্বনচর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের পুর্ব চরমজিদ একটি গ্রাম। এই গ্রামে লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। তাদের মধ্যে অর্ধেকই নারী। এখানকার নারী পুরষ প্রায় সবাই শিক্ষার আলোয় তেমন আলোকিত নয়। নারীরা তার চেয়ে ও পিছিয়ে। একজন মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শিক্ষার মত আরেকটি উল্লেখযোগ্য অধিকার হচেছ তার স্বস্থ্য। অথচ এই এলাকার নারীরা জানেনা তারা যদি তাদের মৌলিক অধিকারগুলো কিকি? তারা জানেনা তারা যদি অর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা না পায় তার জন্য তারা সোচ্চার হতে পারবে।

এ রকম একজন নারী নাছিমা (২২)। নবম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও সে জানেনা তার মৌলিক অধিকার গুলোর কথা। সে তার মনে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে আমি তো জানিনা স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া

আমার অধিকার। অথচ আমি যখন আমার সন্তান গর্ভেধারণ করি তখন আমাকে সংসারে হালকা ভারী যাবতীয় কাজ করতে হয়েছে। আর আমার সন্তান জন্মের সময় ৮ দিন আমি প্রসব ব্যাথায় কষ্ট করেছি। কিন্তু কোন চিকিৎসা পায়নি। শ্বশুর-শাশুড়ি কোন ব্যবস্থা নেয়নি। আমার বাবা-মা এসে ও স্থানীয় হুজুরের থেকে তেলপড়া, পানি পড়া এনে দেয় এবং ৮ দিন পর ঐ সন্তান ভুমিষ্ট হয়।
এ রকম আরেকজন নারী রাহেলা (২০), তার ও একই অবস্থা। ৭ দিনপ্রসব ব্যথায় কষ্ট করেও কোনো সুচিকিৎসা পায়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। শুধু ডাক্তারই নয় একজন প্রশিক্ষিত ধাত্রী ও অনেকের কপালে জুটে না। ফলে বিভিন্ন ধরনের জলিতার সৃষ্টি হয়। এমনকি একজন নারীর এতে মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে বলে একজন এনজিও কর্মী মত প্রকাশ করেন।

(৫৬) জীবন ও জীবিকার খোঁজে মাসুদ
তৌফিকুর রহমান রাজিব (পটুয়াখালী):
"শাক লাগবে শাক" ডাক দিতে দিতে এগিয়ে যেতে থাকে মাসুদ (৮)। পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, খালি গায়ে, খালি পায়ে মাথায় নিজের ওজনের চেয়ে ভারি শাক ভর্তি এক ঝাঁকা, একবার এপাশ তো আর একবার ওপাশ, মাথা থেকে শাকের আটি পরতে গিয়েও যেন পরেনা কোন এক অদৃশ্য কারনে, সম্ভবত: যদি এখানেই থেমে যায় ওর জীবনটা!

পুরো নাম ওর মুহাম্মদ মাসুদ। থাকে পটুয়াখালী বাঁধঘাটে একটি ঝুপরি ঘরে। বাবা মা আর তিন ছোট বোন এই নিয়েই মাসুদের সংসার। বাবা হারুন হাওলাদার মাঝেমধ্যে মাটি কাটার কাজ করলেও বেশির ভাগ সময়েই থাকেন অসুস্থ। আর মা অন্যের বাসায় কখনও কখনও গৃহপরিচারিকার কাজে যায়। কিন্তু ছোট বোনটি ওর এত ছোট যে ওকে নিয়ে কাজ করাই মুসকিল। অন্য দুটি বোন ফাতিমা (৬) ও রিমা (৫) মাঝে মাঝে মাসুদের সাথে গিয়ে কলমি শাক, কচু শাক, কলার মোচা, মালঞ্চ শাক এসব তুলে দেয়। আবার যেদিন নিজেরা এসব কিছুই সংগ্রহ করতে পারেনা সেদিন স্থানীয় বাজার থেকে কম দামে কিছু জিনিসপত্র কিনে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে কিছুটা বাড়তি দামে। আর যেদিন বাজার থেকে কেনার মত টাকা থাকেনা আবার সংগ্রহও করতে পারেনা সেদিন চুপচাপ হাত গুটিয়ে আধপেট খেয়েই ঘরে বসে থাকতে হয়।

এভাবেই পায়ে হেটে হেটে শহরের এমাথা থেকে ওমাথা শাক ফেরি করে মাসুদ আয় করে ৪০-৫০ টাকা। পুরো টাকাই তুলে দেয় সে মায়ের হাতে। ক্লান্ত ছোট্ট পা দুটি নিয়ে কখনও বাড়ি ফিরতে ফিরতে আসরের আযান পরে যায়। ফেরি করার এ সময়ের মধ্যে ক্ষুধা লাগে কিনা জানতে চাইলে মাসুদ বলে–"বেশি ক্ষিদা লাগলে পানি খাই আর কম ক্ষিদা লাগলে রাস্তার কোন কল দিয়া পানি খাই।"
অন্য অনেক স্বপ্নের মত স্কুলে যাওয়ার স্বপ্নটিও পূরণ হয়নি মাসুদের। একটু বুঝতে শিখেছে যখন তার হাতে তখন বই তুলে না দিয়ে তুলে দেয়া হয়েছে সবজির ডালা। ফজরের আযান শুনে মানুষ যখন যায় নামাজ পরতে তখন মাসুদ রাস্তায় নামে জীবন ও জীবিকার খোঁজে। জীবিকার সন্ধান মিললেও জীবনের খোঁজ পাওয়া হয়ে ওঠেনা তার। কি করবে, কিভাবে চলবে এ ভাবনা এত কম বয়সেই পেয়ে বসেছে মাসুদকে। অভিমান ভরা কণ্ঠে মাসুদ বলে-ল্যাহাপড়া শিখিনাই, ডাক্তর হইতেও পারমুনা, সাহেব হইতেও পারমুনা শাক বেইচ্চাই খাওন লাগবে।

(৫৭) একজন হোসনেআরা নিজেই বদলে দিয়েছেন নিজেকে
তৌফিকুর রহমান রাজিব (পটুয়াখালী):

সহায় সম্বলহীন হোসনেআরা বেগম সবজি চাষের মাধ্যমে নিজেকে করে তুলেছেন সাবলম্বী। পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জের কলাগাছিয়া গ্রামের হোসনেআরা বেগম নিজ চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দারিদ্রকে পেছনে ফেলে এখন স্বচ্ছল জীবন যাপন করছেন।

জীবনের শুরুতে স্বামী স্ত্রীতে মিলে অনেক কষ্টের দিন কাটিয়েছেন। স্বামী মোঃ হারুন পৈত্রিক সূত্রে যতটুকু জমি পেয়েছিলেন তাতে তাদের দু'মাসের বেশি চলত না। হঠাৎ করেই স্বামী মারা যাওয়ায় ছেলে মেয়ে ও শ্বাশুড়িকে নিয়ে পড়েন হোসনেআরা মহা বিপাকে। এ অবস্থায় তিনি নিজেই পরিবারের ভরন পোষনের চেষ্টা শুরু করলেন। স্বামীর রেখে যাওয়া স্বল্প পরিমান জমিতে শুরু করলেন সবজি চাষ। প্রথম দিকে কারও কাছ থেকে সহযোগিতা না পেলেও হাল ছাড়েননি তিনি। সবজি চাষের উপর কিছু প্রশিক্ষণ নিয়ে পুর্নউদ্যমে কাজে লেগে গেলেন।

মৌসুম অনুযায়ী সবজি বাছাই করে চাষ শুরু করলেন। এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে জেনে নিলেন কম্পোস্ট সার তৈরি কৌশল। পোকা মাকরের আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য গোমা গাছের পাতা ও করমচা গাছের পাতা পঁচিয়ে তৈরি করেন বালাইনাশক। নিজের চাহিদা মিটিয়ে বাকিটা বিক্রিও করেন। তার কথায়- "গোবর, পাতা, কচুরিপানা দিয়া সার বানাইতে পয়সা লাগেনা। আর বাজারে দামও ভাল পাওয়া যায়।" হোসনেআরা সবজি চাষ ছাড়াও বাড়িতে লাগিয়েছেন নানা জাতের ফলজ গাছ। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে কলা, লেবু, পেপে ইত্যাদি বিক্রি করেন ।

সবজি এবং ফল বিক্রি করে তিন বিঘা জমি নগদ টাকায় কিনে তিনি ধান চাষ করছেন। ধান, সবজি, ফল বিক্রিও টাকায় তার সংসার খুব ভালভাবে চলে। প্রথম দিকে স্থানীয় গ্রামীন ব্যাংক থেকে কিছু ঋণ নিলেও তার পরিমান ছিলো অতি সামান্য, আর তা শোধও করে দিয়েছেন। তিনি এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, এক ছেলে ও এক মেয়ে স্কুলে পড়ে। তার এ সাফল্য দেখে এলাকার অনেক নারীই এখন সবজি চাষে উৎসাহী হয়েছেন । তিনি বলেন - "এখন কেউ সবজি চাষ বিষয়ে জানতে চাইলে তাকে পরামর্শ দেই যতটুকু পারি এজন্য আগের চেয়ে সবাই সমীহ করেও বেশি।"

(৫৮) কাঠের মধ্যে অন্নের সন্ধানে ওরা.....
তৌফিকুর রহমান রাজিব (পটুয়াখালী):
কারও হাতে পায়ে দগদগে ঘা, স্বর্দি-কাশি, জ্বর তো লেগেই আছে অনেকের। তার উপর কেউ কেউ যক্ষার মত ব্যাধিতেও আক্রান্ত। তবুও বিরাম নেই। বড় বড় গাছের খন্ড চর থেকে স-মিলে নিয়ে আসা, মেশিনে চেরাইয়ের জন্য দেয়া, চেরাই কাঠ বেছে আলাদা করা, এক জায়গায় জরো করা সহ নানা কাজ করে যাচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পযর্ন্ত খেটে মজুরি বাবদ কেউ পায় কিছু টাকা, কেউ আবার সামান্য কিছু জ্বালানী কাঠ। পেটের তাগিদে এখানে কাজে আসা শিশুরা মজুরি নিয়ে কোন ক্ষোভ প্রকাশ না করলেও ওদের কথায় ছিলো হালকা একটা অভিমানের সুর, চোখের ভাষায় ছিলো হঠাৎ ছুঁয়ে যাওয়া কোন একটা গোপন কষ্ট।

বাবা মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ. অবহেলা, দারিদ্র আর পড়াশোনার প্রতি অনীহাই ওদের নিয়ে এসেছে এ পেশায়। শাহিন (১৬), শহিদুল (১৫), রবিউল (১০), দুলাল (১৫), আমেনা (১৩), মনোয়ার (১২) সহ প্রায় ৫০-৬০ জন শিশু পটুয়াখালী শহরের নিউমার্কেট থেকে শুরু করে লাউকাঠি খেয়াঘাট পর্যন্ত লোহালিয়া নদীর তীর ঘেসে গড়ে ওঠা স-মিলগুলোতে কাজ করে। সুর্যদয়ের সাথে সাথে স-মিল

এলাকায় আসতে শুরু করে ওরা। শাহিন(১৬) কাজ করে কাঠ চেরাই, বহন ও ওজন করার। বাবা রিক্সা চালাত কিন্তু পাচঁ বছর ধরে যক্ষা রোগে আক্রান্ত বলে কাজ করতে পারেনা। মা বিড়ির ঠোল বানানোর কাজ করে পায় প্রতিদিন ১৫-২০ টাকা। এ আয়ে তাদের চলেনা বলেই পড়াশুনা বাদ দিয়ে শাহিনের এ কাজে আসা। শাহিন বলে - "কোন কোন দিন মালিক টাহা (টাকা) দেয়না ঐ দিন লাকড়ি টোহাই।"

দুলাল (১৫) কাঠ ওজন করা ও বিভিন্ন দোকান, এতিমখানা, হেটেল প্রভৃতি জায়গায় সরবরাহ করে। বাবা অসুস্থ, চিকিৎসা চলছে না। ছয় ভাই বোন ওরা। এখানে কাজ করছে ৬/৭ বছর ধরে। দুলাল নিজেও তিন বছর ধরে যক্ষা রোগে আক্রান্ত। তারপরও পরিবারকে একটু সাহায্য করতে তার কাজ এ কাজ করা। কয়েকজন শিশু শ্রমিক জানায় বড়দের সমান কাজ করে ওরা কিন্তু মজুরি তাদের থেকে অনেক কম। অনেক সময় মজুরি না দিলে তা চাইতে গেলে মার খেতে হয়। মজুরি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কয়েকজন স-মিল মালিক জানায়, শিশুরা এখনও কাজ শিখছে। অভাবের সংসারে না খেতে পেয়ে এখানে আসে, কিছু টুকটাক কাজকর্ম করে এ বাবদ কিছু পায়। তারা আসলে মজুরি পাওয়ার মত কাজ করার যোগ্য না।
নাসির (১১), বদরুল (১০), আমেনা (১৩) হাতে পায়ে দগদগে ঘা নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। ওরা জানায় কাঠের খোঁচায়, ময়লা ঘাটাঘাটির ফলে এখানকার অনেকের হাতে পায়ে এরকম ঘা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে এখানকার বেশ কিছু কাঠ ব্যবসায়ী শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর কথা অস্বীকার করেন। কাঠ ব্যবসায়ী আবদুল মালেক বলেন-"আমরা ওদের দিয়ে কাজ করাই না, এমনি এখানে থাকে, কাজকর্ম দেখে। আবার সুযোগ পেলে কাঠ চুরিও করে। আনোয়ারা স-মিলের মালিক হেমায়েত উদ্দিন বলেন - "দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ছোট বেলা থেকেই ওরা যে কাজ করবে তার ট্রেনিং দেয়ানো উচিত। এখানে যারা কাজ করতে আসে তারা কিছু না হোক দুবেলা ভাত খাবার ব্যবস্থা তো করতে পারে।" এত কম মজুরীতে কেন কাজ কর জিজ্ঞেস করলে শিশু শ্রমিক আমেনা বলে –"ঠগায় তারপরও কাম করি, কাম না করলে খামু কী?"

(৫৯) উনুনের আগুন জ্বললে জীবনের আলো জ্বলে
জাবিদুল হক খান (পটুয়াখালী) :
১৭ বছর ধরে পটুয়াখালীর লাউকাঠি বাজারে হোটেলের উনুন জ্বালিয়ে জীবনের আলো জ্বালিয়ে রাখছেন আঞ্জুমানারা বেগম (৫৩)। ১৯৮৭ সালে ২০ সের চাল নিয়ে জীবনের চাকাকে সচল রাখতে দুই শিশু পুত্রকে নিয়ে পথে নামেন তিনি। স্বামী তখন সংসার বিবাগী মানুষ। মুড়ি, মুড়কি, পান সুপারিবিক্রি করে যাত্রা শুরু। রাতে থাকতেন বাজারের শূন্য ঝুপরিতে। এভাবে এক বছর থাকার পর নদীর পাড়ে ২০০ টাকায় মাসিক গর ভাড়া নিয়ে হোটেল ব্যবসা শুরু করেন। এ হোটেলকে সবাই বলত ভাত তরকারির দোকান।

শুরুতে দিনমজুর, খেয়ার মাঝি, আর রিক্সাওয়ালারা নিয়মিত খেত এ দোকানে। বাজার করা থেকে শুরু কওে রান্না করা, লোকজনকে খাওয়ানো, সব পরিস্কার করা সব কাজ নিজ হাতে করতেন তিনি। ছেলেদুটো তখন স্বাভাবিক কৈশরের দুরন্তপনায় ব্যস্ত। মায়ের বকুনির ভয় তাদের স্পর্শও করেনা। তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে অসেনি কোন আপনজন। সকল দুঃখ কষ্টকে সহ্য করে জীবনের লাগাম নিজের হাতেই টেনে ধরেন।
ধীরে ধীরে বাজারের বিস্তৃতি বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে লোক সমাগম। ব্যবসায় উন্নতি করতে থাকেন আঞ্জুমানারা। দিন মজুর পেশার পাশাপাশি অন্য পেশার লোকজনও আসতে শুরু করে তখন।

ব্যবসার আয় থেকে মূলধন যোগার করে ছেলেদের সাবলম্বী করে তোলেন। কিন্তু হাতে নগদ টাকা আসায় মায়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় ছেলেদের কাছে। বিয়ে করে তারা পৃথক হয়ে যায়। আবারও একা হয়ে পড়েন আঞ্জুমানারা।

২০০৬ সালে হোটেল ব্যবসার টাকা দিয়ে লাউকাঠি বাজারের উত্তরপাশে দুই শতাংশ জমি কিনেন তিনি। জমির লোভে তার খোঁজ খবর নিতে শুরু করে নিকট আত্মীয়রা। এরপর ফিরে আসে তার সংসারত্যাগী স্বামীও। কিন্তু সাথে করে নিয়ে আসে নতুন বউ ও এক সন্তান। জীবন সংগ্রামী আঞ্জুমানারার হৃদয়ে আরও একবার হয় রক্তক্ষরণ।

(৬০) টুং টাং ঘন্টাধ্বনি হাতছানি দিয়ে ডাকে লালমোনকে।
সামসুন্নাহার বিনু (পটুয়াখালী):
টুং টাং ঘন্টাধ্বনি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে। ছুটির দিনেও ঘরে মন বসেনা। স্কুলের জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই ভোরে উঠে প্রায় এক দৌড়েই চলে যায় স্কুলে। তারপর ছুটোছুটি সেই দুপুর পর্যন্ত। ঘন্টা দেয়া, খাতা ও চক ক্লাশে পৌঁছে দেয়া, পতাকা উত্তলন, শিক্ষকদের ফুটফরমাইস এসব নিয়ে ব্যস্ততার শেষ নেই যেন। প্রতিদিন অসংখ্যবার সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে হয়। কখনও স্কুলের গেটে, কখনও বারান্দায় দেখা যায় তাকে। হাইপ্রেসার রোগটাও কিছুটা জেঁকে বসেছে। তার নাম লালমোননেছা। স্কুলে সে লালমোন বুয়া নামেই পরিচিত।

১৯৮০ সালে রশিদ কিশালয় বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই লালমোহন স্কুলের সাথে জড়িত। প্রথমদিকে স্কুলের ছুটির পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করতেন তিনি। দিন বদলে গেছে। বদলে গেছে স্কুলের প্রেক্ষাপট। একতলা স্কুল দোতলা হয়েছে, নতুন শিক্ষক এসেছে, ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। বাড়ি গিয়ে তো দূরে থাক স্কুলে ভর্তি করার কোঠা না পেয়ে ফিরেও যায় অনেকে। তখন লালমোহনের মনে পড়ে যায় তার সে কষ্টের কথা। তার অবদানকে কেউ মনে রেখেছে কিনা তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই তার। শিশুদের কলতানে মুখরিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গন তার মনে এনে দেয় অনাবিল প্রশান্তি। সেই সময়ের কোলে পিঠে করে গল্প, ছড়া শুনিয়ে কান্নাকাটি বন্ধ করা স্কুলে আসা ছাত্রছাত্রীরা এখন তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করছেন। তারা এখনও তাকে দেখলে সমীহ করে বুয়া বলে কাছে ডেকে নেয় এটাই তার প্রাপ্তি বলে তিনি মনে করেন।

চতুর্থ শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশোনা তার। কম বয়সেই বিয়ে এবং বিয়ের পরপরই চার সন্তান জন্মে। তার স্বামী আঃ রশিদ খান শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়ে মাত্র ৩০ টাকা বেতনে পিয়নের চাকুরি করতেন। সেই সূত্র ধরেই চাকুরিটা পান তিনি। স্বামীর একার আয়ে সংসার চলতনা দেখেই তার কাজে আসা। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার সংসারের কাজ। এভাবে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, নাতি নাতনী হয়ে সংসার বড় হয়েছে। ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করতে পারেননি বলে তার আক্ষেপ রয়ে গেছে তবে অভাব তার পিছু ছাড়েনি। তাইতো এ বয়সেও চাকুরির পর শাক-পাতা কুড়িয়ে বিক্রি করে দু'পয়সা বাড়তি আয়ের জন্য ছুটতে হয় তাকে। বৃদ্ধ বয়সেও একটু বিশ্রামের সুযোগ মেলেনা।

লালমোনেছার জীবন প্রদীপ ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। জীবনের চাকা এখন আর তার নিয়ন্ত্রনে নেই। কিছু আর আগের মত মনে রাখতে পারেননা। বেশি কাজ করলে হাঁপিয়ে ওঠেন। তবুও থেমে থাকেনা

তার ছুটোছুটি। অবসর নিচ্ছেননা তিনি। তার কথায় -"চাকরিডা ছাড়লে মনে হয় বেশিদিন বাচমুনা, আর খামু বা কি? বাসায় আমার মন টেহেনা। মরার আগ পর্যন্ত এই স্কুলে থাকতে পারলেই আমার শান্তি। "

(৬১) পোলাগো এতিমখানা থাকলে ভাল হইত
মিঠুন পাল ও মুজাহিদ তুষার (পটুয়াখালী) :
সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন থাকে প্রতিটি শিশুর। কিন্তু অভাব অনটন নীল করে দেয় জীবনের রং টাকে। সেই সাথে স্বপ্নটাও ভেঙ্গে যায়। তেমন একজন ভাগ্যহত মোঃ হাসান (৯)। জন্মের একমাস আগে বাবা মোঃ হাসেম ব্যাপারী মারা যায়। আর মা মোসাঃ খাদিজা বেগম মারা যায় তার চার বছর বয়সে। তারপর তার চাচা তার ভার নেয়। দরিদ্র চাচা ফেরিওয়ালা। হাসানকে দিয়ে সে ফেলে রাখা ভাঙ্গাচুরা সংগ্রহ করায়। খুব অল্প বয়সেই হাসানকে রাস্তায় নামতে হয় জীবিকার সন্ধানে। ধীরে ধীরে সে পরিনত হয় টোকাইতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাঙ্গাচুরা টুকিয়ে সে পায় ৪৫-৫০ টাকা। চাচার সাথে থাকে পটুয়াখালী সবুজবাগ এক ঝুপরিতে।

লেখা পড়া করার খুব ইচ্ছে ছিলো কিন্তু তা হয়নি, দারিদ্র কেড়ে নিয়েছে তার সে অধিকার। তার পড়াশুনা করতে মন চায় এখনও। সে বলে -"এইখানে একটা এতিমখানা থাকলে ভাল হইত, কিন্তু এইখানে ছেলেদের জন্য কোন এতিমখানা নাই। " সে চাচাকেও বলেছিলো পড়াশোনা করার কথা। কিন্তু চাচা জানিয়েছে ভাঙ্গাচুরা না টোকালে তাকে সে তার কাছে রাখতে পারবেনা। হাসানের চাচা বলে-"আমি হাসানের ভার নিছি কিন্তু অভাবের সংসারে একার আয়ে সংসার চলেনা। তাই হাসানকে পড়াশোনা করাতে পারছিনা।"
সারা দিনের ক্লান্তি শেষে একটু আদরযত্ন করে এক থালা ভাত দেয়ার লোক নেই হাসানের। ভালবেসে তার মাথাটায় একটু সুখের পরশ বুলিয়েও দেয়না কেউ। মাঝে মাঝে প্রচন্ড অভিমান হয় কেন আল্লাহ এ পৃথিবী থেকে অকালে তার বাবা মাকে তুলে নিয়ে গেল। তখন অনেক কান্না পায় তার। মন খুলে কাঁদতেও পারেনা সে। পাছে অন্য কেউ দেখে ফেলে, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে এই ভয়ে। এই সুন্দর পৃথিবীতে সে চায় সামান্য একটু আদর, একটু ভালবাসা। তার কথায় -"কেউ আমারে পোলার মতন আদর করলে আমি তার জন্য জান দিতে পারি।"

(৬২) সৎ মায়ের অত্যাচারে পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি আল-আমিনের
মিঠুন পাল (পটুয়াখালী) :
"ছোডবেলায় পড়ালেহার সুযোগ পাইলে এহন আর রিক্সা চালান লাগত না। অনেক ইচ্ছা আছিল লেহাপড়া কইরা মানুষের মত মানুষ হমু"- কথাগুলো বলে পটুয়াখালীর রিক্সাচালক আল-আমিন (১৪)। সরকারি বালিকা বিদ্যালয় সড়কে তার বসবাস। বাবা মিজান সিকদার পেশায় বাদাম বিক্রেতা। আল-আমিনের সাত বছর বয়সে তার মা মারা যায়। তারপর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে। তখন থেকেই শুরু হয় তার উপর নির্যাতন। ঠিকমত তাকে খাবার দেয়া হতনা। কারনে অকারনে তার উপর চলত দৈহিক নির্যাতন। আল-আমিনের বয়স যখন ১০ তখন সে কাজ নেয় স-মিলে। সেখান থেকে দৈনিক আয় হত ২০-৩০ টাকা। পুরো টাকা সে তুলে দিত বাবার হাতে। এমনি করে কেটে যায় আরও কিছু দিন। এরপর আল-আমিন ভাড়া করা রিক্সা চালাতে শুরু করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রিক্সা চালিয়ে তার আয় হয় ১২০-১৫০ টাকা। এ আয়ের কিছু অংশ তুলে দেয় বাবার হাতে বাকিটা জমা করে ভবিষ্যতের জন্য। মায়ের কথা মনে পড়ে কিনা জানতে চাইলে সে বলে-"আফসা আফসা মনে পড়ে। আর যখনই মনে পড়ে তখনই খুব খারাপ লাগে, কান্দন আয়।"

বেশির ভাগ রাতে সে বাসায় ফেরেনা। কেন ফেরেনা জানতে চাইলে জানায়, সৎ মায়ের কাছে যেতে ভাললাগেনা। গালমন্দ দেয় সারাক্ষন। তাই সে বেশিরভাগ রাতে গ্যারেজে ঘুমায়। ঘুমানোর সময় অনেক চিন্তা তার মাথায় ভীড় করে। কিভাবে আরও বেশি টাকা উপার্জন করবে, ভাল অবস্থানে যাবে এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে বার বার মনে আসে তার তো পড়ালেখা হয়নি, বেশিদূর আগাতে পারেনা চিন্তার জগতকে। এর মধ্যেই একসময় ঘুমিয়ে যায়। এরপর রাত ভোর হয়, শুরু হয় আল-আমিনের জন্য আরেকটি দিন। রিক্সার প্যাডেলে রাখে ছোট্ট দুটি পা। তারপর.......

(৬৩) পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পটুয়াখালীতে শিশুনাট্য কার্যক্রম ব্যহত:

তরিকুল ইসলাম রুবেল (পটুয়াখালী):

যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা সহ নানাবিধ কারনে পটুয়াখালী শিশু নাট্য চর্চা বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে শিশু নাট্য কর্মীরা ঠিকভাবে কাজ করতে পারছেনা। শিশু নাট্যকর্মী, অভিভাবক, সংগঠকসহ বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে এ সব তথ্য জানা গেছে।

বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে পটুয়াখালীতে দীর্ঘ দিন ধরে নাট্যচর্চা শুরু হলেও নব্বই দশকের শেষ দিকে এসে শিশু নাট্য চর্চা আরম্ভ হয়। এর আগে অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন কাজ করলেও তারা নিয়মিতভাবে শিশু নাট্য চর্চা করেনি। ১৯৮৮ সালে খেলাঘর আসর তাদের কার্যক্রমে আংশিকভাবে নাট্য চর্চা শুরু করলেও পুরোপুরিভাবে কোন শিশু নাট্যদল গঠিত হয়নি। নব্বই দশকের শেষভাগে এসে সুন্দরম চিলড্রেন্স থিয়েটার শিশু নাটকের ক্ষেত্রে কাজ শুরু করে। এখন পর্যন্ত তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার কারনে তারা নিয়মিত নাটক করতে পারছেনা বলে জানান শিশু নাট্যকর্মীরা। এ বিষয়ে শিশু নাট্য সংগঠক মুজাহিদ প্রিন্স বলেন– "সুন্দরম চিলড্রেন্স থিয়েটার পিপলস থিয়েটারের সদস্যপদ লাভ করেছে এবং প্রতিবছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। ঢাকায় গিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে আমাদের সবাইকে চাঁদা দিতে হয়। এক্ষেত্রে আমরা যদি পৃষ্ঠপোষকতা পাই তবে কাজ করতে আরও সুবিধা হবে।"

একাধিক শিশু নাট্যকর্মী জানান, প্রতিবছর তাদের নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু অডিটরিয়াম না থাকায় ছোট রুমের মধ্যে কর্মশালা করতে হয়। বড় অডিটরিয়াম পাওয়া গেলে কর্মশালা আরও ভালভাবে করা যেত। তাছাড়া নাটকের মহরা নিয়েও সমস্যা হয় তাদের। পটুয়াখালীতে নাটক উপযোগী মঞ্চ বলতে বোঝায় পুরাতন টাউন হলকে। কিন্তু মহরা করার জন্য এ মঞ্চটি পাওয়া যায়না। আধুনিক লাইট সরঞ্জাম ও সাউন্ড সরঞ্জামাদি না থাকায় নাটক নিয়ে পরতে হয় নানা সমস্যায় বলে জানান সুন্দরম চিলড্রেনস থিয়েটার কর্মী মরিয়ম আক্তার মুক্তা। তবে এ ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোন সহযোগিতার হাত কেউ বাড়ায়নি বলে জানা গেছে। শিশু একাডেমী নিজেদেরকে আলাদা সংগঠন মনে করে। তাই কোন সংগঠনকেই তারা কোন সহযোগিতা করেনা। নাট্য চর্চার ক্ষেত্রে কোন কার্যক্রম নেই বলেও জানা গেছে।

(৬৪) দুটি শিশু পার্কই গোচারন ভূমিতে পরিণত।

তরিকুল ইসলাম রুবেল (পটুয়াখালী):

দীর্ঘ দিনে পটুয়াখালীতে শিশুদের চিত্ত বিনোদনের কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। শহরে অবস্থিত দুটি শিশু পার্কই গো-চারন ভূমিতে পরিণত হয়েছে ফলে শিশুরা চিত্ত বিনোদনের কোনো সুযোগ পাচ্ছেনা। বিভিন্ন বয়সের শিশু, অভিভাবক ও সাধারন মানুষের সাথে আলাপকালে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সরেজমিন পরিদর্শন করে জানা যায় জেলা শহর পটুয়াখালীতে শিশুদের বিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। নেই কেনো পার্ক বা শিশুদের খেলার জায়গা। শহীদ আলাউদ্দিন শিশু পার্কটি দীর্ঘদিন যাবত রাজনৈতিক মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দুএকটি দোলনা ছাড়া তেমন কোনো কিছুই নেই, তাও আবার নোংরা, অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন বিধায় এখানে শিশুরা আসেনা। শিশুপার্ক সংলগ্ন একাধীক ব্যক্তি জানান, এটি শুধু নামমাত্র শিশু পার্ক কিন্তু কোন সময়েই শিশুপার্ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ও শিশু সংগঠক মানস কান্তি দত্ত জানান, শহীদ আলাউদ্দিন শিশু পার্ক এর সাথে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িত। পরবর্তীতে এটিকে শিশু পার্ক হিসেবে ঘোষনা করলেও এটি রাজনৈতিক সভা করার কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে। এছাড়াও প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ উদযাপন সহ বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয় এখানে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে শিশু পার্ক বলা সমীচীন নয়। তবে শিশুদের জন্য একটি পার্ক থাকা অতীব জরুরি।

সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, শহরে অন্য একটি শিশু পার্ক রয়েছে ডিসি বাংলোর পেছনে। তবে এটি যে একটি শিশু পার্ক তা পটুয়াখালীর অনেকে জানেনা। এটি বর্তমানে গো-চারন ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে নেই কোন সাইন বোর্ড বা শিশুদের খেলার সামগ্রী। এটি দেখেও বোঝার উপায় নেই যে এটি একটি শিশু পার্ক। শহরে এ দুটি শিশু পার্ক ছাড়া শিশুদের চিত্ত বিনোদনের আর কোনো জায়গা নেই। একাধীক সাংস্কৃতিককর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন -"এখানে বিনোদনের তেমন কোন সুযোগ নেই। প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানিয়েও কোনো সুফল হয়নি।" এ প্রসঙ্গে পটুয়াখালীর পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।
শিশু বিনোদন বিষয়ে সুন্দরম নাট্য মঞ্চের সভাপতি রবিউল আমিন বলেন- "শিশুদের বিনোদন ব্যবস্থা না থাকলে তাদের মানসিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। পড়ালেখার পাশাপাশি যাতে তারা সঠিক ভাবে বিনোদন পায় তার ব্যবস্থা করা আমাদেরই দায়িত্ব। তবে দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কোন বিনোদনের জায়গা তৈরি হয়নি পটুয়াখালীর শিশুদের। কোন সরকারি বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে আসেনি।"

(৬৫) ইব্রাহীম লেখাপড়া করতে চায় ! কিন্তু.......

মিলন কর্মকার রাজু (পটুয়াখালী):

ইব্রাহিম খলিল (১৩) চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র। যে বয়সে তার সহপাঠীদের সাথে বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়া, হই হুলর করার কথা সে বয়সে সে রিকশার হ্যান্ডেল ধরে জীবন সংগ্রামে নেমে পরেছে। ছোট কাঁধে তুলে নিয়েছে সংসারের মত কঠিন দায়িত্ব। তার কাছে লেখাপড়ার চেয়ে অসুস্থ বাবা-মা ও ছোট বোনদের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত তুলে দেয়া অনেক বড় দায়িত্ব। তারপরও সে স্বপ্ন দেখে লেখাপড়া শিখে একদিন বড় চাকুরি করবে। তাইতো রিক্সা চালানোর অবসর সময়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। কলাপাড়ার টিয়াখালীর ইটবাড়িয়া গ্রামের ইব্রাহিমের মতো হাজারো কিশোর শুধুমাত্র সংসারের প্রয়োজনে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে গলাটিপে হত্যা করে নেমে পরেছে ঝুঁকিপূর্ন পেশায়। কেউবা জড়িয়ে পরছে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে।
কলাপাড়ার তাজেম আলী মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র ইব্রাহিম। গ্যারেজ মিস্ত্রী সিদ্দিকুর রহমানের তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে বড় সে। ইব্রাহিম বলে- "ল্যাহাপড়া করার খুব ইচ্ছা কিন্তু কি করমু বাবা অসুস্থ। প্রতিদিন ১৫-২০ টাকার ওষুধ কিনতে হয়। কোন কাজ করতে পারেনা। তাই বাধ্য হইয়া মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ কইরা রিকশা চালাইতে হয়। রিক্সা চালানোই এহন আমার লেহাপড়া।"
প্রতিদিন রিকশা চালিয়ে ৭০/৮০ টাকা আয় হয়। এ টাকা দিয়ে সংসারের খরচসহ বাবার ওষুধ কিনতে হয়। একদিন রিক্সা না চালালে ঘরে চুলা জ্বলেনা। ইব্রাহিম জানায় তার লেখাপড়া করার খুব ইচ্ছা

ছিলো। কিন্তু সংসার চালাতে গিয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে রিকশা চালায়। তাই তার প্রথম সাময়িক পরিক্ষা দেয়া হয়নি। সারাদিন পড়াশোনা না করলেও রাতের অবসরে সে লেখাপড়া করছে। তার আর্তি অসুস্থ বাবা যদি ভালো হতো কিংবা কেউ যদি তার সংসারের দায়িত্ব নিতো! তাহলে লেখাপড়া শিখে দেশের জন্য কিছু একটা করতে পারত ইচ্ছা আছে তার।
এ ব্যাপারে ইব্রাহিমের বাবা জানান তার ছেলে ভাল ছাত্র, ক্লাশে রোল- ১। কিন্তু মন চায় ইব্রাহিমকে লেখাপড়া করানোর। কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে কোন কাজ করতে পারছেননা। তাইতো এ সংসারের বোঝা ইব্রাহীমকে কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। দেশের মানুষ একটু সহায়তা করলেই ইব্রাহিম আবার পুরোদমে লেখাপড়া শুরু করতে পারবে।

(৬৬) জীবনযুদ্ধে সাহসী সৈনিক ফরিদার কথা
লুৎফুরবারি পান্না (পটুয়াখালী) :
পটুয়াখালীর দক্ষিন সবুজবাগ রাস্তার পাশে এটি জরাজীর্ন চালাঘর। ভেতরে চারটা টেবিল আর টুল পাতা। সেখানে অসংখ্য তরুনেরা কোলাহল করে খাবার খাচ্ছে। মাঝখানে কাউকে আদর, কাউকে ধমক দিয়ে মায়ের মমতায় একমনে পরিবেশন করে যাচ্ছেন তিনিই বুয়ার হোটেলের মালিক ফরিদা বেগম (৩৫)। পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ও সরকারি কলেজের অসংখ্য ছাত্রের কাছে একটি পরিচিত নাম ফরিদা বুয়া ও বুয়ার হোটেল। ভাল রান্না, কম দাম এবং ঘরোয়া পরিবেশন সব মিলিয়ে দোকান ও মালিক উভয়ের জনপ্রিয়তাই তুঙ্গে।
ফরিদা বেগমের জীবনযুদ্ধ এক রূপকাহিনীর মত। স্বামী ছিলেন ছিলেন যাযাবর প্রকৃতির। তার কোন বাধা আয় না থাকায় নিজেই ছোটখাট কাজকর্ম করতেন। ব্র্যাক এবং আশা থেকে ঋণ নিয়ে মুরগীর খামার গড়ে তোলেন। এরই মধ্যে তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করে ফেলেন। মানসিক আঘাতে ফরিদা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে দেখাশোনার অভাবে তার মুরগী মরে গিয়ে খামারে লোকসান হয়। ঋনের টাকায় করা ব্যবসা এভাবে ধ্বংশ হতে থাকলে প্রচন্ড চাপে পরে যান তিনি। মরিয়া হয়ে আটা রুটির দোকান শুরু করলেন ১৯৯৭ সালে। ফরিদার রান্নার হাত বেশ ভাল। খদ্দেরদের প্রবল তাগাদায় একসময় হোটেলে ভাতও রান্না শুরু করেন। এখান থেকেই ধীরে ধীরে অবস্থা ফিরতে শুরু করে তার। সকাল দুপুর বিকেল প্রচন্ড ভীর সামলাতে তিনি তার মা ও স্বামীকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। একই রান্নায় নিজেরা, মেহমান ও খদ্দের সবার খাওয়া চলে।

ফরিদা বেগমের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র। মেঝ ছেলে এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে এবং মেয়ে অষ্টম শ্রেনীতে পড়ে। ছেলেমেয়েদের কাজ কর্মের সাথে যুক্ত না করে কেন পড়াচ্ছেন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন- “এইডা সত্যি কাজের চাপ কমত কিন্তু অগো জীবনটা অন্ধকার হইয়া যাইত। এখন পড়ালেখা কইরা বড় চাকরি করবে।”

ফরিদা দুঃখ করে জানালেন স্থানীয় কিছু ইর্ষা কাতর মানুষ তাদের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে নানান ষড়যন্ত্র করছেন। তার স্বামীর নামে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। সত্যের জয় হবেই জেনে তিনি মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। এভাবেই সুখ দুঃখে চলছে জীবন যুদ্ধের সাহসী সৈনিক ফরিদার সংসার।

(৬৭) দু’যুগ ধরে পটুয়াখালীর দু’টি শিশু পার্ক পরিত্যক্ত
শাহ্ মাহমুদুর রহমান (পটুয়াখালী) :

যথাযথ সংস্কার, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাব, রক্ষনাবেক্ষন ও সর্বোপরি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারনে পটুয়াখালী জেলা শহরের দুটি শিশুপার্কই দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিনত হয়েছে। ফলে চিত্তবিনোদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা।

পটুয়াখালী জেলা শহরে দুটি শিশুপার্ক রয়েছে। একটি শহীদ আলাউদ্দিন শিশু পার্ক, যা সদর রোডের পাশে অবস্থিত। অপরটি ডিসি বাংলোর পেছনে চিলড্রেনস পার্ক নামে আত্নপ্রকাশ ঘটেছিলো।
১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি সৈর শাসক আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পটুয়াখালীর সন্তান বরিশাল এসে স্কুলের ১০ম শ্রেনীর ছাত্র আলাউদ্দিন গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে বরিশাল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ঐ দিনই। সে মারা যায়। তার লাশ পটুয়াখালীতে এনে প্রথমে শিশুপার্কে রাখা হয়। জনতার দাবির মুখে সেই থেকে ঐ পার্কের নাম রাখা হয় শহীদ আলাউদ্দিন শিশু পার্ক। অপরদিকে অন্যপার্কটি জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।
সংস্কারের অভাবে পার্ক দুটি দীর্ঘদিন ধরে বিরান ভূমিতে পরিনত হয়েছে। এসব পার্ক তত্ত্বাবধানের জন্য দক্ষ জনবল প্রয়োজন। চারপাশের দেয়াল ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে বাইরের মানুষ অবাধ পথ চলাফেরা সহ গরু-ছাগলের অভায়ারন্যে পরিনত হয়েছে। ফলে পার্ক দুইটির পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। পার্কদুটি প্রতিষ্ঠার সময় বাচ্চাদের জন্য যে সব খেলাধূলার জিনিস পত্র স্থাপন করা হয়েছিলো। তা রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।
পটুয়াখালীর ১ লাখ পৌরবাসির দাবী শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম স্থাপন করে পার্ক দুটিকে মানসম্পন্ন পার্ক হিসেবে তৈরি করা। আর এ জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছেন পৌরবাসী।

(৬৮) পড়ালেখা গরীব মাইনসের জন্য না, ঐ সব বড় লোকদের কাজ
ঝর্না আহমেদ (পটুয়াখালী) :
নুরজাহানের জীবনে কখনওই শিক্ষার আলোর পরশ লাগেনি। বাবার নাম আয়নাল শেখ আর মার নাম জামিলা খাতুন। তার বাড়ি ছিলো ফরিদপুরে। কিন্তু পদ্মায় তাদের ভিটামাটি সব ভেঙ্গে গেছে। নিজেদের কোন জমি নেই। এখন থাকে পটুয়াখালীতে সরকারি জায়গায়, ছাপড়া তুলে। বাবা ভ্যান চালায়। তিন ভাইবোন ওরা। মা কলোনীতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে। কোনভাবে চলছিলো তাদের সংসার কিন্তু হঠাৎ এক ঝড় এলোমেলো করে দিল সব কিছু। বাবা ভ্যান চালাতে গিয়ে বাসের সাথে ধাক্কা লেগে একটা পা হারিয়েছে। বাবা এখন বিয়ারিং লাগানো কাঠের গাড়িতে করে ভিক্ষা করে। সে সবার বড় তাই মা তাকে নিয়ে কাজ করতে যেত। নুরজাহান বলে- "আগে ছোট আছিলাম সাহেবগো বাসায় পানি দিতাম, ঘর ঝাড়ু দিতাম কিন্তু আমার কাজ করতে মন চাইতো না। সাহেবের পোলা মাইয়া সুন্দর সুন্দর কাপড় পইরা স্কুলে যাইত তহন আমারও স্কুলে যাইতে ইচ্ছা করতো। মা কইত বড়লোকেরা স্কুলে যায় এইটা তোর কাজ না।"
এখন তার বয়স (১৩), এখন সে সব কাজ পারে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজ সারে। রাতের খাবার যা থাকে তা থেকে বাবা ও ভাইবোনদের ভাগ করে খেতে দেয়। তারপর আবার কাজে যাওয়া এবং রাতে কাজ শেষে খাবার নিয়ে ঘরে ফেরা। সে জীবনে পড়াশোনা করেনি এখন তার স্বপ্ন ভাইবোনদের পড়াশোনা করাবে। সে বলে-"এখন তো মেয়েদের পড়া ফ্রি আবার টাকাও দেয়। কিন্তু কি করমু? কাজ তো করন লাগবে।" এভাবেই পড়ালেখা আর হয়ে ওঠেনা নুরজাহানের।

(৬৯) বাল্য বিয়ের শিকার সাথী

মুজাহিদ তুষার (পটুয়াখালী) :
"বাল্যবিয়ে সুখের না অভিশাপের। বাল্য বিয়ের জন্য এত আইন কোথায় গেল? আমার বিয়েতে কেউ বাধাঁ দিলনা। তবে কি এসবই অচল?" কথাগুলো বলেছেন সাথী রানী (১৬)।

সাথীর বাবা নিউমার্কেট গোল চত্তরে কাপরের দোকানদার আর মা গৃহিনী। দুই ভাই ও এক বোন ওরা। পটুয়াখালীর শেরে বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলো সে। হঠাৎ বাবা মায়ের ভুল সিদ্ধান্তের কারনে সাথীর শিক্ষা জীবন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। যা সে কোনো দিন ভাবেনি। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাবা তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। সাথীকে বলা হয় সে বিয়ের পর পড়ালেখা করতে পারবে। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, দেবর-ননদ আর স্বামীকে সামলাতেই দিন চলে যায়। লেখাপড়ার কোনো সুযোগই মেলেনা। সাথীর বাবা বলেন-"মেয়েদের বেশি লেখাপড়া করে কি হবে? লেখাপড়া করলেও হাড়িপাতিলের কাছে, না করলেও হাড়িপাতিলের কাছে। সাথীর বিয়ে হয়েছে। ভালো হয়েছে।"
সাথী বলেন- "কোন মেয়ে যেন বাবা-মার কথায় কম বয়সে বিয়ে করে আর আমার মতো না ভোগে। আমার এখন বেশি করে মনে পড়ে স্কুলের কথা আর স্কুলের শিক্ষকদের কথা, প্রিয় বান্ধবী আখি, রুমা, আর মুক্তার কথা। আমার মত এমন ভুল ওরা যেন না করে।"

(৭০) গৃহপরিচারিকার কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন খাদিজা
মন্দিরা দাম গৌরি (পটুয়াখালী) :
স্বামী খুন হওয়ার পর থেকেই সংসারের বোঝা খাদিজা (৩৯) এর ঘাড়ে। গৃহপরিচারিকার কাজ করে ৭ জনের সংসার কোনরকম ভাবে চালাচ্ছেন খাদিজা।

দুমকির আংগারিয়ার জলিসা গ্রামের আব্দুল খালেকের সাথে ২২ বছর আগে তার বিয়ে হয়। মোটামুটি সুখেই কেটে যাচ্ছিল তাদের দিন। ১৯৯৮ সালে পারিবারিক কোন্দলে খুন হয় তার স্বামী। সেই থেকে সে বৃদ্ধ শাশুড়ি ও ছেলেমেয়ে সহ সাত জনের দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু চলছেনা যেন কোনভাবেই। এক একটি দিন যাচ্ছে যেন একমাস ধরে। কাটছেনা সময়। সংসারে উপার্জনের লোকও নেই। বড় মেয়ে মাকসুদা ১০ম শ্রেনীতে পড়ে। মেজ মেয়ে পড়ে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে, আর ছোট মেয়ে পড়ে চতুর্থ শ্রেনীতে। দুটি ছেলে সবার ছোট তারা স্কুলে যায়না। স্বামীর রেখে যাওয়া ২০ কাঠা জমিতে যে পরিমান ধান হয় তাতে চার মাস চলে। মাঝে মধ্যে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য পায়। খাদিজা অন্যের বাড়িতে কাজ করে মেয়েদের পড়ালেখা ও সংসার চালাচ্ছেন। বর্ষা মৌসুমে কোন কাজ না থাকায় তখন সংসার চালাতে হিমসিম খায় খাদিজা। এ সময়ে প্রায়ই তাদের অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটে।
খাদিজা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন- "৭ জন মানুষের খাওন জোগার করতে পারিনা। মাঝে মাঝে উপোষ থাকতে হয়।" বড় মেয়ে মাকসুদা বলে- "আমরা অনেক কষ্টে পড়ালেখা করি। মা আমাদের জন্য খুব কষ্ট করেন।"

(৭১) জরিনা (ছদ্মনাম) সন্তানের পিতৃপরিচয় চায়
মন্দিরা দাম গৌরি (পটুয়াখালী) :
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী জরিনা তার সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের দাবীতে থানায় মামলা করেও সুবিচার পাচ্ছেনা। বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের সাদেকপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম তার। জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী

হওয়ায় সবাই তার প্রতি সহানুভূতি দেখাত । এর সুযোগ নিয়ে জরিনার বড় বোনের ননদের স্বামী তার সাথে শারীরীক সম্পর্ক গড়ে তোলে । জরিনা গর্ভবতী হলেও বলতে পারেনি কাউকে ।
চারমাস আগে জরিনা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় । এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য । একটি এনজিও নির্যাতিত প্রতিবন্ধী জরিনার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মেহেন্দিগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয় । এ খবর পেয়ে অভিযুক্ত নুরুলহক গাজী ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার প্রানপন চেষ্টা বিফলে গেলে সে গা ঢাকা দেয় । এদিকে মামলা সম্পর্কে মেহেন্দিগঞ্জ থানায় একাধীকবার টেলিফোনে যোগাযোগ করলেও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি । সরেজমিন পরিদর্শন কালে সাদেকপুর গ্রামের অধিবাসীদের অনেকে অভিযুক্ত নুরুলহক গাজীর শাস্তি দাবী করেন ।

(৭২) বাল্য বিবাহ থেকে রক্ষা পেল খালেদা ও আফজাল

বদরুন নাহার সিদ্দিকা (পটুয়াখালী) :

পটুয়াখালী জেলা প্রশাসন ও ব্লাষ্ট পটুয়াখালী ইউনিটের হস্তক্ষেপে অল্পের জন্য বাল্য বিবাহ থেকে রক্ষা পেল ডিবুয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্রী খালেদা বেগম (১২) ও আফজাল মুন্সি (১৭) । ঘটনাটি ঘটেছে পটুয়াখালী শহর সংলগ্ন হেতালিয়া বাঁধঘাট এলাকায় । পরে ছেলে ও মেয়ের বাবারা ব্লাষ্টের কাছে তারা পূর্নবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ে দেবেনা লিখিত অঙ্গীকার করেন ।
২৭ জুন ১০নং কালিকাপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইমামের বাড়ির মসজিদে খালেদা ও আফজালের বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হয় । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ব্লাষ্টের পটুয়াখালী ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর এডভোকেট নিজাম উদ্দিন বিষয়টি জেলা প্রশাসক এ জি এম মীর মশিউর আলমকে অবহিত করেন । জেলা প্রশাসকের নির্দেশে সদর থনা পুলিশ ও ব্লাষ্টের কর্মকর্তরা ঘটনাস্থলে গেলে এ বিয়ে বন্ধ হয়ে যায় । পরের দিন ছেলে মেয়ে উভয় পক্ষকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লক্ষন দেবনাথের কাছে নিয়ে যায় ব্লাষ্ট । এ সময়ে তাদের নাবালক সাব্যস্ত করেন । এরপর ছেলের বাবা হামেদ মুন্সী ও মেয়ের বাবা আব্দুল খালেক জমাদ্দার এ বিয়ে না দেয়া লিখিত অঙ্গীকার করে চলে যান ।

(৭৩) যৌতুকের বলি হল নিপা

বদরুন নাহার সিদ্দিকা (পটুয়াখালী) :

দাম্পত্য কলহ ও যৌতুকের কারনে নির্মম ভাবে প্রান দিতে হয়েছে নিপাকে । তার বয়স ছিলো ১৮ । তার স্বামী ফয়জুল হাসান বাবুল আইনের রক্ষক র‌্যাব বাহিনীর সদস্য হয়েও স্ত্রীকে খুন করতে দ্বিধা করেনি । নিপাকে শাসরুদ্ধ করে হত্যা করার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার শরীর টুকরো টুকরো কর ভাসিয়ে দেয়া হয় পায়রা নদীতে । ঘটনাটি ঘটে ১৭ জুলাই মির্জাগঞ্জের পিপঁড়াখালী গ্রামে । নিপার মা বাদী হয়ে ২৯ জুলাই মামলা করলে ফয়জুলকে গ্রেফতার করা হয় । সে নিজ হাতে স্ত্রীকে হত্যার কথা স্বিকার করে ।
পুলিশ ও নিপার পারিবারিকসূত্রে জানা যায় ২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর সুন্দ্রাকালীকাপুর এলাকার বাবুল বিয়ে করে নিপাকে । নিপা বরিশালের কালিজিরা গ্রামের মৃত মফিজউদ্দিন ভূইয়ার মেয়ে । বাবুল ঢাকায় র‌্যাব-২ এর সদস্য হিসেবে কর্মরত ছিলো । বিয়ের পর ঢাকায় ভাড়া করা বাসায় তারা থাকত । নিপা জানতে পারে তার স্বামী আগেও একটি বিয়ে করেছে । এ নিয়ে শুরুহয় স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়াঝাটি । এ প্রতারনা কেন করেছে বাবুল তার সাথে তা জানতে চাইলে উল্টো যৌতুক দাবী করে নিপার কাছে । শুরু করে তার উপর শারীরীক নির্যাতন । প্রথম স্ত্রী ও এক সন্তানের কথা গোপন রাখা হয়েছে তার কাছে এটা নিপা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা । স্বামীর অত্যাচারের মাত্রাও দিনদিন বাড়তে থাকে । শেষে আর সহ্য করতে না পেরে নিপা চলে আসে বরিশালে মায়ের কাছে । ৪ জুলাই ২০০৭ বাবুল ছুটি নিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে আসে এবং কৌশলে নিপাকে কাছে আনার জন্য অসুস্থতার ভান করে ভর্তি হয় পটুয়াখালী পুলিশ

হাসপাতালে। ১৬ জুলাই নিপা স্বামীকে দেখতে আসে সেখানে। ১৭ জুলাই বাবুল হাসপাতালকে রিলিজ নিয়ে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সন্ধ্যার দিকে পিপঁড়াখালরি পায়রা নদীর কাছে পৌছাঁলে সহযোগীদের সহায়তায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় নিপাকে। শরীর টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয় নদীতে।

পরদিন বাবুল আবার ফিরে যায় তার কর্মস্থলে। এদিকে নিপার মা নুরজাহান বেগম মেয়ের কোন খোঁজ না পেয়ে ২৯ জুলাই মির্জাগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় বলা হয় নিপাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। এ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে বাবুল শিকার করে এ হত্যাকান্ডের কথা। বর্ননা করে লোমহর্ষক কাহিনী। ২৯ জুলাই র‌্যাব থেকে মির্জাগঞ্জ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে বাবুলকে। এখন সে জেল হাজতে।

(৭৪) মৃৎ শিল্পের নারী ও শিশু শ্রমিক

শারমিন সুলতানা নিতু (পটুয়াখালী) :

বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং নতুন নতুন শিল্প সামগ্রীর প্রসারের কারনে মৃৎশিল্প দিনদিন তার আবেদন হারিয়ে ফেলছে। তবুও এ শিল্পের প্রতি মানুষের কদর এখনও হারিয়ে যায়নি। বাউফল উপজেলার ৪২২ টি পরিবার এখনো তাতের ঐতিহ্যবাহী এ পেশাকে আঁকড়ে রেখেছে।

কয়েকটি কুমারপাড়া সরেজমিন পরিদর্শন এবং সংশ্লিস্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে এখানকার ৯টি গ্রামের অধিকাংশ মানুষই এ পেশার সাথে জড়িত। আধুনিকশিল্প সামগ্রীর সাথে পাল্লা দিয়ে এখানকার মৃৎ শিল্পীরা নানা ধরনের সৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করছে। যেমন মাটির ঘন্টা, ফুটস্ক্রাফট, বিউটি ফুটস্ক্রাফট, হার্ট ফুটস্ক্রাফট, কলমদানি, আগরদানি, মোমদানি, বেলআড়, পটারি, শিশুদের খেলনা। ৪২২ টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৬টি পরিবারে এ নতুন ধারার সামগ্রী প্রস্তুত হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ ও আড়ংসহ দেশের নামিদামি প্রতিষ্ঠান এসব সামগ্রীর ক্রেতা। আবার বড় একটা অংশ আমেরিকা, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডা, যুক্তরাজ্যে রপ্তানী করা হয় বলে জানান মৃৎ শিল্পীরা।

পুরুষের পাশাপাশি নারী ও শিশুরা শ্রম দিচ্ছে সমান ভাবে। বাউফলের মদনপুরা, বিলবিলাস, বগা গ্রামের ফুট স্ক্রাফট তৈরিকালে কথা হয় কয়েকজন নারী ও শিশুর সাথে। শাহনাজ পারভীন (৩০), পারুল দেবনাথ (৪০) রীনা নাথ (১২) সঞ্জয় কুমার পাল (১৪) এরা পৈত্রিক পেশা আকড়ে ধরে আছে। কেউ দিন মজুর হিসেবে এ কাজে যোগ দিয়েছে। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত কাজ করে পায় ৩০-৪০ টাকা। তারা জানায় আগে যেমন মাটির জিনিসের চাহিদা ছিলো এখন আর তেমন নেই। তাই তাদের মজুরি কম। মৃৎ শিল্পের প্রশিক্ষণ দিলে তারা নতুন নতুন সামগ্রী তৈরি করতে পারত। যা বেশিদামে বিক্রি করা সম্ভব হবে দেশে ও বিদেশে। তাদের হিসেবে বাউফলে প্রায় ৭০০ নারী ও ১৫০ শিশু এ পেশার সাথে যুক্ত। এসব নারী ও শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাউফলে শিক্ষার হার শতকরা ৬০এর উপরে হলেও মৃৎশিল্পীদের মধ্যে শিক্ষার হার ১০ ভাগেরও কম বলে জানান তারা। যেহেতু তাদের এ পেশায়ই থাকতে হবে তাই এ শিল্পকে টিকিয়ে রেখে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন তারা।

(৭৫) বিড়ি কারখানার নারী

শারমিন সুলতানা নিতু (পটুয়াখালী) :

পানজা বিড়ি কারখানায় কাজ করে প্রায় শতাধীক নারী। হামিদা (২৭) জানান, তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। স্বামী বাড়িতে তার কোনো সুখ ছিলনা। তার স্বামী আনোয়ার প্রায়ই তাকে মারধর করত, দাবী বাবার বাড়ি থেকে ২০ হাজার টাকা এনে দেয়া। হামিদার বাবা দরিদ্র তাই সম্ভব হয়নি এত টাকা যোগার

কওে দেয়া। তাই আনোয়ার হামিদাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। তারপর হামিদা কাজ নেয় এ বিড়ি কারখানায়।
অনেক নারী শ্রমিক জানান, তারা দীর্ঘদিনধরে এ কারখানায় কাজ করছেন। সবার কাজে আসার কাহিনী প্রায় একই ধরনের। স্বামী নিরুদ্দেশ, স্বামী মারা গেছে, অত্যাচারের শিকার হয়ে এসেছে, দারিদ্রের কারনে কাজ নিয়েছে। অনেকেরই তাদের শ্বাসকষ্ট। আগে তাদের এ সমস্যা ছিলোনা। রাজিয়া (৩০), শাহীনুর (২৫), নুরজাহান (২৪) ছোট বাচ্চাকে সাথে নিয়ে আসে এখানে। বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য কোনো লোক নেই। তামাকের গন্ধে এসব শিশুরা বিভিন্ন রকম অসুখে ভোগে। কারখানার ম্যানেজার এ বিষয়ে জানান, আইনে আছে ছোট বাচ্চাকে নিয়ে কেউ এ কাজ ওতে পারবেনা। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায়না।
দৈনিক ৫০-৬০ টাকা মজুরীতে তারা কাজ করে। প্রতিদিনের টাকা প্রতিদিন নিয়ে যায় তারা। কাজের পরিমান অনুযায়ী তাদের পারিশ্রমিক নির্ভর করে। তারা জানান, তামাকের কাজ শরীরের জন্য ক্ষতিকর হলেও অন্যান্য কাজের তুলনায় এ কাজে তাদের আয় বেশি। পরিদর্শন কালে দেখা যায় ময়না (১০) ও তুলি (৮) তাদের মায়ের সাথে কাজ করছে। কথা বলে জানা যায় পড়াশুনার অবসরে তারা এখানে আসে কাজে। উপার্জিত টাকা দিয়ে চলে তাদের লেখাপড়ার খরচ।

(৭৬) মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ারা
সামসুন্নাহার বিনু (পটুয়াখালী) :
দেশের দুঃসময়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে লড়াকু সৈনিকের মত সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও পাকিস্তান বিরোধী বক্তব্য দেয়ায় হুলিয়া জারি হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে। তার নাম এস এম মনোয়ারা।
মনোয়ারা বলেন-“সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আমার গা শিহরিত হয়ে ওঠে, অনেক নির্যাতন, অনেক কষ্ট ও ত্যাগ শিকার করতে হয়েছে। যখন রাজাকারদের গাড়িতে লাল-সবুজের দেশের পতাকা উড়তে দেখি তখন মাথায় আগুন ধরে যায়। এর জন্য কি জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলাম?
মনোয়ারা পটুয়াখালীর কালিকাপুর এলাকায় বাস করেন। তারা পাচঁভাই তিন বোন। ১৯৬৬ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মুসলিম লিগের এক মিছিলে প্রথম অংশ নেন। দেয়াল লেখা, হাতে পোস্টার লেখা, মিছিল, ৬ দফা, ১১ দফা, ৬৯ এর গণ আন্দোলন সব কিছুতেই তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৭০ এ প্রলংকারী বন্যার পর উপকূলীয় এলাকে দুগর্ত এলাকা ঘোষনার দাবীতে অনশন ধর্মঘট করেন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের গনহত্যার পর ২৬ মার্চ বরিশালে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। লতিফ স্কুলের শিক্ষক মোঃ ইসমাইল মিয়া পুলিশের ডামি রাইফেল দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেন। ১১ এপ্রিল মুসলিমলীগের সভায় পাকিস্তানবিরোধী বক্তব্য দেয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। পালিয়ে যান তিনি। ঘোষনা দেয়া হয় সে ও তার বোনকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও ১ সের স্বর্ন প্রদান করা হবে। তাদের না পেয়ে তার বাবা ও মাকে ধরে নিয়ে যায় পাক বাহিনী। ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল সুন্দরবনের শরনখোলা ক্যাম্পে নিয়ে যান। সেখানে স্টেনগান চালানো ও গ্রেনেড চার্জ শেখেন। এরপর সম্মুখযদ্ধে অংশ নেন। তিনি বলেন- “একটি দিন চোখের সামনে ভাসে। দিনটি ছিলো ঈদের আগের দিন। পিরোজপুরও বাগেরহাট সংযোগ স্থলে পাকবাহিনীর সাথে। অল্পের জন্য প্রানে বেচেঁ গেছি।” স্বাধীনতা ঘোষনার পর আবার পটুয়াখালীর মাটিতে পা রাখে সে। পরবর্তীতে যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুর্নবাসনের জন্য কাজ করেন তিনি।
এখন তিনি সমবায় অধিদপ্তরে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও মানুষের কল্যানে কাজ করার জন্য তিনি পেয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পুরুষ্কার ও স্বাধীনতা পদক। ২005 সালে

বিশ্বের এক হাজার জন নারী নোবেল শান্তি পুরুস্কারের জন্য মনোনীত হন। বাংলাদেশের ১৬ জন নারীর মধ্যে তিনি একজন। নিঃসন্তান মনোয়ারা তার অর্জিত পুরুষ্কারগুলো সযত্নে লালন করেন সন্তানের মায়ায়। এগুলোর মধ্যেই তার জীবনের সান্ত্বনা।

(৭৭) সৌখিন পেশা স্বাবলম্বী করেছে তাপসীকে

সামসুন্নাহার বিনু (পটুয়াখালী) :

ঘরে ঢুকতেই ছিমছাম ড্রয়িং রূম। সোফা, ডিভান ও কুশন ও টেবিলের কাপড়ে নিখুঁত হাতের কাজ। আরো আছে হাতে তৈরি নানা ধরনের শো-পিস। ডিভানের উপর নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে এক বছরের একটি শিশু। তার পাশের রূমেই আধুনিক সরঞ্জামাদীতে সুন্দরভাবে সাজানো একটি বিউটি পার্লার। এখানে হাসি মুখে কাজ করছেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানো শিশুটির মা তুহ্ফা গুলশান তাপসী। যিনি পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছেন সবুজবাগে তার নিজ বাসায় এ বিউটি পার্লার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা হয় তাপসীর সাথে। জানান তার সাফল্যের কাহিনী।

দুই কন্যা সন্তানের জননী তাপসী বয়সে ত্রিশের কাছাকাছি। স্বামী সৈয়দ মেহেদী হাসান রিপন ব্যবসা করেন। পরিবারের প্রত্যেকে তাকে সহযোগিতা করছে এ কাজে। ছোট বেলা থেকেই ঝোঁক ছিলো ঘর সাজানো, বউ সাজানো নাস্তা তৈরি এসব বিষয়ে। পড়াশুনায় তেমন মন বসত না। এইচএসসি পাশের পরপরই তার বিয়ে হয়। আর এগোয়নি লেখাপড়া। পড়াশুনার দৌড়ের কথা ভেবে চাকুরির কথা চিন্তা না করে অন্য কিছু করার কথা ভাবলেন। তিন বান্ধবী মিলে ১৯৯৭ সালে পটুয়াখালীর সবুজবাগ মোড়ে ‘কারু কর্ণার’ নামে হ্যান্ডি ক্রাফটের দোকান দেন। তিন বছর ভালই চলছিল। তারপর তার বন্ধুরা সংসারের ব্যস্ততার কারনে তেমন সময় দিতে পারছিলোনা আর। তাই ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন।

শুরু থেকে বিউটি পার্লার করার পরিকল্পনা থাকলেও প্রশিক্ষণের অভাবে তা করা হয়নি। তাই স্বামী শাশুড়ীর উৎসাহে ২০০ সালে চট্টগ্রাম থেকে ২০ হাজার টাকা কোর্স ফি দিয়ে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। এরপর শুরু করলেন কাজ। সম্পূর্ন নিজস্ব ডিজাইনে প্রতিষ্ঠা করেন পার্লার। নাম দেন “কারুকন্যা বিউটি পার্লার”। প্রথমদিকে শ্বশুরের মত না থাকলেও শাশুড়ীর উৎসাহ ছিলো বরাবরই। পরে শ্বশুরও অবশ্য তাপসীর পছন্দকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু তার। এ দিয়েই পার্লারের ফার্নিচার, সরঞ্জামাদী, সাজসজ্জার উপকরণ কেনেন। প্রথম সপ্তাহে কাস্টমারের সমাগম না থাকলেও পরিচিত লোক ও আত্মীয় স্বজনদের দিয়ে শুরু হয় পথ চলা। হাতের দক্ষতা থাকায় বিশ্বাস বেড়ে যায় অনেকগুন। ব্লক, বাটিক, সেলাই, চাইনিজ খাবার রান্নায় তিনি পারদর্শী ছিলেন । তাই অনেকে আসত তার কাছ তাদেও মাধ্যমে প্রচার পায়। নারীরাও তার কাজে নতুনত্ব খুজেঁ পান দেখে আসতে থাকে। ভ্রু প্লাগ, ফ্রেসিয়াল, চুলবাঁধা, থ্রেডিং, মেহেদী পরা, বৌ সাজানো, পার্টি সাজ সব কিছুই তিনি করেন যত্নের সাথে।

এভাবে তার ব্যবসা ও সুনাম ছড়িয়ে পরে, জমজমাট হয়ে ওঠে। তার জনপ্রীয়তাও তুঙ্গে। এক রূম থেকে দুই রূমে বিস্তৃতিলাভ করে পার্লার। তার সাহায্যকারী হিসেবে এসেছে একটি মেয়ে। তাকেও সব শিখিয়ে নিচ্ছেন তাপসী। মাসিক বেতন দেয়া হয় তাকে।

শুরু থেকেই পেছনে তাকাতে হয়নি তাকে। ঈদ, পূজা, বিয়ে এসব পর্বনে নাওয়া খাওয়ার সময় পায়না সে। সকাল থেকে শুরু করে রাত ১২ পর্যন্ত কাজ করেও সবার চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়না।

নিজের কাজের পাশাপাশি তাপসী স্বামীকেও সহযোগিতা করেন। সবুজবাগ মোড়ে জেরিন প্লাস নামে মা ও শিশুদের রকমারি সামগ্রী পাওয়া যায় সেখানে। তার স্বামী দেখাশোনা করলেও সময় পেলে তিনিও

বসেন স্বামীর পাশাপাশি । তাপসীর কাছে আসা লোকজন তাপসীর হাসিমাখা মুখের কথা ভেবে তাদের পছন্দেও জিনিসটি ওখান থেকেই নেন ।
তাপসী বলেন–"আমরা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের অনেক নারী ঘরে বসে অলস সময় কাটাই । তারা ইচ্ছে করলে নিজেদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে উপার্জন করতে পারে ।" তাপসীকে দেখে কেউ কেউ ইতমধ্যেই এসেছে এ পেশায় ।

(৭৮) প্রতিবন্ধী সন্তান, কে নেবে তার দায়িত্ব ?
শাম্মী অক্তার তানি (পটুয়াখালী) :
দরিদ্র পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পাওে তার বাবা-মায়ের জন্য? তার উপর বাবা মা দুজনেই দিন মজুর । কে নেবে শিশুটির দায়িত্ব ?
রিপন (৭) প্রতিবন্ধী । চার বছর বয়সে হঠাৎ জ্বরে কথা বন্ধ হয়ে যায় তার । বাবা বাউফলের ধাউরাভাঙ্গা গ্রামের খিতীশ মিস্ত্রি (৫০) । মা আলোরানী ইট ভেঙ্গে জীবীকা নির্বাহ করেন । সকাল থেকে সন্ধা অবধি কাজ করায় দরিদ্র বাবা-মা রিপনকে সময় দিতে পারেনা । সে বঞ্চিত হচ্ছে সঠিক যত্ন থেকে ।
বয়স অনুপাতে বৃদ্ধি হয়নি তার । কখনও ঘরের মালামাল ছুড়ে ফেলে কখনও ভেঙ্গে ফেলে কেউ তার কাজে বাধাঁ দিলে জোরে চিৎকার করে । সন্তানকে নিয়ে বিপদে পড়েছে তার বাবা মা । রিপনের বাবা বলেন-"ছেলেডারে নিয়া অনেক কষ্ট, সবসময় একজন ওর কাছে থাকন লাগে । আমি গাওয়ালে (হাড়িপাতিল বিক্রি) সকালে লইয়া যাই আবার দুপুরে আইসা ভাত রানতে হয়, খাওয়াইতে হয় । তিনি জানান রিপনকে তারা ডাক্তার দেখাননি । তাদের ধারণা ছেলের উপর শয়তান ভর করেছে । তাই তারা রিপনকে ফকির দেখিয়েছিল । লাভ হয়নি তাতে । খুব টানা পোড়েনের সংসার তাই ডাক্তারের কাছে নেয়া হয়ে ওঠেনি । কিন্তু শিশুটির কি হবে ? কে ওকে পথ দেখাবে ?

(৭৯) ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে জাহানারা বেগমের
মজিবুর রহমান (পটুয়াখালী) :
পটুয়াখালীর দুমকীতে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন গৃহবধু জাহানারা বেগম । আজ তিনি স্বাবলম্বী, একজন সফল ব্যবসায়ী । সাংসারিক কাজের ফাঁকে টেনলারিং এর কাজ করায় আজ এ সফলতা ধরা দিয়েছে তাকে ।
শ্রীরামপুর গ্রামে মোঃ আলমগীর হোসেনের স্ত্রী সে । বিয়ে হবার পর থেকেই অভাব অনটনে কেটেছে দিন । বিয়ের দু বছর পর সংসারে আসে প্রথম কন্যা সন্তান । জীবিকার সন্ধানে স্বামীর সাথে ঢাকায় পাড়ি জমান তিনি । স্বামী আদমজী জুট মিলে বদলী শ্রমিকের কাজ নেয় । আর জাহানারা সুই সূতার কাজ করতে থাকে । পাশের বাসায় টেইলারিং এর শেখার সুযোগ পেয়ে তিন মাস প্রশিক্ষণ পেয়ে সঞ্চিত সাড়ে তিন হাজার টাকায় কেনে একটি সেলাই মেশিন । বাসায় বসে তৈরি করতে থাকে পেটিকোট, ব্লাউজ, জামা কাপর, বাচ্চাদের জামা এসব । কাজের মান ভাল হওয়ায় আদমজী এলাকার শিমুল পাড়ায় তার নাম ছড়িয়ে পরে । এতে তার কাজ যায় বহুগুন বেড়ে । ১০-১২ বছর এভাবে কাটে জাহানারার । এরই মধ্যে সংসারে তাদের আরও এক কন্যা ও দু পুত্র সন্তানের জন্ম হয় । সংসার সাচ্ছন্দেই কাটতে থাকে । বড় মেয়ের নাসিমার বিয়ে দেন । এরপর চাকুরি ছেড়ে স্বামী সন্তানদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন । বাড়িতে এসেও কাজ চালিয়ে যান জাহানারা । দু বছরের মধ্যে স্বামীর পৈত্রিক ভিটায় টিনের ঘর উঠান । পীরতলা বন্দরে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছেন । স্বামী আলমগীর এ ব্যবসা দেখাশোনা করেন । ঢাকা থেকে কাপড় এনে দুমকীতে ব্যবসা করেন । এখন তাদের দিন বদলে গেছে । ব্যবসার টাকায় বেশ কিছু জমি কিনে কৃষিকাজও শুরু করেছেন । দু ছেলে সাগর ও সোহাগ

পড়াশুনা করছে। তার সফলতায় উৎসাহী হয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েকজন নারী তার কাছে কাজ শিখছে। সংসারের এ সফলতার কথা জানতে চাইলে মুচকি হেসে জাহানারা বলেন–"অক্লান্ত পরিশ্রমই এ সফলতা এনে দিয়েছে।"

(৮০) আজও দুমকীতে শিশুপার্ক গড়ে ওঠেনি

মজিবুর রহমান (পটুয়াখালী) :

পটুয়াখালীর দুমকীতে আজও তৈরি হয়নি শিশুদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশের জন্য কাঙ্খিত একটি আধুনিক শিশু পার্ক।

সদরের বাসিন্দারা দীর্ঘ দিন থেকে শিশুদের খেলাধূলার জন্য উন্মুক্ত পরিবেশে আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত একটি পার্ক নির্মাণের দাবী করে আসছে। কিন্তু জায়গার স্বল্পতা, অধিগ্রহনের জটিলতার কারনে তা আজও আলোর মুখ দেখেনি। এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ দুলাল একাধিকবার উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করলেও কোনো কাজে আসেনি। তিনি বলেন- "আমাদের শিশুরা উন্মুক্ত খেলাধূলার পরিবেশ না পাওয়ায় ঘরবন্দী মানসিকতায় গড়ে উঠছে। এভাবে বেড়ে উঠতে থাকলে তারা ভবিষ্যতে বাইরের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারবেনা। তার মানসিক বিকাশে বিরূপ প্রভাব পড়বে।"

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইসরাত হোসেন জানান, শিশুদের খেলাধূলার জন্য অবশ্যই একটা শিশু পার্ক দরকার। প্রস্তাবিত পৌরসভাটি পূর্নাঙ্গতা পেলেই শিশুপার্ক নিমার্ন সহজ হবে। এখন ইউনিয়ন পরিষদের বা উপজেলা পরিষদের পক্ষে শিশুপার্ক নির্মাণ করার বিষয়টি কষ্টসাধ্য। তাছাড়া প্রস্তাবিত জমির দুস্প্রাপ্যতার কারনে প্রস্তাবটি এগুচ্ছে না। পৌরসভা বাস্তবায়ন হলেই শিশুপার্ক নির্মাণ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

৮১) একজন খাদিজার কথা

শাম্মি অক্তার তানি (পটুয়াখালী) :

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় পারিবারিক সমস্যার অন্ত নেই। এ রকম সমস্যও মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন খেপুপাড়ার শাহজাহান মিয়ার কন্যা খাদিজা আক্তারডলি (১৯)। মেয়ে সুইটিকে নিয়ে সে এখন মহা সংকটে। তার স্বামী আসলাম সুইটিকে তার ঔরষজাত সন্তান বলে স্বীকার করছেন না।

চার বছর আগে ঢাকায় খাদিজা তার মায়ের সাথে কাজের সন্ধানে গেলে সেখানে পরিচয় হয় আসলামের সাথে। পরিচয়ের কিছুদিন পর বিয়েও হয় তাদের। বিয়ের পর খাদিজাকে আসলাম মিরপুরে তার বাসায় নিয়ে যায়। কিন্তু আসলামের মা কিছুতেই খাদিজাকে মেনে নিতে পারেনা। তার উপর শুরু হয় নির্যাতন। এক সময়ে আসলামও তার মায়ের সাথে নির্যাতন শুরু করে। কাজের অযুহাতে কথায় কথায় লাঠিপেটা করত খাদিজাকে। এক সময় নির্যাতন সহ্য করতে না পেওে মায়ের কাছে বেড়াতে যাওয়ার নাম কওে চলে আসে খেপুপাড়ায়। ঐ সময়ে তার গর্ভে ছিলো সুইটি। দুমাস পর ঢাকায় আসলামের বাসায় ফিরে গেলে আসলাম খাদিজার গর্ভে যে সন্তান আসছে সে সন্তান তার ঔরষজাত নয় বলে এবং তাকে মারধর করে পুনরায় খেপুপাড়া ফিরে আসতে বাধ্য করে। তারপর সুইটির জন্ম। খাদিজা জানায় তাকে বিয়ে করার আগে তার স্বামী আরেকটা বিয়ে করেছিলো, তাকেও খাদিজার মত ভাগ্য বরন করতে হয়েছিলো।

জন্মের পর থেকে সুইটি বা খাদিজা কাররই খোঁজ নেয়নি আসলাম। খাদিজা এখন খেপুপাড়ায় ইট ভাঙ্গার কাজ কওে। তার মা পিয়ারা বেগম এক বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ কওে। তার পক্ষে সম্ভব হয়না

তার মেয়ে ও নাতনীর ভরন পোষনের। খাদিজা একমনে ইট ভেঙ্গে চলে সুইটিকে পাশে বসিয়ে রেখে। খাদিজা বলেন- "জানিনা কি হবে, কিভাবে মানুষ করব আমার সুইটিকে। টাকার অভাবে মামলাও করতে পারিনাই। সুইটি কি কোনোদিন বাবার আদর পাবেনা ?"

৮২) সমান কাজে অর্ধেক মজুরী
মন্দিরা দাম (পটুয়াখালী) :
প্রাকৃতিক গড়ন ও শারিরিক দুর্বলতার দোহাই দিয়ে শ্রমজীবি নারীদের ঠকানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পুরুষের সমান কাজ করে মজুরি পায় তাদের থেকে কম। ইট ভাটায়, বিড়ি কারখানায় রাইসমিলে নারী শ্রমিকরা মজুরী পায় পুরুষ শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক। কুটিয়ালদের মধ্যে নারীর শ্রম মূল্য বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

নারী পুরুষের মত ভারি কাজ করতে পারেনা বলেন পটুয়াখালীর একটি ইটভাটার মালিক সোলায়মান হোসেন। পটুয়াখালীর কয়েকটি এলাকায় নারী শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী পায়না। ধানের মৌসুমে নারীরা কঠিন শ্রমে নিযুক্ত থাকে। ধান কাটার মৌসুমে শুকানো থেকে শুরু করে অন্যান্য সব কাজই করে নারীরা। এতে ২ সের বা তিনবেলা ভাতসহ একমাসের চাল পায়। প্রতিনিয়ত তারা কষ্টের শিকার হচ্ছে। তারপরও জীবনের প্রয়োজনে তারা কাজ করে চলছে অবিরত।

৮৩) বিয়ের ১০ বছর পরও স্বামীর সংসার করতে পারছেন না এক সন্তানের জননী রুমানা আক্তার
সৈয়দ আমিনুল ইসলাম (পটুয়াখালী) :
বিয়ের ১০ বছর পার হয়ে গেলেও স্বামীর সংসার করতে পারছেন না এক সন্তানের জননী রুমানা আক্তার (২৯)। মাদকাশক্ত, যৌতুক লোভী স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শিশু কন্যা লামিয়া (৮) কে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে।
রুমানা জানান, ১০ বছর আগে তার পটুয়াখালীর মাদারবুনিয়ার কুড়ালিয়া গ্রামে মোঃ খালেক কাজীর ছেলে কাওসার কাজীর সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর কাওসার ঢাকায় তার কর্মস্থল ঢাকায় নিউমার্কেট এলাকায় বাসা ভাড়া করে বসবাস শুরু করে। সে দর্জিও দোকানে কাজ করত। রুমানাও একটি টেইলার্সে কাজ নেয়। হঠাৎ সে জানতে পারে তার স্বামী মাদকাসক্ত এবং সে মাদক বিক্রি করে। রুমানা চেষ্টা করে তার স্বামীকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে। শুরু হয় তাদের পারিবারিক কলহ। কাওসারের পক্ষ নেয় তার মা কুলসুম ও ভাই কামাল। সবাই মিলে নির্যাতন শুরু করে রুমানাকে। কাওসার দাবী করে রুমানা বাবার কাছ থেকে ব্যবসার জন্য ১০,০০০ টাকা এনে দেবে। টাকা দিলে নির্যাতন কমবে মনে করে রুমানা তার বড় বোনের কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা এনে দেয়। অন্যদিকে রুমানা যে বেতন পায় তাও নিয়ে যায় কাওসার। ১০ হাজার টাকা খরচ শেষে কাওসার রুম্যানার স্বর্নাংকার বিক্রি করে। আবারও টাকা চায় কাওসার। রুমানা দেবেনা জানিয়ে দিলে তার উপর শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন। প্রতিদিন ৪/৫ দফায় মার খেতে হয় রুমানাকে। যখন আর টিকতে পরলনা তখন সে গর্ভে তিন মাসের সন্তান নিয়ে পটুয়াখালী বোনের বাসায় আশ্রয় নেয়। রুম্যানা কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে বলে কাওসার আরও মনক্ষুন্ন হয় এবং এক পর্যায়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এরপর রুমানা নিজের ও সন্তানের খরচ চালাতে পটুয়াখালী একটি প্রেসে চাকুরী নেয়। তিন বছর পর কাওসার নিজের ভুল স্বীকার করে রুমানা ও তার কন্যাকে বাড়িতে নিয়ে যায়। কাওসার বাড়িতে টেইলার্স দিয়ে বসে রুমানাও তাকে সহযোগিতা করে। কিছুদিনপর আবারও যৌতুক দাবী করে সে। এবার ব্যবসার পুজিঁর জন্য। রুম্যানা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শুরু হয় আবারও রুম্যানার উপর নির্যাতন। এরপর কাওসার ভরন পোষন বন্ধ করে দেয়। রুম্যানা শশুর ও সৎ শাশুড়ির সাথে থাকতে শুরু করে। এরই মধ্যে স্বামীর টেইলার্সে যে কাজ

করত রুমানা সেখানে কাজে আসে প্রতিবেশি এক নারী। ঘরে ফেরা বন্ধ হয়ে যায় কাওসারের। হঠাৎ একদিন রুম্যানার শশুর রুমানাকে অশালীন প্রস্তাব দিলে রুমানা আবার বোনের কাছে চলে আসে। তারপর থেকে আজ অবধি রুমানা পায়নি স্বামীর পরিচয় আর কন্যা লামিয়া পায়নি বাবার আদর পরিচয়। রুমানা এখন আইনি সহায়তার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

৮৪) ন্যায্য মজুরী বঞ্চিত দশমিনার নারী শ্রমিকরা।

এইচ.এম. ফোরকান (পটুয়াখালী) :

নারী শ্রমিকরা ঘর কন্যার কাজের গন্ডি পেরিয়ে হাতে হাতুড়ি , মাথায় ঝুড়ি, কাখে কলসি নিয়ে অভাব অনটন ক্ষুধা আর দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে সকাল-সন্ধ্যা কাজ করছে। ইট পাথর ভাঙ্গা, মাটি কাটা, সিমেন্ট বালি মিশান, রাস্তাঘাট নির্মান ও দোকানে পানি টানার মত কঠিন পরিশ্রম করেও ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত।

দশমিনার সদর বাজারের বিধবা ছাবি (৩৫) জানান, সকাল ৭টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত দোকানে দোকানে পানি টেনে ৩৫/৪০ টাকা পায়। প্রতি কলসি ১ টাকা মজুরি। জমি নাই, এক মেয়ে দুই ছেলে সহ সহ চারজনের সংসার। তিনি বলেন- "টাকা কম পাইলেও কাজ শেষে নগদ টাকা পাওন যায়, পোলাপান লইয়া কোনোমতে দিন পার হয়।" ছাবির মত বিধাব আনুরি (৪০), ছফেরা (৬০), ফুলজান বিবি (৬৫), আমেনা (৬০), মের্শেদা (৩৫) পানি টানার কাজ করে জীবীকা নির্বাহ করে। তারা জানায় পানি টানার কাজে একটু স্বাধীনতা আছে, নগদ টাকা পাওয়া যায় তাই এ কাজ করছে।

ইট পাথর ভাঙ্গা শ্রমিক রুনিয়া (৪০), ছাহেরা (৩৬), বিউটি (২৮), সাহিদা (৪৫) জানান, ইট পাথর ভাঙ্গলে ঠিকাদোরেরা ফারা হিসেবে টাকা দেয়। দৈনিক ৫০/৬০ টাকার কাজ করা যায়। আর খুব সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করলে ৭০/৭৫ টাকা পায়। তারা জানান, এখন চাল, ডাল, তেলের যা দাম এ টাকায় কিছুই হয়না। তাদের অভিযোগ সব পেশায় টাকা বাড়ে প্রতিবছর কিন্তু তাদের এ পেশায় অনেক আগে থেকে একই রেট চলে আসছে। তারপরও বেঁচে থাকতে হলে তো কাজ করতে হবে, তাই এ কাজ করা। জানা যায় ১৬০ জন শ্রমিক দশমিনা-বড়গোপালদি ইট পাথর ভাঙ্গার কাজ করছে। তাদের বেশিরভাগই নেহালগর্জন ও আদমপুরার বাসিন্দা। কয়েকজন নারী শ্রমিক ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান সারাদিন কাজ করে গিয়ে কাজ করতে হয় তারপরও স্বামীর গালমন্দ এমনি মারধর পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জোটে। শ্রমিকদের মধ্যে এমন নারী আছে যারা ২/১ বেলা না খেয়ে কাজ করছে সংসারের জন্য। মোর্শেদা (২৮), মাজেদা (৪০) বলেন–"মিটার মাপ বুঝিনা আমরা ঠকায় কিনা তাও জানিনা, মাপ জানতে চাইলে স্যারেরা ধমক দেয়, কাজ থেকে বাদ দেয়ার হুমকি দেয়। আমরা কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক চাই।"

৮৫) দুমকীর মুরাদিয়া আসিয়া-খালেক শিশু সদনে চিকিৎসা সেবা নেই।

শাম্মি আক্তার তানি (পটুয়াখালী) :

দুমকীর মুরাদিয়া আসিয়া-খালেক শিশু সদনের শিশুরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। শিশুদের জন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। শিশুদের জন্য সরকারি বা বেসরকারিভাবে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮ জন। এখানে তাদের বাংলা ও আরবি শেখানো হয়। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে এটি চালু হয়। সৈয়দ নুরুল ইসলাম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি চালু করেন। পরিচালনা কমিটির সদস্য সৈয়দ ওয়াহিদুল হক জানান, এখানে যারা আসে তারা সবাই দরিদ্র ও এতিম। এ বছর আরও অনেক শিশু এখানে ভর্তি হবে। চিকিৎসা সেবা প্রসঙ্গে তিনি

বলেন-"আমাদের সীমিত টাকার মধ্যে যতটা সম্ভব চেষ্টা করি। তবে সরকারিভাবে এখানে ওষুধ সরবরাহ ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করলে এতিম শিশুগুলো স্বাস্থ্য সেবা পেত। দুমকি স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিক থেকে বছরে একবার শিশুদের চেক-আপ করানো হয়।"

এখানে শিশুদের থাকার জন্য একটি টিনসেট ঘর, শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন রুম, টয়লেট ও একটি রান্না ঘর রয়েছে। সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ইতিমধ্যে সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে ৪০ হাজার টাকা অনুদান এসেছে। শিশু সদনে কর্মরত শিক্ষক মোঃ নুরুল ইসলাম জানান, শিশুদের এবং নিজের খাওয়া ও পোষাকের ব্যবস্থা পরিচালনা কমিটি বহন করে। কিন্তু শিশুদের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেই। তিনি জানান প্রথম শ্রেনীর ছাত্র ফয়সাল একদিন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ায় সবাই ভয় পেয়েছিলো। আশেপাশে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় তাকে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি। ঐ অবস্থায় তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাড়িতে বিধবা মাও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেনি। আরেকজন ছাত্র সোহরাব বলে- "এই হানে কেই অসুস্থ হইলে হ্যারে বাড়ি পাডাইয়া দেয়।"

এখানকার শিশুদের সকালে তিন ঘন্টা ও রাতে তিন ঘন্টা করে মোট ছয় ঘন্টা পড়ানো হয়। পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব শিশুকে ভর্তি করানো হয়েছে। বিকেলে বিনোদনের জন্য ছুটি দেয়া হয়। সবার এক দাবী এখানে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হতে এখানকার শিশুরা ও এলাকার দরিদ্র লোকজন রোগে উপযুক্ত চিকিৎসা পাবে।

৮৬) গ্রামীন নারীরা জীবন বাঁচাতে তাবিজ ও ঝাঁড়ফুকের উপর নির্ভরশীল

মিলন কর্মকার রাজু (পটুয়াখালী) :

কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিড়ে এখনও বের হতে পারেনি উপকূলীয় জেলে ও ছিন্নমূল পরিবারের নারীরা। হাসপাতালের চিকিৎসার চেয়ে তাদের এখনও জনপ্রিয় তাবিজ, কবজ, ঝাঁড়ফুক ও গ্রাম্য ওঝা কবিরাজের হাতুড়ে চিকিৎসা। এ কারনে গ্রামাঞ্চলে গর্ভবতী মা ও শিশুরা অপুষ্টিজনিত নানা রোগসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়।

সমুদ্র উপকূলীয় উপজেলা কলাপাড়ার চরাঞ্চল বেষ্টিত ধুলাসার ও কাউয়ার চর এলাকা ঘুরে জেলে পল্লীর নারীদের সাথে কথা বলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

কাউয়ার চর গ্রামের তিন সন্তানের জননী রোকেয়া বেগম (২৫) তখন চতুর্থবারের মত গর্ভবতী। বড় ছেলের বয়স ৮। সে এখনও জানেনা জন্ম নিয়ন্ত্রন কি। তিনি জানান বড় ছেলে হওয়ার সময় টিকা নিয়েছিলেন কিন্তু তারপর আর নেয়া হয়নি। ছেলেমেয়েরও টিকা দেননি। গৃহবধু শারমিন বলেন - "গরীবের ডাক্তার দরকার নাই। জ্বর, পেট ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, জন্ডিস হইলে তেলপড়া তাবিজেই কমে যায়।" একই কথা বললেন গৃহবধু তানিয়া (২৮), লাইলী (২০), ময়নাবিবি (২৩) সহ অনেকে। তাদের মতে ডাক্তার দেখাতে অনেক খরচ। তাছাড়া এ চরে কোন ডাক্তার নেই।তাই হুজুরেই সব ভালোমন্দ তাদের দেখে।

গঙ্গামতি এলাকার গৃহবধু মর্জিয়া বেগম (২১) জানান, গত বছর ডায়রিয়ায় তার ছেলে মারা গেছে। সাত বছরের জহির ডায়রিয়ায় ৫ দিন ভুগলেও কোন ওষুধ খাওয়ায়নি বরং হুজুরের পড়া পানি খাইয়েছে এক বোতল। সে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে -"তহন বুঝি নাই আমার সোনাবাপ (জহির) পানি পড়ায় ভালো হইব না। আর আফসোস যদি ডাক্তারের কাছে নেয়া যাইত তাইলে হয়তো জহির বাঁচত।" শিশু স্বাস্থ্য সর্ম্পকে চরাঞ্চলের গৃহবধুরা যেমন উদাসীন, তেমনি উদাসীন গর্ভকালিন সময়ে নিজ স্বাস্থ্য বিষয়ে। তাদের ভাষায়- "আল্লাহর ইচ্ছায় সব ভালো হয়ে যাবে। আল্লায় রোগদেয় এবং সে ভালো করে।" এদেরই একজন নিলুফা বেগম (১৯) পাচঁ মাসের গর্ভবতী। দিনমজুর স্বামী ওদুদমিয়া অসুস্থ্য থাকায় আজ কাজে

যেতে পারেনি । তাই ঘরে চুলাও জ্বলছে না । পেটের ক্ষুধায় সাত বছরের রুমা ও তিন বছরের রাসেল কান্নাকাটি করছে । নিলুফা বলেন-"এমনিতেই শরীর দূর্বল, গেলবার আট মাস বয়সি শিশু পেটেই মরে গেছে । এখনও শরীরে বল পাইনা । ঠিক মতো তিন বেলা খাইতে পারিনা ।" গর্ভকালীন অবস্থায় মেয়েদের কিকি খেতে হয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে-" কি খাইতে হয় জানিনা তবে আমি ভাত ছাড়া কিছু খাইনা । আর ডাক্তার দেখামু টাকা কোথায় । রহিম হুজুরই আমার ভরসা । আগের দু সন্তানের সময় সে সুতা পড়া, মাদুলী দিছে । পড়সব যন্ত্রনার সময় পানি পড়া দিছে । এতেই ভালো হয়ে গেছি ।" তার মতো উপকুলীয় গৃহবধুরা জন্মনিয়ন্ত্রন প্রজনন স্বাস্থ্য ও সংক্রান্ত নানা সমস্যায় গ্রাম্য ওঝা ফকিরের উপরই নির্ভরশীল ।

এ ব্যাপারে মাওলানা রহিম মিয়া (৫২) জানান, মানুষ নানা সমস্যায় তার কাছে আসে । তেল পড়া পানি পড়া দেয় এতেই ভাল হয়ে যায় ।

এ ব্যাপারে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসান ডাঃ জসিম উদ্দিন বলেন-"মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মীরা কাজ করছে । তারা জন্মনিয়ন্ত্রন পরিবার পরিকল্পনা সহ নানা বিষয়ে পরামর্শ দেয় । গ্রাম্য ওঝা ফকিরের বারনে গ্রামাঞ্চলের অনেক মা শিশু অকালে প্রান দেয় ।"

৮৭) মানতা সম্প্রদায়ঃ ডাঙ্গায় ওদের ঠিকানা নেই, নেই ভোটাধিকার

বদরুন নাহার সিদ্দিকা (পটুয়াখালী) :

উপকূলীয় উপজেলা গলাচিপা, কলাপারা, সাগর মোহনা ও বিভিন্ন নদ-নদীতে ভেসে বেরাতে দেখা যায় অসংখ্য জেলে নৌকা । এ সব নৌকায় জেলেরা সপরিবারে থাকে বছরের পর বছর । নদীতেই কাটে এদের জীবন । ডাঙ্গায় নেই ওদের কোন ঠিকানা । ওদের জন্ম মৃত্যু নৌকায় । স্থানীয়রা ওদের বলে 'মানতা' সমপ্রদায় ।

মাছ শিকার মানতা সমপ্রদায়ের একমাএ পেশা । জীবিকার প্রয়োজনে তারা মাছ শিকার করে । তবে জাল দিয়ে নয় বড়শি দিয়ে চলে এদের মাছ ধরার কাজ । মানতাদের জীবন অনেকটা বেদেদের মত । বেদে সম্প্রদায়ের মত এরাও দল বেধে নৌকার বহর নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এ ঘাট হতে ও ঘাটে । প্রতিটি বহরে থাকে ৮-১০টি নৌকা । কোন কোন বহরে ২৫/৩০টি নৌকা ও থাকে । প্রতিটি বহরে আছে একজন করে সর্দার । বংশানুক্রমে নির্বাচিত হয় সর্দার । প্রতিটি দম্পত্তির জন্য আলাদা আলাদা নৌকা । এদের জীবন পুরোটাই নৌকা নির্ভর । নৌকায় সংসার সামগ্রী ছাড়াও থাকে মাছ ধরার বড়শী । দেড় থেকে দু হাজার বড়শি থাকে এক একটি নৌকায় । এ ধরনের বড়শি দিয়ে প্রধানত ঃ পাঙ্গাস, পোয়া, ট্যাংরা, গাগরা, রামছোচ প্রভৃতি মাছ শিকার করা হয় । সর্দারের নির্দেশ অনুযায়ী বহর নদীর এ কুল থেকে ও কুলে যায় । এরা সাধারনতঃ সপ্তাহান্তে ঘাট বদল করে । ঝড় তুফান সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মিতালী করে চলে জীবন ধারা । মানতার এমনি একটি বহরের সর্দার শুক্কুর আলী (৫০) এর সাথে কথা হয় গলাচিপার দূর্গম চর মোনতাজ এলাকায় । তিনি বলেন, "নদীতে কখন ঝড় হবে, কখন নদী রাক্ষুসে রূপ নেবে তা আমরা আন্দাজ করতে পারি । আই আমরা আগে ভাগেই নিরাপদ আশ্রয় যেতে পারি । এতে ঝড়ঝঞ্ঝা আমাদের বহরের কোন ক্ষতি করতে পারে না ।"

মানতাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর । রোগাক্রান্ত হলে ডাক্তারের শরনাপন্ন না হয়ে যায় ওঝা ফকিরের কাছে যায় ঝাড় ফুক, তাবিজ কবজের জন্য । নেই পরিবার পরিকল্পনার মত জন্মশাসনের কোন বালাই । এদের ধারণা যত বেশি সন্তান হবে তত লাভ । কারন ছেলে হোক মেয়ে হোক সকলেই মাছ ধরে পরিবারের বাড়তি উর্পাজনে অবদান রাখবে ।

যে বয়সে শিশুদের স্কুলে যায় সে বয়সে মানতা শিশুরা নদীতে সাঁতার কাটছে বা হাল ধরছে, কিংবা মাছ ধরছে ও মাছ বিক্রি করতে পাড়ি জমাচ্ছে স্থানীয় বাজারে।
১২-১৫ বছরের মধ্যে মানতা ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়েতে কনের বাবা নতুন দম্পত্তিকে একটি নৌকা ও সংসারের সামগ্রী কিনে দেয়। বহরে শামিল হয় আরেকটি নতুন নৌকা।
মানতাদের কোনো ভোটাধিকার নেই। তারা জানায় একটি বহরের কয়েক জনের ভোটার তালিকায় নাম আছে গলাচিপায়। শিশু জন্মনিবন্ধন ও নাগরিকত্বের সুযোগ বঞ্চিত এরা। মারা গেলে জানাজা শেষে ভাসিয়ে দেয় নদীতে।
এক কালে ভাল থাকলেও এখন আর ভালো নেই মানতা সম্প্রদায়ের লোকেরা। নদীতে মাছ কমে গেছে কমে গেছে তাদের রুটি রুজি। সর্দার শুক্কুর আলী আরও জানান, নদীতে মাছ মেলেনা। উত্তাল নদীতে সারাদিন নৌকা বেয়েও একবেলার খাবার জোটেনা। ফলে প্রতিটি সদস্যই অভাবগ্রস্থ। অনেকেই ভাবছেন পেশা পরিবর্তনের। কিছু লোক ইতমধ্যেই পেশা পাল্টে ডাঙ্গায় রিক্সা ভ্যান চালানো, ফেরি করা সহ নানা কাজ শুরু করেছে।

৮৮) বাল্য বিয়ে শিকার দশমিনার চরাঞ্চলের শিশুরা
এইচ.এম.ফোরকান (পটুয়াখালী) :
চারদিকে হোগলা পাতার বেড়া উপরে খরের ছাউনি । এ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ফিরোজা (২৫)। দশমিনা উপজেলার চরবোরহানের আলম ফকিরের স্ত্রী ফিরোজা জানান, আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে তার বিয়ে হয়। তিনি ৪ সন্তানের জননী। ভাঙ্গা শরীরে তার উপর ছোট শিশুটি এখন দুধ খাওয়া ছাড়েনি। ফেরোজা অভাবের সংসারে আর সন্তান নিতে রাজি নয়। কিন্তু স্বামী আরও সন্তান নিতে চায়। স্বামী দিন মজুর। কাজের ধান্দায় সারাক্ষন ব্যস্ত থাকে। এদিকে ফিরোজার ৪ সন্তান নিয়ে সংসার সামলাতে হয়। অভাবগ্রস্থ সংসার পরিচালনা ও বাল্য বিয়ের কারনে ফিরোজা পঁচিশেই বুড়ি হয়ে পড়েছে।
একই চরের বারেক গাজীর স্ত্রী কহিনুর (২৬)। ১১ বছর বয়সের সময় কহিনুরের বিয়ে হয় বলে জানান। ৬ সন্তানের জননী বাল্য বিয়ে ও অধিক সন্তানের কারনে অল্প বয়সে কহিনুর বুড়ি হয়ে গেছে। চর হাদির দিলুর ৪ বছর বয়সের শিশু কন্যা সাথীকে তার ভাইয়ের ছেলের সাথে বিয়ের প্রাথমিক র্পযায় সম্পন্ন হয়েছে বলে চরের লোকজন জানান। ছেলে মেয়ের পক্ষের মধ্যে পান-চিনি করা হয়েছে। চর হাদির ভূমিহীন সলেমানের স্ত্রী তাছলিমা (২২)। তাছলিমার বিয়ে হয় ৮ বছর আগে। তার সাথী (৭) বিথী (৪) ও সজিব নামে তিন সন্তান আছে। একই চরের সাহিদা (২২)বিয়ে হয় দশ বছর আগে। কুলসুম (৮), মানা (৫), ফাতেমা (৩) নামের ৩ সন্তানের জননী তিনি। তাছলিমা বলেন-"আমাগো চরের এরকম বয়সে বিয়া হয় প্রতি বছর। কিন্ত কেউ কোনদিন এসব বিয়ের প্রতিবাদ করেনি। শুধু আমনের মুখে শুনলাম এ বিয়া দন্ডনীয় অপরাধ।"
দশমিনা উপজেলার র্পূব পাশে বুড়াঁগৌরাঙ্গ ও তেতুলিয়া নদীর বুক চিরে জেগে ওঠা বাঁশবাড়ীয়া চর, হাদির চর, শাহজালার চর ও চর বোরহান সহ ৭টি ছোট-বড় চর রয়েছে। এসব চরে প্রতিটি ঘরে রয়েছে শিশু বধু। যে বয়সে খেলনার সামগ্রী ও বই খাতা থাকবে হাতে তার, সেই বয়সে বধু হয়ে সংসার জীবনের হাল ধরতে হচ্ছে। জানা যায়, চরগুলোতে প্রায় ৯০/৯৫ ভাগ লোকজন অশিক্ষিত। চরবাসীদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্রতার কারনে বাল্য বিয়ে নিয়মে পরিনত হয়েছে।

৮৯) প্রতিবন্ধত্বকে জয় করে প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেছে ফাল্গুনী
নুসরাত জাহান (পটুয়াখালী) :

শারীরিক প্রতিবন্ধিত্ব জয় করে সাফল্য ছিনিয়ে এনেছে ফাল্গুনী । অসম্ভবকে করেছে সম্ভব । তার দুটি হাতই কেটে ফেলা হলেও সেই কাটা হাতে পরিক্ষা দিয়ে এ বছর ফাল্গুনী প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেছে । তার ইচছা শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে পঙ্গুত্ব ।

ফাল্গুনী সাহা প্রতিটি সুস্থ শিশুর মতোই বেড়ে উঠছিল । মুদি দোকানি জগদিশ চন্দ্র সাহা ও ভারতী রানী সাহা চার কন্যসহ বসবাস করে গলাচিপা শহরে । চার কন্যার মধ্যে ফালগুনী তৃতীয় । ফাল্গুনী সবে মাএ দ্বিতীয় শ্রেনীতে পা রেখেছে । সদা চঞ্চল ফালগুনীর জীবনে মহা দূর্যোগ নেমে আসে ২০০২ সালের ২৬ জানুয়ারি । পরন্ত বিকেলে মেঝ দিদি মুনমুনের সাথে ফাল্গনি প্রতিবেশী বলহরি বনিকের বাড়ির ছাদে যায় । ছাদের উপর দিয়ে ৩৩ হাজার ভোলট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুত লাইন ছিল । অসাবধনতা বসতঃ ফাল্গুনী ডান হাত বিদ্যুতের তারে জরিয়ে গেলে অন্য হাত দিয়ে ছাড়াতে গেয়ে দুহাতে বিদ্যুত স্পৃষ্ঠ হয় । পুরো ঘটনাটি এত দ্রত ঘটে যে কেউ তাকে কোনো সাহায্য করতে পারেনি । প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে পওে বরিশাল শের-ই-বাংলা হাসপাতালে এবং সবশেষে কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয় ফাল্গুনীকে । ডাক্তাররা দুটো হাতের কবজি কেটে ফেলে তাকে গ্যাংগারিনের হাত থেকে রক্ষা করেন । সুন্দর কচি দুখানা হাত কলকাতা ফেলে এসে শারিরিক প্রতিবন্ধত্ব বরন করে সে । প্রায় দেড়লাখ টাকা টাকা খরচ করে তার পরিবারটি হয়েছে নিঃস্ব । আর্থিক সংগতি না থাকায় কৃত্তিম হাত সংযোজন করতে পারেনি তার মুদি দোকানি বাবা ।

এতে ফাল্গুনী থেমে যায়নি । অপেক্ষা করেনি কৃত্তিম হাতের জন্যে । কাটা হাতে সে লিখতে চেষ্টা করে । প্রথমে ব্যথা লাগলেও অব্যহত চেষ্টার ফলে সে লিখতে অভ্যস্ত হয়ে পরে । এভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে ফাল্গুনী । গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সে ২০05 সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সাধারন গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে । তার এ সাফল্যে তার পরিবার, শিক্ষক ও এলাকা বাসী সবাই খুশি ।
ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা ফাল্গুনীর । কিন্তু পঙ্গুত্বেরারনে তা আর এখন সম্ভব না । এখন সে গলাচিপা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ছে । এখন তার ইচ্ছা পড়াশুনা শেষে সরকারি চাকুরি করবে । যাতে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । সে বলে- “আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই । বড় হয়ে আমার মত প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করতে চাই ।”

৯০) পটুয়াখালীতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে এগিয়ে আসছে নারীরা ।

সৈয়দ আমিনুল ইসলাম (পটুয়াখালী) :

“আমরা কাজ না পাইলে মানসের বাড়িতে কাজ করা আর ক্ষেতে যোগালি দেয়া লাগত । এই কাজ পাওনে দুইডা পয়সা পাই, পোলা মাইয়াওে লেখাপড়া করাইতে পারি, সংসার মোটামুটি ভাবে চলে”- কথাগুলো বলেন হাজিরহাট কাশীপুর সড়কের উন্নয়ন কাজের নারী শ্রমিক সখিনা বেগম । সখিনার মত অনেক নারী এখন পটুয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে এগিয়ে আসছে ।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সকিনা জানায়, তার অভাবের সংসারে তিন ছেলে ও এক মেয়ে । দিনমজুর স্বামীর একার রোজগারে সংসার চলছিলোনা । এরই মধ্যে এলাকায় রাস্তা নির্মান কাজে সুযোগ আসে তার মত দরিদ্র অনেক নারীর । রাস্তা নির্মানের কাজে প্রতিদিন গড়ে ১০০-১২০ টাকা আয় হয় । ইতমধ্যে সে তার

দুই ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করেছে। অপর ছেলেমেয়ের স্কুলে যাবার বয়স হয়নি। সব ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করিয়ে মানুষ করার স্বপ্ন সখিনার।

কথা হয় সোনা বরু, মাজেদা, খোদেজা সহ আরও কয়েকজন নারী শ্রমিকের সাথে। এরা সবাই এক সময় কাজের সন্ধানে ছুটত মানুষের বাড়ি বাড়ি। এ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পেরে তাদের সংসারের অভাব যেমন কিছুটা লাঘব হয়েছে তেমনি পাল্টে গেছে তাদের জীবনধারা।

পটুয়াখালীর কাশীপুর হাজিরহাট ৮ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নে ৪৮০ জন নারী শ্রমিক কাজ করে। এরা ১২ টি দলে বিভক্ত হয়ে মাটি কাটা, কালভার্ট নিমার্ন ও রাস্তা কার্পেটিং এর কাজ করছে। এমনি ৪০ জনের একটি দলে কাজ করে সখিনা। দলনেত্রী হাজেরা বেগম জানায় তার দলটি ৪৮০ মিটার মাটির কাজ করার জন্য ২ লাখ ৩৯ হাজার ৩৯৪ টাকায় নির্মান সংস্থার সাথে চুক্তি বদ্ধ। তিন মাসে তাদের অংশের কাজ শেষ করার কথা। যদি তারা পুরুষদের মত কাজ করতে পারত তবে দৈনিক আয় হত ১৫০ টাকা। চেক থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে সপ্তাহে ব্যাংক থেকে টাকা পায় তারা। কোন দালাল না থাকায় খুশি তারা। ন্যায্য মজুরী ও কাজের অনুকূল পরিবেশ থাকায় এ অঞ্চলের অভাবী ও দুস্থ নারীরা অধিক হারে উন্নয়ন কর্মকান্ডে এগিয়ে আসছে। দাতা সংস্থা ডানিডার অর্থায়নে এলজিইডির তত্ত্বাবধানে এ নির্মাণ কাজ চলছে। ডানিডা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন–"এ প্রকল্পে নারী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। প্রথম দিকে নারীরা কাজে আসতে অনীহা প্রকাশ করলেও এখন তারা আগ্রহের সাথে কাজ করছে।"

৯১) দশমিনার শিশু শ্রমিকদের বেড়ে ওঠা/ সকাল সন্ধ্যা কাজের ধান্ধা

এইচ. এম. ফোরকান (পটুয়াখালী) :

ওদের জন্ম ক্ষুধা নিয়ে আসা। ক্ষুধার যন্ত্রনা কি ওরা তা জানে। তাই শিশু বয়সে হাতে তুলে নেয় শ্রমের হাতিয়ার। কেউ জেলে নৌকার বৈঠা হাতে, কেউ লাঙ্গল হাতে, কেউ জাল হাতে, কেউ রাখালের লাঠি হাতে কেউ আবার হোটেলে কাজ করছে ওরা। পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার ছয় ইউনিয়ন সহ চর হাদি, চর বাশঁবাড়িয়া, চর শাহজালাল, চর বোরহানের প্রায় ৮ হাজার শিশু শ্রমিকের তথ্য পাওয়া গেছে।

শাহিন (১০) বাড়ি আলীপুর ইউনিয়নের পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সে চতুর্থ। বাবা কালাম মাতবর মারা গেছে ওর খুব ছোট বেলায় আর মা বিউটি বেগম ওদের রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তারপর থেকে শাহিন ভাইয়ের কাছে মানুষ। কাজ না করলে ভাই রাখেবেনা বলে দিয়েছে তাকে। হাফেজ ভাইর হোটেলে কাজে করে সে মাসে ৩০০ টাকা পায়। তাই তুলে দেয় ভাইয়ের হাতে।

নাঈম (১১) বাবা মায়ের বিয়ে বিচ্ছেদ হয় ছয় বছর আগে। দু ভাই ওরা। নাঈম বড়। তার মা দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। তাদের খোঁজখবর নেয়না। আর বাবা ঢাকায় গিয়ে নিখোঁজ। নাঈম বলে -"আমারে কেউই ভালবাসেনা, কেউ খাইতে দেয়না। এজন্য কাজ করি হোটেলে।"

মিষ্টিস্টর দোকানে কাজ করছে সমীর (১১), জহিরুল (১০)। গ্রামের ৯ বছরের জাফর বুড়াগৌরাঙ্গ নদীতে জেলে নৌকার হাল ধরছে পেটে ভাতে। বাবা চান্দু মারা গেছে তার দুই বছর বয়সে।

জেলে নৌকায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে লিটন (১০), রাসেল (৮), কাওসার (১৩)। তারাও কাজ করে পেটে ভাতে।

চর শাহজালালের জরিনা (১০), নাজমা (৯), হামিনা (১২) ধান কাটার সময় ধানের ছড়া টোকানোর কাজ করে। অনেকেই জানান চরের শিশুরা খুব কম বয়সেই কোন না কোনো শ্রমে জড়িয়ে যায়। বেশির ভাগ শিশুর ধানের ছড়া কুড়ানো ও মহিষের রাখাল হিসেবে কাজ করতে হয়। ফলে ওদের আর পড়াশোনা হয়না।

৯২) চর মোন্তাজের হাজার হাজার শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

সাইখুল ইসলাম উজ্জল (পটুয়াখালী) :

চর মন্তাজের হাজার হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । এ চরের শিশুকে তার পিতা তার সাথে পোনা মাছ ধরা কিংবা কৃষি কাজে লাগিয়ে থাকে । এ চরের অধিবাসীরা বেশির ভাগই মূর্খ । নামে মাএ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এ চরে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে এ চরের হাজার হাজার শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ।

উপজেলা সোনার চর, চর আন্ডা, চর তাপসী, চর বাংলা, চর বৃষ্টি, চর রুস্তম,আশারচর, দিয়ারচর, চরলক্ষী, চর মার্গেট, খলিফা ও চর মোন্তাজ এই ১২টি চর নিয়ে এ ইউনিয়ন । এখানে প্রায় ৩৫ হাজার লোকের বসতি অথচ এই বৃহওম ইউনিয়নে মাএ ১টি সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়, ৬টি রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি দাখিল মাদ্রাসা, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদ্রাসা অনেক দুরে হওয়ায় অনেকেই পঞ্চম শ্রেনী পাশ করে আর লেখাপড়া করতে পারছেনা । এরপর নদীতে পোনা মাছ ধরা কিংবা অন্যের বাড়িতে কাজ করে গরীব পিতাকে সাহায্য করে থাকে এ চরের শিশুরা ।

চর আন্ডার ইফসুফ মিয়া জানান, তার ৪ ছেলে ২ মেয়ে ও মধ্যে কেউ লেখা পড়া করেনি । তিনি বলেন- “আমরা গরীব আমাগো পোলা-মাইয়ারে কিভাবে ল্যাহা-পড়া করামু । ল্যাহাপড়া করলে তো আর প্যাডে ভাত পরবেনা । তার চেয়ে আমার ৩ পোলা ১ মাইয়া আমার লগে পোনা মাছ ধরে । প্রত্যেক দিন ১০০-১৫০ টাকা কামাই করে । আর তা দিয়ে সংসার চলে ।” এভাবে চরের অশিক্ষিত অবিভাবকদের কারনে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা ।

আবার অনেক শিশু লেখা পড়া করতে চাইলেও সংসারের অভাবের তাড়নায় লেখাপড়া বাদ দিয়ে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে । চর বাংলার শিশু আবু সোলায়মান (১১) বলেন, দু’বছর আগে তার বাবা ক্যান্সারে মারা গেছে । যত টুকু সম্পদ ছিল পিতার চিকিৎসায় শেষ হয়ে গেছে । সংসারের হাল ধরতে পড়ার ইচ্ছা থাকা সত্যেও লেখা পড়া বাদ দিয়ে এখন মৌসুমে পোনা মাছ ধরা এবং বাকি সময় অপরের গরু মহিষ রাখার কাজ করে । সে দুঃখের সাথে বলে-“আমার বয়সি ছেলে-মেয়েরা যখন স্কুলে যায় তখন খুব কষ্ট হয় । মন চায় স্কুলে যেতে কিন্তু তখন চিন্তা করি স্কুলে গেলে খাব কি । আর তখনই মন খারাপ হয়ে যায় ।”

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে চর মোন্তাজের শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেনা । চর রুস্তমের আউয়াল মিয়া বলেন-“আমার ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া করাবার ইচ্ছা ছিল । কিন্তু পঞ্চম শ্রেনী পাশ এরপর আর লেখা-পড়া করাতে পারেননি । কারন হিসেবে জানান, চর মোন্তাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখান থেকে অনেক দুর । লঞ্চে যেতে দৈনিক ৩০ টাকা ভাড়া দিতে হয় । এত টাকা খরচ করে ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া করতে পারেনি চর মোন্তাজ ইউনিয়নের হাজার হাজার শিশু । চর মোন্তাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীন বলেন-“এটি একটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা । এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম । মাএ একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকায় এখানকার শিশুরা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । এছাড়া অশিক্ষিত লোকদের ছেলে মেয়েরা অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে । চর মোন্তাজের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান প্যাদা বলেন, এ চরের বেশির ভাগ মানুষ গরীব ও অশিক্ষিত তাই তাদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন ।

সারাদেশে যখন শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য ঢাক ঢোল পিটানো হচ্ছে আর ঠিক তখনই যোগাযোগ বিছিন্ন চর মোন্তাজ ইউনিয়নের হাজার হাজার শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চর মোন্তাজের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে এ চরের শিক্ষা বঞ্চিত শিশুকে শিক্ষার আলোতে আনা সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন।

৯৩) স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করায় ৩ সন্তানের জননী মিনারা বেগম পালিয়ে বেড়াছে

ঝর্না আহমেদ (পটুয়াখালী) :

স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করায় ৩ সন্তানের জননী মিনারা বেগম পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঝর্না অত্যাচার নির্যাতনের অভিযোগে স্বামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল পটুয়াখালীতে মামলা করায় তিন সন্তানের জননী মিনারা বেগম পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।স্বামীর কর্তৃক নির্যাতিত মিনারা বেগম জানায় কলাপাড়া উপজেলার ৭ নং লতা চাপলি ইউনিয়নের তুলাতুলি গ্রামের বাসিন্দা ছলেমান শেখের ছেলে জয়নাল শেখ এর সাথে ৫ম শ্রেনীতে পড়া অবস্থায় আনুষ্ঠানিক ভাবে তার বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং দাম্পত্য জীবন মোটামুটি সুখে কাটে। তার বড় ছেলে মিজানুর শেখ, ৭ম শ্রেনীতে পড়ে মেয়ে জিন্নাত বেগম প্রাইমারি স্কুলে পড়াশুনা করছে। ছোট মেয়ে তানজিলা মায়ের কোলে দুধ পান করছে বয়স ৩ বছর। এ অবস্থায় মিনারা বেগমের উপর শুরু হয় নির্যাতন তিন সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে আসছিল। মিনারা জানায় তার অনুমতি ছাড়াই তার স্বামী একই ইউনিয়নের হুচেনপাড়া গ্রামের তোতা সামসুর বিধবা মেয়ে এক সন্তানের মা সাহিদা বেগমের সাথে সখ্যতা গড়ে এবং এক পর্যায়ে বিবাহ করে। তার পর থেকে শুরু হয় অত্যাচার র্নিযাতন গত ২৫ মে স্বামী, তার সহোদর ভাই জাহা শেখ এবং বোন জামাই নুরুদ্দিন পিয়ন জোটবদ্ধ হয়ে মারধর করে হত্যার উদ্দেশ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। এলাকার লোক জন জানায় মিনারা বেগমের ডাক চিৎকার শুনে এসে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্বামী জয়নাল শেখ গ্যাংদের ভয় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে না পেরে বড় ছেলে মাকে নিয়ে পালিয়ে পটুয়াখালীতে এসে ডাক্তার দেখায়। মিনারা বেগম জানায়, সুস্থ্য হয়ে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে ৪ জুন স্বামী জয়নাল শেখ সহ জাহা, শেখ নুরুদ্দীন পিয়ন ও ২য় স্ত্রী সাহিদা বেগমকে আসামী করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে মামলা দায়ের করেন মামলা নং ১৭৪/০৭ বলে জানায় মিনারা বেগম। মিনারা বেগম আরো জানান আসামী স্বামী জয়নাল শেখ সহ অন্যরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকী দেয়। তুলে না নিলে চোখ তুলে দিবে এবং খুন করবে। আসামীদের জীবন নাশের হুমকীর ভয়ে তিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে মিনারা বেগম।

৯৪) পটুয়াখালীর বয়স্ক, তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা নারীরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অবহেলার শিকার

সাইখুল ইসলাম উজ্জল (পটুয়াখালী) :

পটুয়াখালীর বয়স্ক, তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা নারীরা সামাজিকভাবে অবহেলিত। স্বামীহারা অনেক নারী পুত্রবধু কিংবা সন্তানের অবহেলার কারনে ভিক্ষাবৃত্তি, গৃহপরিচারিকা, পানি টানা, মাটি কাটা সহ নানা ধরনের কাজ করে একাকীত্ব জীবন যাপন করছে। এসব নারীদের জীবন চলছে কোনোরকম খেয়ে না খেয়ে। সরেজমিন কয়েকজন নারীর সাথে আলাপ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে। জেলার ছোট বিঘাই ইউনিয়নের আবু ইউসুফ মিয়ার মেয়ে নাজমার ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয় এলাকার আবুলের সাথে। ১০/১২ বছর পর্যন্ত তাদেও দাম্প্যত্ব জীবন ভাল চলছিলো। দুই সন্তানের জননীও হয়েছে সে। হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায় তার স্বামী। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সে আরেকজনকে বিয়ে করে পালিয়েছে। তখন

বাড়ির পাশের একজনের সহায়তায় পটুয়াখালীতে এসে রাজ মিস্ত্রির যোগালী হিসেবে কাজ নেয়। কিন্তু এ কাজে এসে নাজমার সামাজিক অবস্থান অনেক নিচে নেমে গেছে। তিনি বলেন-"এক শ্রেনীর লোক আমাকে উক্তি করে খারাপ কথা বলে, অসামাজিক কাজের প্রস্তাব দেয়। পরিশ্রম করে টাকা কামাই কইরা সংসার চালাই, তবুও মানুষের কথা শুনতে হয়। ইচ্ছা করে মইরা যাই।"

জেলার বয়স্ক বিধাব নারীরা পারিবারিকভাবেও অবহেলার শিকার। তারা এক পর্যায়ে এস ভিক্ষাবৃত্তি করে ও একসময় অন্যের বাড়িতে থাকতে হয়। এমন একজন নারী জাহানারা বেগম (৮০)। রোগা পাতলা স্বাস্থ্যের জাহানারাকে দেখলে মনে হয় এখনই পড়ে যাবে। ঠিকমত হাটতেই পারেনা সে। স্বামী মারা গেছে অনেক আগে। চার মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে জাহানারার সংসার ছিলো। তার স্বামী ২য় বিয়ে করে ঐ স্ত্রীকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেয়। এরপর জাহানারা সন্তানদের নিয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনো রকমভাবে দিনানিপাত করত। এভাবেই মেয়েদের বিয়ে দেয়। শেষে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে ছিলো তার সংসার। ছেলের বিয়ের পর জাহানারার ভাগ্যে নেমে আসে দুঃখের অমানিশা। ছেলে বউ শাশুড়িকে সহ্য করতে পারেনা, বাড়তি ঝামেলা ভাবে। ছেলেও একপর্যায়ে তার সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করে। জাহানারা কষ্টে ঘৃনায় ছেলের সংসার ছেড়ে ভিক্ষা করে দিন যাপন করে। আর রাতে থাকে অন্যের বাসায়। তার কথায়-"আমি এত কষ্ট কইরা ছেলেডারে মানুষ করলাম, আর সে আইজ বউ এর কথায় আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এহনও আল্লাহ মরন দেয়না কেন?"
এভাবে জেলার অনেক নারী পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে অবহেলার শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শেষ বয়সে এসে তারা আশ্রয় পাচ্ছেনা নিজের গড়া সংসারে। সরকারিভাবে বয়স্ক ও বিধাব ভাতা দিলেও যাদের সাথে কথা হয়েছে তারা এর সুফল পাচ্ছেনা। তাদের একটাই দাবী বৃদ্ধ বয়সে সম্মান নিয়ে তিন বেলা পেটপুরে খেয়ে বেঁচে থাকার।

৯৫) পটুয়াখালীর নারী শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী বঞ্চিত

শাহ মাহমুদুর রহমান (পটুয়াখালী):

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে পটুয়াখালীর প্রায় এক লক্ষ নারী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। এদের বেশির ভাগই রাস্তায় মাটি কাটা, মাঠে কাজ করা, ইট ভাটায় কাজ করা, সাগরে পোনা ধরা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সমান কাজ করছে। কিন্তু মজুরী ক্ষেত্রে তারা পুরুষের সমান মজুরী পায়না।
অনুসন্ধানে নারী ও পুরুষের মজুরী বৈষম্যের বাস্তব চিত্র পাওয়া গেছে। আলেয়া বেগম (২০) বিয়ে হয়েছে লোহালিয়ার কুড়িপাইকা গ্রামের মোক্তার আলীর সাথে। ৫/৬ বছর তাদের সংসার জীবন অতিবাহিত হবার পর ২০০৩ সালে গ্রামীন ব্যাংক থেকে আলেয়া ঋন উঠিয়ে স্বামীকে একটি রিক্সা কিনে দেয়। কিছুদিন রিক্সা চালানোর পর মোক্তার আলী হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আলেয়া জানতে পারে তার স্বামী এক মহিলাকে নিয়ে পালিয়েছে।
আলেয়ার প্রতিবেশি রহিমা (২৪) শহরে গিয়ে ইট ভেঙ্গে সংসার চালাতো। উপায়ান্তর না পেয়ে আলেয়াও তার সাথে এ কাজ নেয়। এদিকে গ্রামীন ব্যাংক থেকে তার কিস্তিও টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে। তিনি নিয়মিত ২০০৪ সাল থেকে ইট ভেঙ্গে সংসার চালাচ্ছেন ও ঋনের টাকা পরিশোধ করে আবার ঋন নিয়েছেন। এক এক দিন একক মালিকের ইট ভেঙ্গে ৩৫-৪০ টাকা পান। অন্যদিকে একজন পুরুষ শ্রমিক পায় ৯০-১০০ টাকা।

কথা হয় মাহফুজা বেগম (৫০) এর সাথে। তার ছয় মেয়ে ও এক ছেলে । স্বামী আলাউদ্দিন মাঝি (৬০) এখন অসুস্থ। কাজ করতে পারেননা। কোনো উপায় না পেয়ে বৃদ্ধ বয়সে ইট ভাঙ্গার মত কঠিন কাজ করছে। দৈনিক ৫০-৬০ টাকার কাজ করেন তিনি। তাই দিয়ে স্বামী স্ত্রীর সংসার চলে কোনোভাবে। কিন্তু টাকার অভাবে অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা করাতে পারছেননা। তিনি বলেন-"ঠিক মতন দুইটা ভাত খাইতে পারিনা, ছেলে মেয়েরা খোঁজখবন নেয়না, ইট ভাঙ্গতে কস্ট হয় তবুও ভাঙ্গি কিন্তু মজুরি পাই কম। অথচ ব্যাডা (পুরুষ) মানষে এই কাজ কইরা আমাগো চাইতে বেশি মজুরী পায়, তহন খুব খারাপ লাগে"

লাউ কাঠির নুরভানু (৩২)। দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। স্বামী মারা গেছে পাঁচ বছর আগে। সারাদিন ঢালাইয়ের কাজের বোঝা বহন করে পায় ৫০-৬০ টাকা। আবার এ থেকে ৫/১০ টাকা দিতে হয় শ্রমিক নেতাকে। অন্যদিকে এই সমান কাজে পুরুষ শ্রমিকরা পায় ৯০-১০০ টাকা। অথচ টাকার অভাবে তারা চিকিৎসা করাতে পারেনা, পারেনা ঠিকমত পেটপুরে খেতে।
এ মজুরী বৈষম্যের কোনো কারন জানা নেই তাদের। তাদের কথা পুরুষেরা বেশি শক্তিমান হলেও সমান কাজে সমান মজুরী তাদের প্রাপ্য। কিন্তু সব ধরনের শ্রমেই নারীদের ঠকানো হয়। তারা এ নিয়মের পরিবর্তন দাবী করে।

৯৬) যৌন পলীর শিশুরা অন্ধকার থেকে আলোর পথে

শাহ মাহমুদুর রহমান (পটুয়াখালী) :

পটুয়াখালীর যৌন পলীর শিশুরা এখন আলোর পথে । এক সময় তারা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার ছিল। বঞ্চিত ছিল শিক্ষার আলো থেকে। লেখাপড়া না করার কারনে নিরক্ষর ছিল। শিক্ষা অর্জন করতে না পেরে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়তো । যৌনকর্মীরা তাদের ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখানোর ইচ্ছা থাকলেও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও আর্থিক অভাবের কারনে তা সম্ভব হয়নি । পটুয়াখালী যৌন পল্লীর মধ্যে ইতপূর্বে কোন সরকারী ও আধাসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য কোন চিকিৎসালয় ছিল না। বর্তমানে এখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও স্থাপিত হয়নি। তবে বি.ডবিউ.এইচ.সি এর সহযোগিতায় ২০০৪ সলের নভেম্বর মাসে "ডে কেয়ার সেন্টার " সাভিস চালু করা হয়। বর্তমানে এ "ডে -কেয়ার সেন্টার" ৩৫/৩৬ জন শিশু সেবা গ্রহণ করে । সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, বিকেলের নাস্তা, পোষাক পরিচ্ছদ ও লেখাপড়ার আসবাবপত্র এ "ডে -কেয়ার সেন্টার" থেকে যৌন কর্মীর শিশুরা নিয়মিত পাচ্ছে। ইতমধ্যে ১৩ জন শিশুকে যৌনপল্লির বাহিরে গিয়ে চরপাড়াস্থ র্মাতৃ কল্যান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।
বিদ্যালয় অধ্যয়নরত ইমরান (১১), নদী (৯), সাথী (৮), অলি (১০), নাসরিন (১০) বলে-" স্কুলে পড়তে ভালো লাগছে। আমরা স্কুলে পড়ব। আমরা পড়ালেখা করে বড় হতে চাই।"
সাংসারিক অভাব অনটন, সৎ মায়ের জ্বালা, প্রেমিকের প্রতারনা, স্বামীর অত্যাচার কিংবা দালালদের খপ্পরে পরে এ পেশায় অনেকের আসা। যৌন কর্মী সন্ধ্যা রানী (৩৬) বলেন-"প্রায় ২৪ বছর এ পেশায় জড়িত আছি।" তার পৈত্রিক নিবাস বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায়। সন্ধ্যা রানী পাশের বাড়ী বশির মেম্বারের ছেলে সুমনের সাথে দীর্ঘদিন প্রেম ছিল। পালিয়ে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে সুমনের হাত ধরে ঘর থেকে টাকা পয়সা স্বর্নালংকার নিয়ে বরিশাল যায়। সুমন সমস্ত টাকা পয়সা সোনা নিয়ে সন্ধ্যাকে বরিশাল লঞ্চঘাট রেখে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যা কোন উপায় না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাটতে থাকে। এ সময় এক দালাল চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে পটুয়াখালী যৌন পল্লীতে নিয়ে আসে। আর হিন্দু পরিবার বলে বাড়ী

যেতে না পেরে এ পেশায় থেকে যায় সন্ধ্যা। দশ বছরের তার একটি মেয়ে আছে, নাম তার নদী। সন্ধ্যা তার মেয়ে নদীকে লেখা পড়া করাতে পেরে আনন্দিত। সে তার মেয়েকে এ পেশায় রাখতে চায় না। যৌন কর্মী কাজুলী (১৮) বলেন-"ভদ্র সমাজের লোকজন কিংবা তাদের ছেলে মেয়েরা মোগো সাথে কিংবা মোগো পোলা মাইয়ার সাথে মিশতে চায় না।কিন্তু মোরা ভদ্র সমাজের লোকের পিছে হাটতে চাই। সুস্থ্য ও স্বাভাবিক ভাবে বাচঁতে চাই।"

পটুয়াখালীর যৌন পল্লীতে প্রায় ৭২ জন যৌন কর্মী রয়েছে। এদের মধ্যে ৫০ জন ছাড়া বাকিরা বয়স্ক। বয়স্ক যৌনকর্মীদের আয় নাই বললেই চলে। বর্তমানে কম বয়সী কিংবা বেশী বয়সী, সকলেরই আয় উর্পাজন কম হয়। কেননা এখন যৌন পল্লীতে খদ্দের খুবই কম যায়। যৌন কর্মীরা আত্মর্নিভরশীল হতে চায়। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে যৌন পল্লীতে সেবামুলক কাজ করেছে। বর্তমানে বি.ডবিউ.এইচ.সি সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রম,স্প্রীড ট্রাস্ট প্রশিক্ষণমূলক র্কাযক্রম, কাযুস স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য যে ২০০4 সালের জুলাই মাসে "আর্দশ মহিলা সংস্থা" সচেতনতা ও ডে কেয়ার সেন্টার কার্যক্রম নিজ অর্থায়নে শুরু করেছে। কয়েকমাস পরে বি.ডবিউ.এইচ.সি এর অর্থায়নে ডে-কেয়ার সেন্টার (শিক্ষা র্কাযক্রম চালু হয়)। বর্তমানে চলছে এই শিক্ষা কার্যক্রম। আদর্শ মহিলা সংস্থার পরিচালক এবং বি.ডবিউ.এইচ.সি এর কো'অর্ডিনেটর আফরোজা আকবর বলেন- "আমরা র্দীঘ দিন যৌনপল্লীতে যৌনর্কমীদের কল্যানার্থে কাজ করে আসছি। সচেতনতা, প্রশিক্ষন , স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও শিশু শিক্ষা র্কাযক্রম পরিচালনা করছি। ভবিষ্যতে আমাদের বি,ডবিউ,এইচ,সি এর অর্থায়নে পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টারকে আবাসিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।" তিনি আরো বলেন- "যৌন পলীর যৌনকর্মীরা পূর্বের তুলনায় তারা অনেক সচেতন হয়েছে। তারা নিজেদেরকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। সর্বপরি তারা ভালোভাবে জীবন যাপন করতে চায়।"

৯৭) কুয়াকাটায় খুন হওয়া ঢাকার স্কুল শিক্ষীকা তানিয়ার দুখুনি গ্রেফতার

ইসরাত জাহান (পটুয়াখালী) :

সাগর সৈকত কুয়াকাটার বেড়াতে এসে পাষন্ড স্বামীর হাতে নির্মম ভাবে খুন হওয়া ঢাকার স্কুল শিক্ষিকা তাহমিনা শারমিন তানিয়া (২৮) ও অপর দু'খুনি পুলিশের হাতে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে পুলিশ তানিয়ার ঘাতক স্বামী জাহিদকে ঘটনার দিনই গ্রেফতার করে। কুয়াকাটায় দু'দিন বেড়ানোর পর ঢাকায় ফেরার পথে গত ৩০ জানুয়ারি মঙ্গলবার গভীর রাতে কলাপাড়ার রজপাড়া এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

পটুয়াখালীর পুলিশ সুপার আবু কালাম সিদ্দীকের অফিস কক্ষে ধৃত দু'খুনি মিজান ও শাহীন তানিয়াকে নৃশংসভাবে খুন করার লোমর্হষক কাহিনী বর্ননা করে। জেলা প্রশাসক এজিএম মীর মশিউর আলমের উপস্থিতিতে ঘাতকরা জানায়, ঢাকার খিলগাঁও-গোড়ান এলাকার বাসিন্দা জাহিদ হাসান জুয়েল তার স্ত্রী শহীদ বাবুল একাডেমির শিক্ষিকা তাহমিনা শারমিন তানিয়াকে খুন করার জন্য এক লাখ টাকার চুক্তিতে ভাড়া করে। এদের মধ্যে শাহীন ২৭ জানুয়ারি কুয়াকাটা বেড়াতে আসে তাদের প্রাইভেট কারের ড্রাইভার সেজে। এক দিন পর কুয়াকাটায় অন্য একটি হোটেলে ওঠে মিজান। পর্যটন কর্পোরেশনের হোলিডে হোমস'র ২০১ নং কক্ষে দুদিন বেড়ানোর পর ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭ টার দিকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। স্বামী জাহিদের পরিকল্পনা মতো মিজান তাদের আগে পৌঁছে যায় ঘটনাস্থল পটুয়াখালী কুয়াকাটা সড়কের রজপাড়া এলাকায়। তানিয়া সহ তাদের গাড়িটি যখন ঘটনাস্থলে বিফল হওয়ার ভান করে থামিয়ে দিলে সেখানে ওৎ পেতে থাকা ভাড়াটে খুনি মিজান ধারালো চাকু দিয়ে তানিয়াকে উপর্যপরি

কুপিয়ে খুন করে। তানিয়ার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর স্বামী জুয়েল ছিনতাইকারিদের কবলে পড়ার নাটক সাজায়। মিজান ও শাহীনকে দিয়ে জুয়েল নিজের শরীরে আঘাতের চিহ্ন তৈরী করে। এর পর গাড়ি সহ মিজান ও শাহীন ঢাকার উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে কিন্তু পটুয়াখালী শহর সংলগ্ন চৌরাস্তায় পৌঁছালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা গাড়ি ফেলে পালিয়ে ঢাকা চলে যেতে সক্ষম হয়। ১০ মাস বয়সের একমাএ শিশু সন্তান জায়মন জাহিদকে নিয়ে ঘটনা স্থলে দাঁড়িয়ে থাকা স্বামী জুয়েলকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে জুয়েল ঘাতকদের নাম-ঠিকানা বলেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রথমে মিজান ও পরে শাহীনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে আসামী জুয়েল, মিজান ও শাহীনের বিরুদ্ধে কলাপাড়া থানা পুলিশ র্চাজশীট দাখিল করেন। সেখানে চার্জশীটে খালাতো বোনের সাথে জাহিদের পরকীয়া সর্ম্পকের জের ধরে এ ঘটনা ঘটে বলে উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে এই মামলাটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারাধীন রয়েছে। আসামী পক্ষ গত ১৫ আগষ্ট দাখিল কৃত চার্জশীটকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেছে এই মর্মে আবেদন করে সময়ের প্রার্থনা করলে আদালত ৪ সপ্তাহের সময় মঞ্জুর করে।

৯৮) গলাচিপার স্বাবলম্বী ১০ নারীর কথা

সাইখুল ইসলাম উজ্জ্বল (পটুয়াখালী) :

ওদের ১০ জনের কেউ বিধবা কারও বা স্বামী ছেড়ে চলে গেছে। স্বাভাবতই ওদের অবস্থান ছিলো সমাজে অন্য ১০ জন নারীর তুলনায় অনেকটা নিচে। তবুও হারেনি ওরা। জীবন সংগ্রামে আর এমপির সহযোগিতায় খুজেঁ পেয়েছে আশ্রয়। এরা হচ্ছেন গলাচিপার গজালিয়া ইউনিয়নের আনোয়ারা, মাজেদা, নিলুফা, মমতাজ, খাদিজা, বিলকিস, জাহানারা, মোমেনা, মোর্শেদা ও নাছিমা।

অসহায় এসব নারীর জীবন চলত কেনোরকম খেয়ে না খেয়ে। সংসার চালাতে তাদের ঘুরতে হয়েছে এখানে ওখানে। গৃহপরিচারিকার কাজও করতে হয়েছে। গৃহকর্তার কুনজরেও পরেছেন কেউ কেউ। মাঠে কাজ করেছেন, কাজ করেছেন হোটেলে রাস্তায়। ইচ্ছে থাকা সত্বেও তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করাতে পারেননি। তাদের ১০ জনের মোট ১৪ জন ছেলেমেয়ে পরিনত হয়েছে শ্রমিকে। এলজিডি ও কেয়ার এর আরএমপি প্রোগ্রামের আওতায় ২০০৪ সালের রাস্তা সংস্কারের কাজে তাদের নিয়োজিত করা হয়। গ্রামীন যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচী নেয়া হয়। উঁচু নিচু রাস্তাকে সমতল করাই তাদের কাজ। এ কাজের বিনিময়ে প্রতিমাসে দুবার মোট ৫৭৪ টাকা দেয়া হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে এসব কিছু জানা যায়। বিধবা আনোয়ারা (৪৫) স্বামী চার বছর আগে মারা গেছে। দুই মেয়ে এক ছেলে তার। ছেলেটি মানসিক প্রতিবন্ধী। আগে গৃহপরিচারিকার কাজ করে সংসার চালাতো। একই কথা বললেন উত্তর হরিদেবপুর গ্রামের বিধাব সাজেদা (৪০)। স্বামী মারা গেছে ১১ বছর আগে। এক মেয়ে এক ছেলে তার। অভাব কাকে বলে তা সে এ এগার বছরে বুঝেছেন। তবে কাজ পেয়ে এখন সে খুশি।

নিলুফা (২৫) জানান দুই বছর আগে তার স্বামী হাবিবুর রহমান তিন ছেলে রেখে মারা গেছেন। নিলুফা বলেন-"শত ইচ্ছা থাকলেও পেটের দায়ে বড়ছেলেডারে স্কুলে ভর্তি করতে পারি নাই। নিয়াজ এখন কাজ করে হোটেলে।"

স্বামী পরিত্যাক্ত জাহানারা (৪৫) বলেন -"আমার স্বামী কালাম সিকদার ১০ বছর আগে তিন মেয়ে ও এক ছেলেকে রেখে আরেকটি বিয়ে করে ঢাকায় চলে গেছে। আমাদের আর খোঁজখবর নেয়না।"

চন্দ্রাইলের নাসিমা (২৮) যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় হয়েছেন তালাকপ্রাপ্ত। মৌডুবি মোস্তফা হাওলাদারের ছেলে ফারুকের সাথে বিয়ে হয়েছিলো নাসিমার। কন্যাসন্তান জন্মের পর স্বামী যৌতুক চায়। যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় স্বামী তাকে তালাক দেয়। নাছিমা প্রথমে বাবার বাড়ি এসে অন্যের বাড়িতে কাজ করত। অল্প দিনের মধ্যে গৃহকর্তার কুনজরে পড়ে ফলে কাজটা ছেড়ে দেয়। এখন এ কাজ পেয়ে সে খুব খুশি।
এ দশ নারীকে এ ধরনের কাজে যুক্ত করে তাদের যে আর্থিক নিশ্চয়তা দিয়েছে এজন্য তারা খুশি সবাই। তাদের মত নারীরা যদি এধরনের কাজে যুক্ত হতে পারে তবে তাদের সম্মান আত্মবিশ্বাস দুটোই বাড়বে বলে এসব নারীরা মনে করছেন।

৯৯) আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অশিক্ষা ও দারিদেরও কারনে লোহালিয়ার শিশুরা শ্রমে জড়িয়ে পড়ছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে।
সরোয়ার হোসেন সানু (পটুয়াখালী):
সদর উপজেলার লোহালিয়া ইউনিয়নের অনেক শিশুই স্কুলের পড়াশুনা ছেড়ে দারিদ্রের কষাঘাতে শিশু শ্রমে নেমে পড়েছে। জীবন যুদ্ধে কাজকে তারা হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছে। এলাকার কর্মজীবী শিশু, তাদের অভিভাবক ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
লেখাপড়ার পাশাপাশি আবার পড়াশুনা একদম বাদ দিয়েও অনেক শিশু লোহালিয়া নদীতে পারাপারের কাজ করছে। কেউ গ্রাম থেকে শাক সবজি তুলে নিয়ে বিক্রি করছে শহরে। মাছ ধরে বিক্রি করছে কেউ।
রফিক (১০) জানায় তার বাবা নেই। সংসারে মা ও ছোট দুই বোন আছে। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। কাজের ফাঁকে সে শাক তুলে রাখে। রফিক সেগুলো বাজারে বিক্রি করে তারপর স্কুলে যায়। যে টাকা পায় তা দিয়ে কিছু বাজার করে আনে ও পড়াশুনার খরচ চালায়।
খেয়ার মাঝি রাসেল (১১) তার বাবা নেই। ছোট একটা বোন তার বয়স আট বছর। তার মা শাকপাতা বিক্রি করে। রাসেল বলে-"আমি খেয়ায় লোক পার করি। নৌকা বাইতে কষ্ট হয়। অনেকে ভাড়া না দিয়া চইল্যা যায়। তবুও দুইডা পয়সা হয়। মায় কইছে সামনের বছর আমারে স্কুলে ভর্তি করবে। স্কুলে যাওয়ার আমার অনেক ইচ্ছা।"
বেলাল (১১) তার মা নেই। বাবা শহরে কুলিগিরি করে। তৃতীয় শ্রেনীতে পড়ে সে। সকালে শাক তরকারি নিয়ে বাজারে যায় বিক্রি করতে। মাঝে মধ্যে তার বাবা যেদিন শাক বিক্রি করতে নিয়ে যায় সেদিন সে স্কুলে যায়। বেলাল বলে-"আমার দুই বোন লেহাপড়া করেনা। আব্বায় কউছে মাইয়াগো পড়নের দরকার নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা করে অরাও আমার সাথে স্কুলে যাইবে।"
শিশু শ্রম প্রসঙ্গে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান বলেন-"আমাদের এলাকায় অনেকেরই তেমন জমি নেই। কোনো ভাবে সংসার চালায়। তাদের ছেলেমেয়েরা এ কারনে স্কুলে না গিয়ে একটু বড় হলে কাজ করতে যায়। আমরা চেষ্টা করছি এ ব্যাপক শিশু ক্রম বন্ধ করতে। হঠাৎ করে তো আর বন্ধ করা যাবেনা, এটা সময় সাপেক্ষ। শিশুদের পুর্নবাসন না করে শ্রম বন্ধ করলে সরকারের কাংখিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবেনা।

১০০) নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার বঞ্চিত পটুয়াখালী জেলার শ্রমজীবি নারীরা
কাইয়ুম আহমদ জুয়েল (পটুয়াখালী):

পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলা এবং উপকুলীয় চরাঞ্চলের শ্রমজীবী নারীরা নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পারিবারিক অসচ্ছলতা, ধর্মীয় অনুভুতি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ এবং নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার সমন্ধে সঠিক তথ্য না থাকার কারনে তারা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ।

পটুয়াখালী জেলার উপকুলীয় উপজেলা দশমিনা, গলাচিপা, রাঁঙ্গাবালি, কলাপাড়ায় প্রায় ছোট বড় ১৫০টি চর রয়েছে। এসব চরের মধ্যে চর বাঁশ বারিয়া, চর হাদি, চর বোরহান, চর শাহজালাল, সোনার চর, চর কাজল, রূপার চর, আন্ডার চর এতে প্রায় ১ লক্ষ লোক বাস করে। মূল ভুখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এ সব চরাঞ্চলের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি কোন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, নেই কোন অব কাঠামোগত সুবিধা। সাগর ও নদী বেষ্টিত এসব জন বসতি পুর্ন চরাঞ্চলের অধিকাংশ নারী শ্রমজীবি। গৃহস্থলি, কৃষিকাজ, মৎস আহরন, মাটিকাটার মতো কাজে তারা তাদের শ্রম দিয়ে থাকে। দিন রাত তারা পরিশ্রম করে সংসারের সচ্ছলতা আনার জন্য। তারা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মাতৃত্বের অধিকার থেকে। চর অঞ্চলের এসব নারী শ্রমিকরা জানেনা নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে নিরাপদে মা হওয়াকে বুঝায়। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে প্রসব পুর্ব বা গর্ভকালীন, প্রসব কালীন এবং প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন। কিন্তু চরাঞ্চলে অধিকাংশ শ্রমজীবি নারী নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শুধুমাএ স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতার জন্য।

পটুয়াখালী জেলার সিভিল র্সাজন ডঃ হুমায়ন কবির এর সাথে কথা হলে তিনি জানান,উপকুলীয় দুর্গম চরাঞ্চলে অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকার কারনে স্বাস্থ্য ও প্রজনন সেবা সম্প্রসারন করা যাচ্ছে না। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মীরা নিয়মিত কাজ করছে।

সাগর বেষ্টিত সোনার চরের রহিম মাঝির (৩৮) শ্রমজীবি রোকেয়া বেগম (৩০) তিনদিন প্রসব বেদনার পর তার বাড়ীতে মৃত সন্তান প্রসব করে। তিনি জানায় মোগো চরে কোন ডাক্তার নাই। আল্লাহর উপরে মোগো ভরসা আছে।

পটুয়াখালীর পানজা বিড়ি কারখানার নারী শ্রমিক সুমিতা রানী (২৮) দীঘদিন ধরে বিড়ি কারখানায় কাজ করে। গর্ভাবস্থায় তিনি ছুটি পায়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। তার সন্তান প্রসবের সময় কোন কষ্ট না হলে তার শিশু সন্তানটি বর্তমানে শ্বাস কষ্টে ভুগছে। ডাক্তার জানায় তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবে শিশুটি শ্বাস কষ্টে ভুগছে।

পটুয়াখালী শহরের বালিকা বিদ্যলয় সড়কে একটি র্নিমানাধীন বাড়িতে ছাদ ঢালাইয়ের সময় কথা হয় হেতালিয়া বাঁধ ঘাট এলাকার নারী শ্রমিক আলেয়া বেগম (২৮) এর সাথে। প্রায় ৫০/৬০ জন নারী শ্রমিক ছাদ ঢালাই কাজে ব্যস্ত কিন্তু আলেয়া বেগম ঘর্মাক্ত শরীরে বসে আছে এক কোনে। কাজ ছেড়ে বসে আছেন কেন, জানতে চাইলে সে বলে -"কয়দিন বাদে পোলাপান অইবে, শইল্লে (শরীওে) কুলায়না , হেইল্লাইগা জিরাইতেছি" । এই অবস্থায় কাজে আসছেন কেন জানতে চাইলে সে বলে– "কামে না আইলে খামু কি, স্বামী রিক্সা চালায় হ্যার কামাইতে সংসার চলেনা। কামে হাইজরা না দিলে এ্যার পর কোন কাম অইলে সর্দারনী বোলাইবে না" । গর্ভবতী হওয়ার পর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়েছেন কিংবা ডাক্তার দেখিয়েছেন জানতে চাইলে বলে – "শরীরের ডাক্তার দেহান লাগে না" ।

মির্জাগঞ্জের সুন্দ্রা কালিকাপুর গ্রামের গার্মেন্টস কর্মী লাইলি বেগম (২৫) জানায়, র্গভকালীন সময়ে র্কতৃপক্ষ তাকে মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেয়ার কারনে গর্ভাবস্থায় দিন রাত কাজ করতে হয়। সন্তান প্রসবের সময় তার শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হলে মৃত সন্তান প্রসব করে এবং বঞ্চিত হয় মাতৃত্বের অধিকার থেকে ।

নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার বঞ্চিত পটুয়াখালী জেলার নারী শ্রমিকরা কোন না কোন ভাবে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখছে। তাই অভিজ্ঞ মহল মনে করছে জেলার উপকুলীয় র্দুগম, চর এলাকার নারী শ্রমিকদের

নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার নিশ্চিত করণে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা সহ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

১০১) লোহালিয়ায় স্কুল বাদ দিয়ে কৃষিকাজে সন্তানদের যুক্ত করছে তাদেও অভিভাবকরা।
সরোয়ার হোসেন সানু (পটুয়াখালী) :
কৃষিপ্রধান লোহালিয়ায় অভিভাবকরা শিশুদেরকে শিক্ষার পরিবর্তে কৃষিতে নিযুক্ত করছে অধিক লাভের আশায়। ফলে ধ্বংশ হচ্ছে শিশু শিক্ষা। ঐ সব শিশুরা থেমে যাচ্ছে জীবনের দ্বারপ্রান্তেই।
পটুয়াখালী সদর উপজেলার লোহালিয়া একটি কৃষি সমৃদ্ধ এলাকা। বেশির ভাগ লোক তাই কৃষি কাজে জড়িত। বিভিন্নকৃষি জাত দ্রব্য উৎপন্ন ও বাজারজাত কওেই তারা জীবীকা নির্বাহ কো। ফলে বেশিরভাগ লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল না হলেও এ কাজেই তাদের অন্নের সংস্থান হয়। যেহেতু দরিদ্র পরিবারগুলোতে শিক্ষার হার কম তাই এসব পরিবারের বাবা মায়েরা শিক্ষার মর্ম না বুঝেই ছেলেমেয়েরাা একটু বড় হলেই অধিক লাভের আশায় তাদের স্কুলে না পাঠিয়ে যুক্ত করছে তাদের পেশা কৃষিতে। তাদের চিন্তা ছেলেমেয়েরা এখন কাজ করলে নগদ পয়সা পাবে।

এ ব্যাপারে এলাকার কৃষক আঃ হামিদ (৪৫)। তার দুই ছেলে। দ্বিতীয় শ্রেনী পর্যন্ত পড়ানোর পর আর পড়াশোনা করাচ্ছেন না। বড় ছেলে কালাম (৯) তার সাথে ক্ষেতে কাজ করে। সকালে শাক তরকারি নিয়ে বাজারে যায় বিক্রি করে বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরে। আর ছোট ছেলে ছালাম (৭) বাড়িতে গরু দেখাশোনা করে, মাকে কাজে সাহায্য করে। তিনি বলেন-"আমরা চাষা মানুষ, আমাদের কাজ খেতে শাকসবজি হওয়ানো। হেইয়া বেচমু আর ছেলে মেয়ে লইয়া সংসার চালামু। লেহাপড়া করাইয়া কি করমু। একে তো পয়সা খরচ তার উপওে দেশে চাকরি নাই। তার চাইতে এই কাজই ভাল"। এ বিষয়ে কালাম বলে -"আমার ইচ্ছা আছিলো আরও পড়মু আব্বায় দেয় নাই। এহন তার লগে কাম করি।"

এলাকার রিক্সা চালক আবু হানিফ (৫০) তার দুই মেয়ে দুই ছেলে। মেয়ে দুটো অন্য বাড়িতে কাজ করে আর ছেলেদুটো গরু রাখে ও শাক সবজি সংগ্রহ করে বিক্রি করে। আবার বড় ছেলে জামাল তার সাথে এলাকায় রিক্সাও চালায় মাঝে মধ্যে। তার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাননি। তার কথায়- "পড়াশুনা করবে টাকা পামু কই? আর আমার একলার রোজগারে তো সংসার চলেনা। তবুও ওরা আমাকে সাহায্য করে দেইখা একটু আছান পাই।"
আঃ হামিদ ও আবু হানিফের মত এ ভাবনা এ এলাকার অনেক বাবা মায়ের। তারা তাদের সন্তানদের পড়ালেখা করানোর চেয়ে কাজে দেখতেই বেশি পছন্দ করেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার আকাংখা তাদের মধ্যে নেই।
এ বিষয়ে এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুকুল মিস্ত্রী জানান, এলাকার অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠায় না। তারা অনেক চেষ্টা করে তাদের স্কুলমুখী করতে। যখন গম পায় কেবল তখনই আসে। লেখাপড়া বাদ দিয়ে শিশুরা এখন কাজের প্রতিযোগিতায় নামছে।

১০২) কল্যান কলস গ্রামে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী খুনেও অভিযোগ
ঝর্না আহমেদ (পটুয়াখালী) :

পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার কল্যান কলস গ্রামে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী খুন হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী শানু রাঢ়ী সহ আট জনকে আসামী করে নারী ও শিশু নির্যতন দমন ট্রাইবুনালে ৬ আগস্ট ২০০৭ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার তদন্তভার দেয়া হয়েছে গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর। মামলার বিবরন, শুকতারা মহিলা সংস্থা ও বাশবাড়ি মহিলা উন্নয়ন সংস্থা সূত্রে জানা যায় কলান কলস গ্রামের শানু রাঢ়ী ১০/১১ বছর পূর্বে একই গ্রামের মেছের আলী মৃধার মেয়ে রাহেলা বেগমকে বিয়ে করে। তাদের দুটি কন্যা সন্তানও জন্ম হয়। শানু রাঢ়ী বিয়ের পর থেকেই রাহেলার উপর যৌতুকের জন্য চাপ দেয় ও মারধর করে। এক পর্যায়ে সন্তান সহ রাহেলাকে বের করে দেয় বাড়ি থেকে। রাহেলা বেগম বাবার বাড়ি চলে আসে এবং মামলা করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে। মামলা নং ৩২৯/০৬। এক আগস্ট উক্ত মামলার আসামী কোর্টে হাজির হয়ে আপোষ মিমাংসার কথা বলে। আদালত থেকে অন্তবর্তী কালীন জামিনে মুক্তি পায় ১২ আগস্ট ২০০৭ এর মধ্যে আপোষ শর্তে। শানু রাঢ়ী অন্যান্য আসামীদের সাথে আলাপ করে বলে রাহেলার সাথে কোনো আপোষ নেই। ২ আগস্ট ২০০৭ দুপুরের দিকে হাসিনা বেগম সহ আসামী পক্ষের লোকেরা রাহেলার সাথে তর্কে যায়, তাদের ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে স্বামীর ঘর করতে হলে তা না হলে খুন করে ফেলবে বলে হুমকীও দেয়। এক সময় রাহেলার বাবা মা তাকে ঘরে নিয়ে যায়। এরপর তার পিতা মেছের আলী গরুর জন্য ঘাস কাটতে গেলে আসামীরা ঘরে ঢুকে রাহেলাকে মারধর করে এক পর্যায়ে খুন করে বলে মামলার বিবরনীতে জানা যায়। রাহেলার বাবা ঘরে ফেরার পথে আসামীদের দৌড়ে যেতে দেখে এবং ঘরে এসে মেয়েকে মৃত দেখতে পায়। খবর পেয়ে গলাচিপা থানা পুলিশ শাহনেওয়াজ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে এবং আসামী শানু রাঢ়ীকে আটক করে। লাশ ময়না তদন্তে নেয়ার পরে পুলিশ শানু রাঢ়ীকে ছেড়ে দেয়। এবং তার বড় ভাইকে দেখা করতে বলে শাহনেওয়াজ। শানু রাঢ়ী ছাড়া পেয়ে রাহেলার বাবাকে হুমকী দিয়ে বলে বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাকেও খুন করে ফেলবে। জানা যায় মেয়ের মৃতু শোকে অসুস্থ মেছের আলী ৫ আগস্ট গলাচিপা থানায় গেলেও থানা কর্তৃপক্ষ মামলা নেয়নি। ৭ আগস্ট সে আবারও থানায় যায় এবং ৮ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করে। মামলা নং ২৭৫/০৭। বিচারক এজাহার হিসেবে গন্য করার জন্য ওসিকে নির্দেশ দেয়। এ নির্মম হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানান শুকতারা মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সহ অন্যান্য সংস্থার লোকজন।

১০৩) মরিচবুনিয়ায় পাঁচ মাসে কোনো বাল্য বিয়ের খবর পাওয়া যায়নি।

আহসানুল কবির রিপন (পটুয়াখালী) :

পটুয়াখালীর মরিচ বুনিয়া ইউনিয়নে এখন বাল্য বিয়ের বিষয়ে সবাই সচেতন। গত পাঁচ মাসে এখানে কোনো বাল্য বিয়ের ঘটনা ঘটেনি। অল্প বয়সে বিয়ে হলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, বাচ্চা অপুষ্টির শিকার হয় একথা এখন সবাই জানে। বাল্য বিয়ের সাথে জড়িত হলে জেল খাটার আশংকা আছে এটাও এখন সকলের কাছে পরিষ্কার। এলাকার সবাই অঙ্গীকার করেছে ভবিষ্যতে আর বাল্য বিয়ে হতে দেবেনা। আনুষ্ঠানিক এ ঘোষনা এসেছে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে এক সচেতনতা সভায়। পটুয়াখালী সদরের মরিচবুনিয়া ইউনিয়ন ঘুরে জানা যায় এ সচেতনতার কথা। পাঁচ মাস পূর্বে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় একটি বাল্য বিবাহ ঠেকিয়ে দেয় ব্লাষ্ট। এরপর ১৯ এপ্রিল জেলা প্রশাসক এজিএম মীর মশিউর আলম ও পুলিশ সুপারআবুল কালাম সিদ্দিক ঔ এলাকায় যান। তাদের উপস্থিতিতে একটি সচেতনতা সভা হয়। গৃহবধু, শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী, ইউপি সদস্য সহ দুই হাজারেরও বেশি নারী পুরুষ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার মাধ্যমে এলাকা বাসী জানতে পারে বাল্য বিয়ে আইনত অপরাধ। কেউ বাল্য বিয়ের সাথে জড়িত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঐ সভায় সকলে অঙ্গীকার করেন মরিচবুনিয়ায় আর কোন বাল্য বিয়ে হতে দেবেননা।
এর পাঁচ মাস পর ঐ এলাকা ঘুরে দেখা যায় বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ সেখানে সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। ঐ ঘোষনার পর এখন পর্যন্ত কোন বাল্য বিয়ের খবর পাওয়া যায়নি।

১০৪) অসহায় নারীদের আইনী সহায়তা দিচ্ছে ব্লাষ্ট

জাবিদুল হক খান (পটুয়াখালী) :

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইডন্ডে সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) পটুয়াখালী ইউনিটের মাধ্যমে অত্র জেলার অসহায় দুস্থ নারীদের ১৯৯৮ সাল থেকে বিনা মূল্যে আইনী সহায়তা দিয়ে আসছে। ৩১ মার্চ ২০০৭ তারিখে ২০০৭ তারিখে সমাপ্ত বছরে এ সংস্থা ৫৫৪ টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে পটুয়াখালীর বিভিন্ন আদালতে ২২৫ টি মামলা দায়ের ও ৬৬ টি অভিযোগ সালিসের মাধ্যমে নিস্পত্তি করেছে। সরেজমিন পরিদর্শনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
ব্লাস্ট পটুয়াখালী ইউনিটের সমন্বয়কারী জনাব নিজাম উদ্দিন আহমেদ জানান, ব্লাষ্ট সারা দেশে ১৯ টি ইফটি এবং ৫টি ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করছে। তাছাড়া অভিযোগকারীর আসা যাওয়ার ভাড়াও প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তারা বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও মেলার আয়োজন করে থাকে।

সালিস

বিরোধ হলে সালিস ধর ফল না পেলে মামলা কর -এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ব্লাষ্ট সকল সালিস যোগ্য অভিযোগের জন্য শুরুতেই সালিসের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সালিসের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী জনাব রুহুল আমিন বলেন- "মামলার মাধ্যমে ফল পেতে অনেক সময় লাগে এবং দুপক্ষকেই খুশি করা যায়না। কিন্তু সালিসের মাধ্যমে বিরোধ সমাধান করা সম্ভব।" গেল বছর (১ এপ্রিল ০৬ - ৩১ মার্চ ০৭) ৫৫৪ টি অভিযোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৬৬ টি অভিযোগ তারা সালিসের মাধ্যমে নিস্পত্তি করে।

পরিচালিত মামলা

এ বছর বিভিন্ন আদালতে ২২৫ টি মামলা দায়ের করা হয়। পূর্ববর্তী মামলা সহ মোট পরিচালিত মামলার সংখ্যা ৬৭৪ টি ।

নিস্পত্তিকৃত মামলা

মোট ১১৪ টি মোকাদ্দমা নিস্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৬৬ টি আবেদনকারীদের পক্ষে রায় হয়েছে ৬৬ টি এবং বিভিন্ন কারনে খারিজ হয়েছে ৪৯ টি।

এ বছর প্রথম চারমাস

ব্লাষ্টের কর্মবছর ১ এপ্রিল থেকে প্রথম চারমাসে তাদের মোট অভিযোগ এসেছে ৩৩৯ টি। এর মধ্যে সালিস করেছে ৩১ টি এবং মামলা দায়ের করেছে ৮৪ টি।

কেসস্টাডি

দুমকীর রাহেলা খাতুন (২৮)। বিয়ের তিন বছর পর থেকে তার স্বামী ব্যবসা করবে বলে যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। বিয়ের সময়ে স্বামীকে দশ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। নতুন করে আবার দশ হাজার টাকা রাহেলাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিলোনা। তাই বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় রাহেলাকে। রাহেলা ব্লাষ্টের অভিযোগ করলে এখান থেকে সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়। রাহেলা বলেন- "আমি এহন ভাল আছি, এহন আর আমার স্বামী টাহা চায়না।"

এ রকম গলাচিপার রাঙ্গাবালি গ্রামের মোর্শেদা বেগম (৩৫) কন্যা সন্তান জন্মের পর থেকে তার উপর নির্যাতন করা হয়। এর কিছুদিন পর সে নির্যাতনে যোগ হয় যৌতুক। ২০০৭ এর জানুয়ারীতে ব্লাষ্টে এসে অভিযোগ করলে তার স্বামীকে উপস্থিত হবার নোটিশ করে। কিন্তু উপস্থিত না হওয়ায় যৌতুক নিরোধ আইনে মামলা করে ব্লাষ্ট।

(১০৫) পটুয়াখালীর মজুরী বৈষম্যের নারী শ্রমিকের জীবিকা চলে অনাহারে অর্ধাহারে।
কাইয়ুম আহমদ জুয়েল (পটুয়াখালী) :
মজুরী বৈষম্যের শিকার, লোকলজ্জা, সম্মান হারানোর ভয়, সরকারী বেসরকারী সহযোগিতার অভাবে জেলার প্রায় ১০ হাজারের অধিক নারী শ্রমিকেরা অর্ধাহারে, কখনও বা অনাহারে, দিন কাটাচ্ছে। ফলে পরিবারের ছেলে মেয়ে অপুষ্টি সহ, শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থানের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সরেজমিনে কয়েকজন শ্রমজীবি নারীর জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
নারী শ্রমিকদের মধ্যে দুটি শ্রেনী লক্ষ্য করা যায়। এক দল ঘরে বসে শ্রম বিক্রী করে অন্যদল বাহিরে কলকারখানায়, ইটের ভাটায়, রাস্তার কাজে, শ্রম দিয়ে থাকে। দু'দলের মধ্যে যারা ঘরের বাহিরে কাজ করছে তাদের রয়েছে নানা রকম সমস্যা। সমাজের দুশ্চরিত্র লম্পটের কবলে পরে অনেক নারী তাদের শেষ সম্ভ্রম টুকু রক্ষা করতে পারে না এবং সব নারী শ্রমিকদের রয়েছে মজুরী বৈষম্য।
কথা হয় পটুয়াখালীর লোহালিয়া ইউনিয়নের পলের ডাঙ্গা গ্রামের ন্যায্য মজুরী বঞ্চিত নারী শ্রমিক আরতী রানী (৩৫) এর সাথে। তিনি কাজ করেন একটি পানের বরজে। তার সংসারে বৃদ্ধা শাশুরী, দুই মেয়ে ও স্বামী সহ পাঁচ জন সদস্য। স্বামী দিমজুর এই দ্রব্য মুল্যের বাজারে স্বামীর একার আয় দিয়ে সংসার চালাতে না পেরে তিনি ও স্বামীর পাশাপাশি শ্রম দিতে শুরু করেন সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু আরতী রানী পায় না তার ন্যায্য মজুরী। একই পানের বরজে কর্মরত একজন পুরুষ শ্রমিককে দেয় ১৩০-১৫০ টাকা সেখানে একজন নারী শ্রমিককে দেয়া হয় মাত্র ৮০ টাকা। সঠিক মজুরী না পেয়েও তাকে কাজ করতে হয়।
মজুরী বৈষম্যের শিকার দুমকী উপজেলা রহিমা খাতুন (৪৫) ইট ভাঙ্গার কাজ করেন। স্বামীর মৃত্যুতে সন্তান নিয়ে অসহায় অবস্থায় কাজ করে উপার্জন করে তাকেই সংসার চালাতে হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাকে কাজ করতে দেখা যায়। তিনি জানান একজন পুরুষকে দেয় ১৫০ টাকা সেখানে তাকে দেয়া হয় ১০০ টাকা। এভাবেই চলে নারীদের প্রতি মজুরী বৈষম্য। মির্জাগঞ্জের পারুল বেগম (৫০) বিয়ের পর এক পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে স্বামী মারা যায়। পায়রা নদীর করাল গ্রাসে স্বামীর বসত ভিটা বিলীন হলে সন্তান কে নিয়ে শহরে আসে এবং শুরু করে তার সংগ্রামী জীবন। হোটেলে হোটেলে মশলা পেষা ও পানি টানা। ঠিক মত মজুরী পেত না। তারপরও কষ্ট করে ছেলে আলামিনকে এস.এস.সি পাশ করিয়েছিল। কিন্তু সেই ছেলে গার্মেন্টেসে চাকুরী নিয়ে বিয়ে করে আর মায়ের খবর রাখেনি।
বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী নারীদের সাথে আলাপ করে জানা যায় সরকারী কিংবা বেসরকারী সহযোগিতা তারা পায়না। এ ব্যাপারে রয়েছে স্থানীয়দের ভিন্নমত। শ্রমজীবি নারীরা বিভিন্ন স্থান থেকে এসে কাজ করে তাই তারা স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ার কারনে সরকারী সহযোগিতা পান না। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন শ্রমজীবি নারীদের বৈষম্য কমাতে হলে জাতীয় বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে এবং নতুন শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে নারী শ্রমিকদের কল্যানে জেন্ডার সমতা আনতে হবে এবং সরকারী সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাকে একযোগে কাজ করতে হবে তাহলেই মজুরী বৈষম্যের শিকার নারী শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।

(১০৬) পটুয়াখালীতে ঝুঁকির্পুন কাজে শিশুদের নিয়োগ বাড়ছে মানা হচ্ছে না শিশু আইন। শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা।

কাইয়ুম আহমদ জুয়েল (পটুয়াখালী) :

পটুয়াখালী শহরের সর্বত্র শিশু শ্রমিকরা কঠিন খাটুনি খেটে ও সামান্য মুল্যে শ্রম বিক্রি করছে। শ্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসব ক্ষেত্রে কাজ করলেও প্রাপ্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। শিশুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না শিশু আইন।

জেলার শিশু শ্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ও সংশিষ্ট লোকদের সাথে কথা বলে এ তথ্য জানা যায়। দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, অভিভাবকদের অসচেতনতা, নদীভাঙ্গন, বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে এ এলাকার শিশুরা শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। তাছাড়া অনেক পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাড়তি আয়ের আশায় সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে শ্রমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দিনদিন পটুয়াখালীতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমের প্রভাবে এবং অপরিনত বয়সে ঝুকির্পুন কাজ করায় অপুষ্টি, রক্ত শুন্যতা, হাপানী, শাসকষ্ট সহ নানা ধরনের রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। দেশ জুড়ে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস এবং সংশ্লিষ্টদের ভাবনায় শিশুদের স্কুল মুখী করার বিষয় অগ্রগন্য হলেও শিশু শ্রমিকদের বেদনাময় ইতিবৃত্তের পরিসমাপ্তি যেন সুদুর পরাহত। অনেক শিশু শ্রমিকের কষ্ট দায়ক অভিজ্ঞতা এমনি বেদনাদায়ক যে, তাতে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারা যায় না। সামাজিক, অসামান্য বৈষ্যমের শিকার ক্ষুদে শ্রমিকদের আমরা ঝুঁকিপূর্ন কাজ করাতে কুণ্ঠা বোধ করি না।

পটুয়াখালী সদর উপজেলার ১ টি পৌরসভাসহ ১২ টি ইউনিয়নে রিক্সা, ভ্যান, টেম্পু, ট্রলার, গৃহস্থলীর কাজ, আসবাবপত্র, মাটি কাটা, খেয়া নৌকা, আবাসিক হোটেল, খাবার হোটেল, ইটের ভাটা, ইট ভাঙ্গা, ওয়ার্কশপ, কৃষি কাজ , মিল কারখানায় প্রায় ১০ হাজারেরও বেশী শিশু এসব ক্ষেএে শ্রম দিচ্ছে। এলাকার শ্রম ক্ষেত্রে শিশুদের শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হলেও মজুরী নিতান্তই কম। শিশু শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অত্যন্ত কঠিন কাজের পরেও মজুরী থাকে পেটে ভাতে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা র্পযন্ত মজুরী প্রদান করা হয়ে থাকে। শ্রমজীবি শিশুদের সঠিক সংখ্যার হিসেব কারও কাছে নেই।

শ্রমজীবি কালাম (৯) কাজ করে শহরের নতুন বাজার এলাকার হোটেলে তিন বেলা খাওয়া সহ মাসিক ৪০০ (চার শত) টাকা বেতনে কাজ করে। বাবা ফরাজী রিক্সা চলায় সংসারে খরচ মেটাতে ছেলের আয়ের ৪০০ টাকা নিয়ে যান। স্কুলে ভর্তি হয়েছিল অর্থাভাবে লেখাপড়া হয়নি। শুধু নামটুকু লিখতে পারে। আউলিয়াপুর ইউনিয়নের রফিক (১৪) রিক্সা চালায়। বাবা নেই মা সুফিয়া বেগম বৃদ্ধা অবস্থায় ঘরে বসে আছে। বড় ভাই মুরাদ (২০) কর্মহীন ঘুরে বেড়ায় এ কারনেই তাকে রিক্সা চালাতে হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ১০০ টাকা আয় হয় তা দিয়ে কোন মতে দিন চলে যায়।

মিজান (১২) পায়রাকুঞ্জ ফেরীঘাটে ট্রলারে হেলপারি করে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৮০ টাকা হয়। এবং তা তুলে দেয় বাবার হাতে। ইচ্ছে ছিল শিক্ষক হবেন। কিন্তু পারিবারিক অসচ্ছলতার কারনে তাকে এ পেশা বেছে নিতে হয়েছে। ময়না (১৩) শহরের আরামবাগ এলাকার একজন সরকারী কর্মকর্তার বাসায় কাজ করে। পিতা সেলিম মিয়া তিন বছর আগে তাকে সহ তার মাকে ফেলে চলে যায়। মা শিরিন বেগম মানুষের বাসায় কাজ করে। ময়নার লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করলেও হয়ে উঠছে না। কথা হয় সোহাগ (৯) এর সাথে টেম্পুর হেলপার বাবা, মা নেই। বড় ভাইয়ের সংসারে বড় হলেও ভাবির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এই ঝুঁকির্পুন কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিদিন ৫০ টাকা পায় তা দিয়ে তিন বেলা খায় টেম্পু ও বাসা ভাড়া দেয়। বড় হলে কি হবে জানতে চাইলে বলে-"ওস্তাদের মত টেম্পুর ড্রাইভার হব"।

শিশু শ্রমের ব্যাপারে আইন থাকলে ও তা মানা হচ্ছে না। ঝুঁকির্পূন শ্রম থেকে শিশুদের বিরত রাখার আইন পাশ হলেও শিশু শ্রম বন্ধ হয়নি। শ্রম আইন অনুযায়ী ১৬ বছরের নিচে শিশুকে শ্রমের সহিত নিযুক্ত করা সর্ম্পূন অবৈধ। শিশু বলতে ১৫ বছরের কম বয়সী ছেলে মেয়েদের বোঝান হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর চেয়ে ও কম বয়সী শিশুদের ঝুঁকির্পূন কাজে বিভিন্ন মালিকরা নিয়োগ দিচ্ছেন। অভিজ্ঞমহল মনে করেন শিশু আইনের কঠোর বাস্তবায়ন হলে এ সব সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা একদিন দেশ গঠনে ভুমিকা রাখতে পারবে।

(১০৭) লোহালিয়ার নারীরা কর্ম সংস্থানে জড়িয়ে পড়ছে

সরওয়ার হোসেন শানু (পটুয়াখালী) :

লোহালিয়ার নারীরা এখন পুরুষের সমান তালে কাজে নেমে পরেছে। দারিদ্রের কষাঘাত থেকে লাজ লজ্জা ভুলে তারা উপার্জনের পথে নেমেছে। মনে হচ্ছে তারা পুরুষের সাথে কাজের প্রতিযোগীতায় নেমেছে। এর ফলে তারা এখন আগের তুলনায় কিছুটা ভালভাবে জীবন ধারন করতে পারছে। তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে। পরিবারে তাদের মূল্যায়ন বেড়েছে।

লোহালিয়ার নারীরা মাছ ধরা, ক্ষেতে কাজ করা, ফিশিং এ চিংড়ির খোশা ছাড়ানো, তরকারি বিক্রি, বিড়ি কারখানায় কাজ, শাক সবজি চাষ সহ নানা পেশায় যুক্ত হয়েছে। ফলে তারা একটু হলেও স্বামীকে সহযোগিতা করতে পারছে সংসার পরিচালনায়।

মাত্র কদিন আগেও দৃশ্য পট ছিলো ভিন্ন। নারীরা ঘরের বাইরে বের হতে চাইতো না। হাজারো লজ্জা এসে ঘিরে ধরত তাকে। কে কি বলবে, মানুষ হাসবে, জাত যাবে এসব ভাবনা চিন্তা করে তারা শামুকের মত গুটিয়ে থাকত খোলের ভেতর। কিন্তু আজ তারা সে খোলস ছেড়ে বেরিয়েছে। হাতে তুলে নিয়েছে কোদাল, খোন্তা। মাথায় নিচ্ছে বোঝা। আজ আর কেউ তাকে নিয়ে হাসে না।

কাকরাবুনিয়া গ্রামের উরফুলী (৫৫)। মোয়া, চকলেট, ফিতা, রুটি এসব ফেরী করে বিক্রি করে। যখন জিনিস পত্র কেনার টাকা থাকেনা তখন অন্যের বাড়িতে বদলা দেয়। সে জানায় বৃদ্ধ বয়সে এসে এ কাজ করতে বেশ ভালো লাগছে। এখন সে নাতি নাতনীদের নিজের টাকা দিয়ে কিছু কিনে দিতে পারে।

শ্রমজীবী নারী আলেয়া (৩৮)। তার স্বামী মারা গেছে অনেক আগে। দুই ছেলে নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটিয়েছে সে। এখন সে এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে কাজ করে। যখন কাজ থাকেনা তখন শাক, কচুর লতি, কলার মোচা এসব তুলে বাজারে বিক্রি করে। এসব বেচে ৩০-৩৫ টাকা পায় সে। এ দিয়েই চলে তার সংসার। ছেলের বয়স মাত্র ৮। স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। তার কষ্ট হলেও ওকে মানুষ করবে এই তার প্রত্যয়।

আলেয়া, উরফুলীর মত অনেক নারীই এখন নিজেদের চেষ্টায় নিজেরা কিছু করছে। তারা এজন্য খুশি। তবে তাদের অনেকে জানিয়েছে নানা ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তাদের জায়গায় তারা আরও ভাল করতে পারত।

(১০৮) পুত্র হত্যার বিচার চেয়ে খুনিদের হুমকীতে পালিয়ে বেরাচ্ছে মা

নুসরাত জাহান (পটুয়াখালী) :

“আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাচাঁন, আমি আমার শিশু পুত্র কাইয়ুম হত্যার বিচার চাই“- এ আকুতি পটুয়াখালী জেলার র্মিজাগঞ্জের সুবিদখালী গ্রামের সন্তান হারা মা খাদিজা বেগমের। খুনিদের অব্যাহত হুমকিতে মানুষিকভাবে বির্পযস্ত খাদিজা নিজ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে পটুয়াখালী প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে এভাবেই তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুবিদখালী গ্রামের কুয়েত প্রবাসী আঃ খালেক হাওলাদারের স্ত্রী খাদিজা বেগম জানান, গত ২ জুলাই ২০০৭ তার বড় পুএ মোঃ সাইফুল ইসলাম কাইয়ুম (১৫) বিকাল ৩ টার দিকে মোবাইলে ফেক্সি লোড করতে সুবিদখালী বাজারে যায়। এর পর সে আর ফিরে আসেনি। সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজা খুঁজির পর না পেয়ে ৮ জুলাই মা খাদিজা বেগম বাদী হয়ে ৬ জনকে চিহ্নিত করে ১৪ জনের বিরুদ্ধে মির্জাগঞ্জ থানায় একটি অপহরণ ও হত্যা মামলা দয়ের করেন। থানা পুলিশ আসামী শাহিন ও রাজ্জাককে গ্রেফতার করলে ৯ জুলাই তারা মেজিষ্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় জবান বন্দী দেয়। জবান বন্দীতে খুনীরা কাইয়ুমকে খুন করে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দেওয়ার কথা স্বীকার করে। এরপর ১১ জুলাই কাইয়ুমের পরনের শার্ট মির্জাগঞ্জের শ্রীমন্ত নদীর পারে চরে পাওয়া যায়। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে তার হাত পা ও মাথা পাওয়া যায় পায়রা নদীর পারে । সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরো জানান পলাতক অপর খুনিরা তাকে ফোনে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকী দিচ্ছে অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। তারা তার বোন জামাইয়ের পানের বরজে লবন দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে মামলাটি মির্জাগঞ্জ থানা পুলিশ তদন্ত করছে। তবে তিনি সুবিচার পাবে কিনা এ নিয়ে সংশয়ে আছেন। তাই তিনি পুএ কাইয়ুম হত্যার বিচার চেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।

১০৯) যৌতুক বাল্য বিবাহ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার

দারিদ্রকে জয় করে ওরা আজ স্বাবলম্বী

মিলন র্কমকার রাজু (পটুয়াখালী) :

"আমরা ল্যাহাপড়া জানিনা, তাতে কি হইছে, আমাগো পোলা মাইয়াগো ল্যাহাপড়া করামু। তারা আমাগো মত কষ্ট না করে চাকুরী করবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নারী র্নিযাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে"- এ কথাগুলো বললেন কলাপাড়ার নিজামপুর গ্রামের গৃহবধু মরিয়ম বেগম (৫০)। তার মতো এ গ্রামের গৃহবধুরা জানান তারা তাদের মেয়েদের যৌতুক দিয়ে বিয়ে দেবেন না। এমনকি ছেলেদের বিয়েতে ও যৌতুক নিবেন না। মাএ চার বছর আগের কথা। দারিদ্রের কষাঘাতে পিষ্ট ছিল নিজামপুর গ্রামের অধিকাংশ পরিবার।

কর্মহীন এ গ্রামের নারী পুরুষরা দু'মুঠো ভাত সন্তানদের মুখে তুলে দিতে হিমশিম খেতো। সন্তানদের স্কুলে পাঠানো ছিল দুঃসাধ্য। আথিক অনটনে স্বামী -স্ত্রীর অন্তঃকলহে প্রায় প্রতিটি পরিবারে অশান্তি ছিল চরমে। সময়ের আবর্তনে এ গ্রামটি এখন শান্তির গ্রামে পরিনত হয়েছে। বেসরকারী সংস্থা স্পিডট্রাস্টের সহায়তায় পাল্টে গেছে এ গ্রামের দৃশ্যপট। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরের স্থানে এখন টিনসেট ঘর। বাড়ির চারপাশে সবজির ক্ষেত। পরিত্যক্ত পুকুর এখন মাছে র্ভতি। গোয়ালে গরু ছাগল। যে সব ছেলে মেয়েরা ঘুম থেকে উঠে মার্বেল ফুটবল ও পুতুল খেলা করে সময় কাটাতো তারা এখন স্কুল মুখী। সরেজমিনে এ গ্রাম ঘুরে দারিদ্রকে জয় করা গৃহবধুদের সংগে কথা বলে জানা যায় তাদের বর্তমান অবস্থার বাস্তব চিএ। পাঁচ সন্তানের জননী মরিয়ম বেগম জানান প্রায় ৩৫ বছর আগে দিনমজুর আঃ কাদের হাওলাদারের সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামী রিকশা ভ্যান চালিয়ে দৈনিক ৭০/১০০ টাকা আয় করে। ঐ টাকা দিয়ে কোন রকম সংসার চলতো । কিন্তু হঠাৎ সে অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় তার কাজর্কম বন্ধ হয়ে যায়। আর্থিক দৈন্য দশায় বন্ধ হয়ে যায় সন্তানদের লেখাপড়া। বাধ্য হয়ে অসুস্থ্য স্বামী ও সন্তানদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে নেমে পড়ে শ্রম পেশায়। মরিয়ম কান্না জরিত কণ্ঠে জানান, সংসারে যখন চরম অভাব তখন তার বড় দু ছেলে বিয়ে করে ভিন্ন হয়ে যায়। এ সময় তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় স্পিডট্রাস্ট। স্পিডট্রাস্টের নিজামপুর কেন্দ্র থেকে পর্যায় ক্রমে ঋণ নিয়ে তাদের পরামর্শে ছাগল ও হাঁস মুরগী পালন শুরু করে। এভাবে গত চার বছর পশু পালন করে সে এখন স্বাবলম্বী। তার গোয়াল ভর্তি এখন ছাগল। এ সংস্থা

থেকে ৩০ হাজার টাকার ঋণ তার ভাগ্য পাল্টে দিয়েছে। কুড়েঁঘরের জায়গায় এখন টিন সেট ঘর। তার সন্তানরা এখন স্কুলে যাচ্ছে। মরিয়মের মতো দারিদ্রের সংগে যুদ্ধ করে স্বাবলম্বী হয়েছে নিজামপুর গ্রামের লাইলী বেগম, আলেয়া বেগম সহ অনেকে।

গৃহবধু লাইলী বেগম বলেন -"শেষ বয়সে এসে সংসারে একটু সুখের মুখ দেখছি। বাবার ঘরে স্বামীর সংসারে ঠিকমতো দু'বেলা পেট ভরে খাইতে পারিনাই। পোলাপানগো স্কুলে পাডাইতে পারিনাই আর্থিক অনটনের কারনে।" কিন্তু ৩ বছর আগে স্পিডট্রাস্টের সহায়তায় সবজি ও মাছ চাষ করে এখন সে স্বাবলম্বী। দিনমজুর স্বামীকে নৌকা ও জাল কিনে দিয়েছেন। চার ছেলে মেয়ে এখন স্কুলে যাচ্ছে। তার ইচ্ছা ছেলে মেয়েদের অনেক লেখাপড়া করাবেন। লাইলী বেগম জানান, স্পিডট্রাস্ট থেকে আনা ২৫ হাজার টাকার ঋণ তার ভাগ্য পাল্টে দিয়েছে।

এভাবে এ গ্রামের দারিদ্রকে জয় করা গৃহবধুরা জানায় তারা নিজ প্রচেষ্টায় কঠোর শ্রমের কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। এ গ্রামের অধিকাংশ পরিবার সুখের মুখ দেখছে। তাদের ইচ্ছা এ গ্রাম থেকে বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন দূর করবেন। এমনকি তাদের মেয়েদের যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিবেন না এবং ছেলেদের বিয়েতে যৌতুক নিবেন না। মরিয়ম বেগম বলেন সে তার ছেলেকে বিয়ে করিয়েছেন যৌতুক ছাড়া। নজরুল মিয়া বলেন তার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক চাওয়ায় বিয়ে দেননি। এভাবে যৌতুকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে গোটা গ্রামের মানুষ।

এ ব্যাপারে স্পিডট্রাস্টের প্রকল্প সমন্বয়কারী খালিদ হোসেন মিল্কী জানান,তারা হতদরিদ্র পরিবারের পুর্নবাসন প্রকল্পের আওতায় তাদের সহায়তা দিচ্ছেন। এ গ্রামের ৭৫ টি পরিবারকে তারা আর্থিক সহায়তা করেছেন।

১১০) চরাঞ্চলের নারীরা স্বাস্থ্য সেবা বঞ্চিত

সৈয়দ আমিনুল ইসলাম (পটুয়াখালী) :

পটুয়াখালীর বাউফলের কালাইয়া ও নাজিরপুরের ৬ টি চরে নারীরা গর্ভকালীন সময়ে পুষ্টিকর খাবার ও বিশ্রামের সুযোগ পায়না আর চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত। অন্যদিকে পরিবার ছোট রাখতেও তারা প্রয়োজনীয় উপকরণ পাচ্ছেনা। আবার বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কেও তাদের তেমন ধারণা নেই। চরের বাসিন্দা রানী বেগম জানান, বয়ঃসন্ধিকালে ঋতুস্রাব সম্পর্কে তেমন কোনো ধারনা নেই। কারও সাথে আলোচনা করেন না। তার মাও কোনোদিন এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মী রেহেনা আক্তার বলেন-"কিশোরীরা এ সময়ে ভীতির মধ্যে থাকে, শরীরের যত্নের প্রতি উদাসীন হয়।"

দেখা গেছে প্রায় সবাই বলেছেন তারা গর্ভকালীন সময়ে ধান ভানা, পানি আনা, রান্না করা, মাটি কাটা, জ্বালানী সংগ্রহ এসব কাজ করেন। কেউ কোনোদিন তাদের নিষেধ করেনি এগুলো করতে। নারীরা আরও জানিয়েছেন তারা এ সময়ে প্রচুর পরিশ্রম করলেও কোনো পুষ্টিকর খাবার খাননা। তাদের পরিবারের লোকজন তাদের প্রতি খেয়াল রাখে না। সকিনা জানতে চাইলে ঝরনা (২৬) বলেন-"বউ মানসের আবার খেয়াল রাখবে কেডা, হ্যাগোই খেয়াল রাখতে হয় সবাইর দিকে। হগলের খাওয়ার পর যতটুক থাহে হেই খাবার খাইতে হয়।" এ বিষয়ে রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কুলসুম বেগম বলেন-"গর্ভকালীন সময়ে মায়েরা খায়না দেখেই তাদের ও সন্তানের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। অনেক সময় মারা যায় পর্যন্ত।

এ চরের অযু কবিরাজ জানান চরে একটামাত্র ক্লিনিক আছে যেখানের ডাক্তার বসে একজন। তাও সপ্তাহে একদিন। প্রতিদিন ক্লিনিকে অনেক মানুষ ভীড় করে। তাদের চাহিদার তুলনায় ওষুধও কম দেয়া হয়। তাই এ চরের নারীরা যেকোন সমস্যায় আগে কবিরাজ ও ওঝার আশ্রয় নেন।

চর রায় সাহেবের বেগম রাজিয়া জানান, জন্ম বিরতিকরন পিল কি তা এ চরের মানুষ বোঝেনা। এখানে একজন নারী বহুবার গর্ভধারন করে। মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার জন্য বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। আর যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালনা। যার কারনে রোগী অনেক সময় নিতে নিতে পথেই মারা যায়।

আব্দুল লতিফ মাস্টার বলেন-"চর এলাকায় এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক বা কবিরাজি চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন রোগ যেমন জন্ডিস, হাঁপানি, জ্বর, মেয়েলী রোগে ওঝা ফকিরের শরনাপন্ন হন নারীরা। আর চরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম নেই। পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা এ এলাকায় তেমন আসেননা। যদিও পরিদর্শন কালে স্বাস্থ্যকর্মী রেহানাকে পাওয়া গেছে চরে। কিন্তু অনেকে জানিয়েছেন সে অনেকদিন পরে এসেছে এখানে।

(১১১) পটুয়াখালীর শিশু হকারদের দুরাবস্থা

মুজাহিদুল ইসলাম তুষার (পটুয়াখালী):

"ইচ্ছা আছিল ডাক্তার হমু এহন চা বেইচ্যা মানষের লাত্থিগুতা খাই"– চা বিক্রেতা মামুনের বক্তব্য থেকে শিশু হকারদের দুরাবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। অধিকার শব্দটি তাদের জীবন ধারায় নেই। সুখ কী জিনিস তারা বোঝেনা। এ অবস্থা পটুয়াখালীর প্রায় সব শিশু হকারের। লঞ্চঘাট এবং বাসস্ট্যান্ডের শিশু হকারদের সাথে আলাপ করে এ তথ্য জানা যায়।

প্রতিদিন নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তারা। থাকার সমস্যা, সহকর্মীদের অত্যাচার, ক্রেতাদের দুর্ব্যবহার, দোকানদারদের হুমকী যাতায়াত সমস্যা ইত্যাদি নানা সমস্যা প্রায় সব শিশু হকারের। পটুয়াখালী লঞ্চঘাটে ১২-১৩ জন শিশু হকার আছে, বাসস্ট্যান্ডে আছে ১০-১২ জন।

বেশিরভাগ হকারদের থাকা নিয়ে নানা সমস্যা। এ ব্যাপারে বাদাম বিক্রেতা মামুনুর রশিদ (১১) জানায় সে কখনও টার্মিনালে কখনও ডিসিকোর্টের বারান্দায় আবার কখনও কালিকাপুর একটি বাসায় রাত কাটায়।

সিগারেট বিক্রেতা আকাশ জানায়, বিক্রি শেষে রাতে বাড়ি যেতে ভয় লাগে তাই টার্মিনালের একপাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে থাকে। ফারুক (১৩) জানায়, সে জায়গার অভাবে ডিসি কোর্টের বারান্দায় ঘুমায়।

আলম (১৪) বলে-"যা বিক্রি করি তা থেকে চান্দাবাজরা ভাগ চায়। মাঝে মাঝে কিছু দেই। না দিলে দুই একটা চড়থাপ্পর মেরে ছেড়ে দেয়। আবার দোকানদাররা চায়না আমরা এরকম ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র বেচাকেনা করি। তাতে নাকি তাগো বিক্রি কইমা যায়।"

যারা কেনে তারাও খারাপ ব্যবহার করে তবে সবাইনা। কেউ তুমি করে বলে কেউ বলে তুই করে। তারা জানায় যখন কেউ গালাগাল দিয়ে কিছু চায় তখন দিতে মন চায়না। কিন্তু তারপরও দিতে হয়।

(১১২) লালশাকের রংয়ে লাল ভানুমতির জীবন

হারুন অর রশিদ রিংকু (বরগুনা) :

ভানুমতি সরকার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। দুই সন্তানের জননী। বরগুনার বদরখালী গ্রামের নিতাই চন্দ্রের সাথে বিয়ে হয় ২০ বছর আগে। স্বামী ঝালকাঠীতে পেয়ারা বাগানে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে কাজ করেন। তাদের সংসার চলত টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে খেয়ে না খেয়ে। ৫ বছর আগে মাত্র ১২ শতাংশ জমিতে শুরু করে ভানুমতি সবজি চাষ। ভাদ্রমাসের শেষের দিকে পুরো জমিতে চাষ করেন লাল শাক। প্রথম বছরে ফলানো ছয় মন লালশাক বিক্রি করেন ৪ হাজার ৮০০ টাকায়। তার লাভ থাকে

৪ হাজার টাকা। তার উৎসাহ বেড়ে যায় কয়েকগুন। এরপর মৌসুম বেছে তিনি চাষ করেন শালগম, লাউ, করলা, মূলা ইত্যাদি। এ বছর তার সাশ্রয় হয় ২০ হাজার টাকা। এরপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। স্বামী স্ত্রীতে মিলে তুলেছেন দোতালা টিনের ঘর, ছেলে কমল অষ্টম শ্রেনীতে পড়ে আর মেয়ে তুলসি সবেমাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। সবজি ক্ষেতে কর্মরত ভানুমতি মুচকি হেসে বলেন- "প্রথম দিকে কাজ করতে অস্বস্তি লাগত, রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়া মানুষ নানা উক্তি করত। এসব কানে লাগাইনি কখনও। ভাবতাম আমার পেটে ভাত তো কেউ দিচ্ছেনা।"

ভানুমতিকে দেখে সবজি চাষে উৎসাহী হয়ে উপার্জন করছে আল্লাদী, আরতি, রিতা, নুপুর বেগম, সুমিত্রা সহ অনেকেই। আল্লাদী বলেন -"ভানুমতি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, এখন আর পান খেয়ে সময় কাটাতে হয়না।" রিতা রানী বলেন- "আমাদের গ্রাম থেকে অনেক সবজি যায় বরগুনা বাজারে। কিন্তু রাস্তা ভালনা। রাস্তাটি পাকা করে দিলে খুব উপকার হত।"
বরগুনা এগ্রোসার্ভিস সেন্টারের উপপরিচালক ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র শীল বলেন-"বদরখালী গ্রামের কৃষানীদের তৎপরতা ও সাফল্য দেখে ইতমধ্যে গ্রামটিকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। দেশের প্রতি মৌজায় যদি এরকম একটি গ্রাম থাকত তবে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যেত।"

(১১৩) উটের জকি হিসেবে দুবাইয়ে বেলালের সাত বছর
মুশফিক আরিফ (বরগুনা) :
বয়স বাড়লেও শারীরীকভাবে বৃদ্ধি পায়নি ১৪ বছরের শিশু বেলাল। দেখলে মনে হয় বয়স মাত্র সাত। দুবাইয়ের আঞ্চলিক ভাষায় সে কথা বলে। বাংলা বলতে না পারলেও ইংগিতে বোঝাতে চেয়েছিলো তার বুক ফাটা আর্তনাদের কথা। এখনও তার চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট কিন্তু মুখে অমলিন হাসি। দীর্ঘ সাত বছর দুঃসহ জীবন কাটিয়ে সে ফিরে এসেছে মায়ের কোলে।

বেলালের বাড়ি বরগুনার আমতলীর তাড়িকাটা গ্রামে। দুঃসম্পর্কের ফুপাতভাই মনির ঢাকা থাকে। ১৯৯৮ সালে মনির তার বাবার সাথে ঢাকায় বেড়াতে যায়। বেশ আনন্দেই কাটছিলো বেলালের সময়। মনির বেলালকে গোপনে দুবাই যাবার প্রস্তাব দেয়। ছোট্ট বেলাল আনন্দে উল্লাসিত হয়ে রাজি হয়ে যায় মনিরের প্রস্তাবে। সুযোগ হাতছাড়া হবে ভেবে বাবাকেও বলেনি একথা। মনির তার সাজানো স্ত্রী নাসিমা বেগম আরও তিনটি শিশু নিয়ে যাত্রা করল দুবাইয়ের পথে। তারা ছিলো ওদের সাজানো বাবা-মা। এদিকে বেলালকে না পেয়ে হন্যে হয়ে খোঁজে তার বাবা। মনিরের আসল স্ত্রী রঞ্জু (২৭) বেলালের বাবাকে বলে তার ছেলেকে হয়ত নিয়ে গেছে কোনো ছেলেধরা। সে ধামাচাপা দিয়ে বেলালের বাবাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। সব শুনে বেলালের মার শুরু হয় আহাজারি।
দুবাইয়ে উটের জকি হিসেবে নতুন জীবন শুরু হয় বেলালের। শারীরীক ও মানসিক কষ্ট তার সহ্যের বাইরে চলে যায়। আদর ভালোবাসাহীন জীবন শুরু হয় তার। সপ্তাহে ৬ দিন উটের জকি হিসেবে কাজ আর শুক্রবার ভিক্ষা করানো হত তাদের দিয়ে। অক্লান্ত পরিশ্রম আর অত্যাচারে রুগ্ন হয়ে পরে সে। শারীরীকভাবে কাজে অক্ষম হয়ে পড়লে ৭ বছর পর ২০05 সালের ৮ জুন তাকে ফেরত পাঠানো হয় দেশে। পাচারকারী মনিরই তাকে দেশে নিয়ে আসে আর স্ত্রী রঞ্জুকে দিয়ে বেলালের বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। পুত্র হারানোর শোকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিখোঁজ বেলালের বাবা। বেলাল দু ভাইবোন ও মাকে পেয়ে দুবাইয়ে দুর্বিসহ জীবনের কথা ভুলতে বসেছে প্রায়। এখনও লোকজন তাকে দেখার জন্য বাড়িতে ভীড় করে। বেলালের মা বাদী হয়ে বরগুনা থানায় নারী ও শিশু দমন আদালতে

শিশু পাচার আইনে একটি মামলা করে। কিন্ত এখনও পর্যন্ত কোনো বিচার পায়নি রঞ্জু। কেউ কি ফিরিয়ে দিতে পারবে তার হারানো সাতটি বছর?

(১১৪) সুন্দরবনেও শিশু শ্রম

চার ঘন্টা সাগরে ভেসে রক্ষা পেল দুটি শিশু।

হারুন-অর রশিদ রিংকু (বরগুনা) :

অমানবিক পরিত্রম আর শারীরীক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সাগরে ঝাঁপ দেয় দুটি শিশু। প্রায় চার ঘন্টা প্লাস্টিকের কন্টেইনারে ধরে সাগরে ভাসে তারা। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় কোস্টগার্ড সদস্যরা তাকে উদ্ধার করেন। এ দুঃসাহসিক যাত্রায় তাদের মৃর্ত হতে পারত ভুলে গিয়েছিলো তারা।

বরগুনার বানারিপাড়ার দরিদ্র পরিবারের দুই শিশু শহিদুল (১১) ও মনির (১৩)। কাজ দেয়ার কথা বলে তাদের এলাকার নারিকেল ব্যবসায়ী সুন্দরবনের নারিকেল বাড়িয়া এলাকায় নিয়ে যায় এ বছরের শুরুর দিকে। তাদেরকে বাধ্য করা হয় অমানবিক শ্রমে। মাছ ধরা, নৌকা চালানো, রান্না করা, কাঠ কাটা আরও অনেক কাজ করতে হয়েছে। আর সব কাজ ঠিকমত না করতে পারলেই তাদের কপালে জুটত অমানসিক শারীরীতক নির্যাতন। এ নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে তারা ১৯ জুলাই সকালে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বেলা ১২ টার দিকে তারা প্লাস্টিকের কন্টেইনার নিয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পরে। ক্ষুধার্ত দুই শিশু প্রায় চার ঘন্টা সাগরে ভেসে ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে। এ সময়ে সুন্দর বনের নারিকেল বাড়িয়া এলাকার মেহের আলী নদী ধেকে তাদের উদ্ধার করে কোস্টগাড সদস্যরা মংলা থানায় সোপর্দ করে। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের বাড়ি পাঠানো হয়। মনির ও শহিদুল জানায় কাজ করতে না চাইলে তাকে জাহাঙ্গীর ও তার লোকজন মারধর করত। খাবার দেয়াা হত মেপে। বাড়ি যাওয়ার কথা বলে আটকে রেখে প্রচন্ড মারধর করা হত। সাতমাস ধরে তারা এ নির্যাতন সহ্য করেছে।
কোস্টগার্ডের পশ্চিমাঞ্চলীয় কমান্ডার (অপারেশন) কাজী নজরুল ইসলাম জানান, উদ্ধারকৃত দুই শিশু জানিয়েছে ঐ এলাকায় তাদের মত আরও অনেক শিশু বন্দী রয়েছে। তাদের দিয়ে ভাড়ি কাজকর্ম করানো হয়। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

(১১৫) স্বামীর উপর অধিকার চায় বুড়ির চরের হালিমা

আবু জাফর মোঃ সালেহ (বরগুনা) :

স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে যাযাবরের মত দিন কাটাচ্ছে বরগুনার বুড়ির চরের হালিমা বেগম (৩৮)।

২০ বছর আগে তার বিয়ে হয় ঐ গ্রামের আজাহার মৃধার সাথে। তিনটি সন্তানের জন্মও হয়। আর কেনো সন্তান নেবেনা বলে তার স্বামী অপারেশন এর মাধ্যমে সন্তান নেয়া বন্ধ করান। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আজাহার পরপর তিনটি বিয়ে করে। ২য় বিয়ে করার পর থেকেই সে হালিমার সাথে খারাপ আচরন শুরু করে। হালিমার উপর চালায় অমানবিক নির্যাতন। এ সময়ে সে অন্যের সহযোগিতায় ছেলেমেয়েদের বড় করে তোলে। সন্তানরা বড় হয়ে পিতার অধিকার দাবী করতে গেলে অন্য স্ত্রীদের ঘরে একাধীক সন্তান থাকায় তরা তা পায়নি। আজাহার দুই স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করছে। হালিমা একাধীকবার সেখানে গেলেও সে প্রত্যাখান করেছে। হালিমা এখন এলাকাবাসীর কাছে তার উপর এ অন্যায়ের বিচার প্রার্থনা করছেন।

(১১৬) রুমানার মুখে হাসি নেই

মোসা ফারজানা মুন্নী (বরগুনা) :

ছোট রুমানার অনেক দায়িত্ব। হেসে খেলে দিন কাটানোর কথা থাকলেও তেমনটি তার ভাগ্যে খুবই কম ঘটে। তৃতীয় শ্রেনীতে পড়ে সে। তার মা তাকে খাইয়ে দেবে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে। ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু এত সব ভাবার মত সময় যে তার মায়ের নেই। খুব ভোরে উঠে তাকে চলে যেতে হয় কাজে আর আসে সন্ধ্যা হলে। তাইতো একজন শিশুর কাধেঁ চেপেছে আরেকজন শিশুকে দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব। রুমানার মা হালিমা বেগম তিনটি বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করে। সূর্যদয় থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত চলে তার কাজের পালা। বাবা চুন্নু মিয়া দিনমজুর। ওরা দুই বোন তিন ভাই, রুমানাই বড়। সন্তানদের নিয়ে হালিমা বেগম বরগুনার বেতাগীর ৬নং ওয়ার্ডে থাকেন। তাই তার ছোট একটি ভাই কালাম ও বোন সুমনাকে সামলাতে হয়। ছোটভাই রাজনের বয়স মাত্র দুই। তাকে খাওয়ানো, গোসল করানো, ঘুম পাড়ানো সব কাজ তাকেই করতে হয়। রুমানা স্কুলে যেতে বেশ আগ্রহী। কিন্তু অভাবের তাড়নায় যেতে পারেনা। বন্ধুদের সাথে ইচ্ছেমত খেলতে পারেনা। রুমানার কথায়-"আমার খুব স্কুলে যাইতে ইচ্ছা করে তহন আমার রাজনেরে রাহা লাগে। সবাইর লগে খেলতে পারিনা। হেই লাইগা স্কুলের সময়ডায় খুব খারাপ লাগে।"

বিকেলে মাঠে গিয়েও খেলার সুযোগ পায়না রুমানা। ভাইকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে হয়। তার মা কখনও অসুস্থ হলে তাকে যেতে হয় মায়ের কাজগুলো করতে।

রুমানার মা বলেন- "আমরা গরীব মানুষ, আগে তো খাইয়া লইয়া বাঁচতে হইবে। হের পর অন্যচিন্তা। কাম কইরা যা পাই হেইদয়া জীবন চলে। মানুষের বাসা দিয়া জামাকাপড় আনি।" তিনি জানান, অভাবের কারনে মেয়ে রুমানাকে পড়াতে পারছেন না। ছোট বাচ্চা নিয়ে কেউ কাজে রাখতে চায়না। তাই ছেলেকে বাসায় রেখে যেতে হয়। সাথে নিয়ে গেলে অনেক বকাঝকা শুনতে হয় তাকে। আর তাই রুমানার আর কিছু করা হয়ে ওঠেনা। না লেখা পড়া না খেলাধূলা। এ বয়সেই সে বন্দী হয়ে গেছে সংসারের জালে।

১১৭) স্ত্রীর মর্যাদা চায় ছোনবুনিয়ার জরিনা।

তালুকদার মোঃ মাসউদ (বরগুনা) :

স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে যাযাবরের মত দিন কাটাচ্ছে বরগুনার ছোনবুনিয়া গ্রামের জরিনা খাতুন (৫০)।

৩৫ বছর আগে একই গ্রামের মোঃ চান্দু মৃধার সাথে জরিনার বিয়ে হয়। তিনটি সন্তানের জন্মও হয় তাদের। চান্দু মৃধা আর কোনো সন্তান নেবেন না এবং আর কোনো বিয়ে করবেন না এই বলে জরিনাকে অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ী ভাবে সন্তান হওয়া বন্ধ করান। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই চান্দু মৃধা পরপর চারটি বিয়ে করেন। ২য় বিয়ে করার পর থেকেই জরিনার সাথে শুরু হয় বৈষম্যমূলক আচরন। তাকে শারীরীক ও মানসিকভাবেও নির্যাতন করতে থাকে। সেই সময় থেকে জরিনা অন্যের সহযোগিতা নিয়ে সন্তানদের বড় করে তুলে। সন্তানরা বড় হয়ে পিতার অধিকার দাবী করতে গেলে চান্দু মৃধার অন্য স্ত্রীদের ঘরে এশ একাধীক সন্তান থাকায় তারা সে অধিকার পায়নি। চান্দু মৃধা এখন তিন স্ত্রী নিয়ে মুন্সি গঞ্জে বাস করছেন। সেখানে জরিনা একাধীক বার স্ত্রীর মর্যাদা দাবী করতে গেলেও স্বামী তা প্রত্যাখান করে। জরিনা কোনো উপায় না পেয়ে সাংবাদিক এলাকাবাসী চেয়ারম্যান ও এলাকার গন্যমান্য লোকের দ্বারস্থ হয়েছেন। তার কথায়-"আমার স্বামীর দরকার নাই। কিন্তু আমার ছেলেমেয়ের বাপের পরিচয়ের

দরকার আছে। আর কিছু না হোক আপনারা এই ব্যবস্থা করেন যাতে সে আমার সন্তানদেও সন্তান কইয়া স্বীকৃতি দেয়।”

১১৮) চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত আশার চরের নারী শিশু

সামিয়া নাসরিন সাম্মী (বরগুনা) :

বরগুনার আশার চরের নারী ও শিশুরা সঠিক স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেনা। আশার চর এলাকায় কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে স্থানীয় জনগন মনে করছেন। কেবলমাত্র একটি আধুনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে মনে করছেন। সরেজমিন পরিদর্শনকালে স্থানীয় বাসিন্দারা এসব তথ্য জানান।

বরগুনার আমতলী উপজেলার আশার চর দিনকে দিন জনবহুল এলাকায় পরিনত হচ্ছে। এখানে মোট জনসংখ্যা কত তার হিসেব নেই স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের কাছে। বরগুনার সিভিল সার্জন হারুন অর রশিদের মতে আশার চরের বাসিন্দাদের জন্য আলাদা চিকিৎসা সেবার সুযোগ নেই। কমিউনিটি ক্লিনিক না থাকার কারনেই এলাকার মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেনা বলে তিনি মনে করেন।

প্রায় দুই কিলোমিটার বিস্তৃত আশার চরে নেই কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র। স্বাস্থ্য বিভাগের ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারীদের টার্গেট জনগোষ্ঠীর বাইরে আশারচরের বাসিন্দারা। যার কারনে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা থেকে তারা বঞ্চিত। এ চরের অধিবাসীদের মধ্যে ৪০% নারী ও শিশু ২৫%। যাদের প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগটুকু নেই।

এ চরের পোনা মাছ আর শুটকী ব্যবসায়ীরা ব্যস্ত টাকা রোজগারে। কয়েকজন মহাজনের গদিঘরে গিয়ে জানা গেল তারা প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ডেটল, ব্যান্ডেজ এমনকি তুলা পর্যন্ত তাদের কাছে নেই। কেন নেই এর কোনো উত্তর তারা দিতে পারেননি।

স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যতম প্রকল্প স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী নিয়ে ৪০ বছরে কেউ আসেনি এখানে জানালেন ইউপি সদস্য কবির আকন। আশার চরে ডায়রিয়া, আমাশয়, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হচ্ছে অনেক শিশু। নৌপথে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র একমাত্র ভরসা। তবে ইউনিসেফের সহায়তায় স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালিত জাতীয় টিকা দিবস ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল কর্মসূচি নিয়ে আশার চর সহ প্রতিটি চরে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। জানালেন ইউনিসেফের প্রতিনিধি ডাঃ সোহেল রানা।

ইউনিসেফ বরিশাল বিভাগীয় প্রধান তরিকুল আলম জানান, খুবই লজ্জার কথা যে ৪০ বছরেও স্বাস্থ্যসেবা পায়নি এমন এলাকার কথা এ সময়ে এসে আমাদেও শুনতে হচ্ছে। তিনি জানান সরকারি ভাবে বরাদ্দ সীমিত হলেও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহ চরাঞ্চলে চিকিৎসাসেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে।

১১৯) আশার চরের নারী ও শিশুরা সহাজনের হাতে জিম্মি।/ ছয়মাসে ছুটি সাত দিন।

ছামিয়া নাছরিন সাম্মী (বরগুনা) :

আশার চরের নারী ও শিশুদের জীবনে আশার আলো নেই যেন। এখানে কাজই সব। বেচেঁ থাকার সামান্য নিশ্চয়তা নেই এখানে অনেক ক্ষেত্রে। মহাজনদের দাদনের ফাঁদে জড়িয়ে ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তারা। আশার চরে সরেজমিন পরিদর্শনে ও সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বরগুনার আমতলী উপজেলার সখিনা গ্রামে আশার চরের অবস্থান। জানা যায় এখানে প্রথম মানুষের বসবাস শুরু হয় ৫০ বছর আগে। তখন মানুষ ছোট ছোট নৌকায় মাছ ধরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত এবং বাকী মাছ শুটকী করত। মাছের পরিমার যেমন কম ছিলো তেমন বাজারে দরও কম ছিলো। সময়ের সাথে সাথে সেখানে মানুষ বাড়তে থাকে। প্রতি বছর কয়েক হাজার শ্রমিক তাদের জীবীকার সন্ধানে আসে এখানে। যারা আসে তার প্রায় সবাই দরিদ্র। মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে তারা মাছ ধরে শুটকী করে।
আশার চরে স্থায়ী বসতী মাত্র ৫০ থেকে ৬০ টি পরিবারের। এ পরিবারের প্রায় তিন হাজার শিশু শ্রমিক এ চরে আসে। এর মধ্যে এক হাজারের মত নারী ও শিশু। এদের বয়স পাঁচ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। দু'ধরনের শ্রমিক এখানে। একদল সরাসরি জেলেদের সঙ্গে আসে এবং তাদের মাছ ধরতে সাহায্য করে আর অন্য দল শুটকী শ্রমিক। জেলেদের সাথে যারা মাছ ধরে তারা জেলেদের কাছ থেকে নিয়োগ নিয়ে ট্রলারে ওঠে। এদের মজুরী ছয় মাসে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা। নারীরা মাছ ধরতে যায়না তবে শিশুরা যায়। মাছ বাছা, মাছ জাল থেকে খোলা, মাথা কাটা রোদে শুকানোর কাজে অংশ নেয় নারী ও শিশু। এদের নিয়োগ দেয় মহাজন ও জেলেরা।
এখানে কাজের সময় সকাল ছয়টা থেকে রাত ১২ টা। ছুটি কম তবে ছয় মাসে সাত দিন ছুটি দেয়া হয়। কিন্তু কাজের চাপে অনেকেই সে ছুটি ভোগ করতে পারেনা। নিয়োগের সময় চুক্তি থাকে জরুরী প্রয়োজনে এমনকি অসুস্থ হলেও কেউ ছুটি পাবেনা। নারী শ্রমিকরা মৌসুমে মাত্র চার হাজার টাকা সর্বোচ্চ পায়। এ পারিশ্রমিক পুরুষ শ্রমিকের প্রায় অর্ধেক। আর শুটকী তৈরিতে নারীদেরকে বেশি শ্রম দিতে হয় বেশি। কিন্তু মহাজনরা ভাবে নারীরা তেমন কাজ পারেনা।
এরা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ না পায় তারা নিয়োজিত হয় প্রতি দিনের বা মাছের কেজি হিসেবে। শুটকী শ্রমিকরা মাছ বাছাই করে ধোয়া, মাথা কাটা, চিংড়ির মাথা খোলা, মাছ শুকানো ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এদের পারিশ্রমিক কেজি প্রতি মাত্র দেড় টাকা। কোনো কোনো নারী আছে যারা কেবলমাত্র খাবারের বিনিময়ে কাজ করে। শিশুদের মজুরীও ম। তারা চিংড়ির মাা খুলতে গিয়ে প্রায়ই হাত কেটে ফেলে। কিন্তু কিছু করার থাকেনা। তাদেও কষ্ট অমানবিক কিন্তু পারিশ্যমিক অনেক কম।
এখানে পুরূষ শ্রমিকদেও অনেকেই পরিবার ছাড়া বাস কওে। নারীরা অনেক সময় মহাজন ও প্রভাবশালী পুরুষ শ্রমিকদেও ভোগের শিকার হয়। কেউ কেউ বিয়ের কথা বলে প্রতারনা কওে। বিয়ে কওে মৌসুম শেষ হলে স্ত্রীকে ওেখে চলে যায়। ৭০/৮০ বছর আগে যে চর জেগেছিল সম্ভাবনার সূচনা কওে। সে সম্ভাবনা শুধূ মহাজনদের সুখের দরজা খুলে দিয়েছে। নারী ও শিশুদের ভাগ্যেও পরিবর্তন করতে পারেনি।

১২০) কষ্টে আছে সুরাতী বিবি

মোসাঃ ফারজানা মুন্নী (বরগুনা) :

বয়স হইয়া গেছে এহন অধর ভিক্ষা করতে পারিনা। কির পাননে আল্লায় অধমাগো পাডাইছে দুনিয়ায়। জীবনে কোনো দিন সুহের মুখ দেহিনাই। আর এহন ঠিকমত খয়রাত করতেও পারিনা– কথঅগুলেঅ বলেন, পঞ্চাষোর্দ্ধ সুরাতি বিবি। বাড়ি তার বরগুনার বেতাগী থানার কেওয়াবুনিয়া গ্রামে।
একটা সময় ছিলো যখন সুরাতি বিবির দুচোখে স্বপ্ন ছিলো। বাবা মায়ের সঙসাওে সে ছিলেঅ একমাত্র মেয়ে। দরিদ্র পরিবাওে একমাত্র মেয়ে হলেই বা কি। সুখ পাখি সুখ পাখি কোনো দিন ধরা না দিয়েই পালিয়েছে। সুরাতীর অনেক আশা ছিলেঅ বড় ঘওে বিয়ে হবে।, স্বামীর সংসার হবে। বড় ঘওে বিয়ে হয়েছিলো ঠিকই, ভাগ্যেও নির্মমতায় সে সুখ অধর সইলনা। রাক্ষুসী বিশখালী নদী কেড়ে নিয়েছে তার সব। স্বামীর অনেক জমি ছিলেঅ তা সবই গ্রাস কওেছে। এরপর অন্যেও বাড়িতে অধশ্যয় নেয়অ।

তারপওে বাড়ি বাড়ি গৃহপরিচারিকার কাজ। এভাবে সুরাতী একপয়সা দুপয়সা জমিয়ে দুই করা জমি কিনে। সেখানে ঘর তুলেছে অনেকদিন হলো , প্রায় ১১ বছর। কিন্তু কি হবে তাতে ঘরটুকু ছাড়া অধর কিছু নেই তার। তার উপওে বন্যা ছোবল হেনেছে সে ঘরখানাতেও।
একজীবনে এত দুঃখকষ্টের পর ৮/৯ বছর যাবত ভিক্ষে কওে সংসার চালায় সে। কিন্তু পাশাপাশি গ্রামে তাকে যারা চেনে তারা ভিক্ষা দিতে চায়না এখন অধর। সুরাতী তিন সন্তানের জননী। এক ছেলে বালির কাজ কওে যা অধয় কওে তাতে সে ার সংসাওে চালঅতেই হিমসিম খায়। সুরাকি দেখার সময় কই তার? তার স্বামী হাফেজ হাওলাদার মারা গেছেন অনেক আগে। তার চিকিৎসা করাতে পারেননি টাকার অভাবে। এ নিয়ে সুরাতী বিবির অনেক কষ্ট। তার বাব বারই মনে হয় যদি সুচিকিৎসা করানো যেত তবে বাঁচানো যেত তার স্বামীকে।
এখন সুরাতীর চোখে আর কোনো স্বপ্ন ঘোরাফেরা করেনা। দু চোখে কেবল একটা আকাংখার ছায়া। সে আকাংখা মৃত্যুর জন্য।

১২১) লাউয়ের ডগা ঘুরিয়ে দিয়েছে মরিয়মের জীবনের মোড়

বীরেন্দ্র কিশোর (বরগুনা) :

সবজি চাষ কওে অভাব নামের দৈত্যটাকে তাড়াতে পেরেছি। কচি লাউয়ের ডগার মত এখন আমার জীবন। বাব্বাটাকে মানুষ করাই এখন আমার একমাত্র কাজ্‌ কথাগুলো বলেন- বরগুনা সদরের লতা বাড়িয়া গ্রামের মরিয়ম।
মরিয়মের বাড়ি ছিলো অধয়লা পাতাকাটা গ্রামে। তার বাবা মোঃ সালঅম। চতুর্থ শ্রেনীর বেশি অঅগায়নি তার পড়াশোনা। এরপর অভাবের কারনে ান্যেও বাড়িতে কাজ কে রোজগাওে নামতে হয়েছে তাকে। চার ভাই বোনের মধ্যে সে তৃতীয়। সময়ের ব্যবধানে লতাবাড়িয় গ্রামের আক্কাছ আলীর সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামী তা রিক্সা চালক কিন্তু অভাব তার পিছু ছাড়েনি বিয়ের পরেও। কিছুদিও পর কোলজুড়ে অঅসে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান। একদিকে নিজেদেওই অভাব অনটন অন্যদিকে নতুন অতিথি। দিশেহারা হয়ে পড়েন মরিয়ম। তখন তার মনে হয় কিছু একটা করা দরকার।
২০০২ সালে ঢাকা অধহছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় পরিচালিত মেঘনা গনকেন্দ্রে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন তিনি।
নিয়মিত লেখাপড়ার চর্চা করেন ওষানে। এরপর এ গনকেন্দ্রেও মাধ্যমে কৃষি সমম্প্রসারন অধিদপ্তর পরিচালিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মবজি উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন।
মরিয়মের স্বামী ক্কাস অধলী পৈত্রিক সূত্রে মেঘনা গণকেন্দ্রেও পাশে ৪০ শতাংষের একখন্ড জমির মালিক। মরিয়ম দেখল এ জমিটা অধশপাশের জমির চেয়ে উচু বলে এখানে ধান জন্মায় না। এরপর স্বামী স্ত্রীতে মিলে মাটি কেটে তিনটি বেট তৈরি করল। প্রথমে হাইব্রিড লাউয়ের চাষ করল এবং মাঝখানে পানি কচুর চারা রোপন করল। প্রথম বছর এত তার তিন হাজার টাকা খরচ হয়। আর খরচ বাদ দিয়ে বিক্রি কওে লাভ হয় নয় হাজার টাকা।
দ্বিতীয় বছর লঅউ পুঁইশাক, ঢেড়শ ও পানি কচুর চাষ কওে। এত নিজেদেও চাহিদা পূরন কওে লঅভ থাকে তার বিশ হাজার টাকা।
এরপর সবজি চাষের লাভ ও স্বামীর আয় দিয়ে দোতলা টিনের ঘর ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরি কওে মরিয়ম। এরপর আর তাকে পেছনে ািফওে তাকাতে হয়নি। এ বছর সে তার জমিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা কওেছেন। উ জমিতে এরপর তিনি মুগীর ফার্ম করবেন আর গরু মোটাতাজ করনের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এরফলে সে সবজি ক্ষেতে জৈব সার ব্যবহার করতে পারবেন।

এরিয়মের সাফল্য দেখে গ্রামের অনেক মহিলা সবজি চাষে এগিয়ে এসেছেন ।বরগুনা এ্যাগ্রো সার্ভিসের উপপরিচালক ইন্দ্রজিৎ কুমার শীল বলেন, আমি মরিয়মের সবজি বাগান পরিদর্শন করেছি । একজন নারী কর্মদক্ষতায় এত সার্থক তা মরিয়মকে না দেখলে বোঝা যায়না । বাংলঅদেশের প্রতিটি ঘওে একজন কওে মরিয়মের খুব বেশি প্রয়োজন ।

১২২) আরডিপি - ১৬ প্রকল্প

নারী শ্রমিকদের ভাগ্য উন্নয়নের নতুন পথ

মুশফিক আরিফ (বরগুনা) :

এলজিইডি ডানিডার আরডিপি-১৬ প্রকল্প বরগুনার শ্রমজীবী নারীদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে । সফলতা এনে দিয়েছে তাদের কর্মময় জীবনে । ফলে দিনে দিনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন এ অঞ্চলের নারী শ্রমিকরা । দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন তারা । ঘরের কোনে বসে না থেকে নারীরা এখন হাতে তুলে নিয়েছেন ঝুঁড়ি ও কোদাল এবং শক্ত হাতে নির্মাণ করছেন গ্রামীণ জনপথ । এছাড়াও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে তাদের রয়েছে সমান অংশগ্রহণ । জানা গেছে, আরডিপি-১৬ প্রকল্পের আওতায় নারীরা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়ে সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছেন । কাজের চুক্তি থাকায় সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে । নারীরা সরকারি শ্রমনীতির আলোকে সঠিক প্রশিক্ষণ পেয়ে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করছেন । এই প্রকল্পটি গ্রামীণ অসহায় শ্রমজীবী নারীদের মনে জাগিয়েছে আশার আলো ও বেঁচে থাকার স্বপ্ন আরডিপি-১৬ পরিচিতি : ড্যানিডার চলমান বিভিন্ন কাজের মধ্যে আরডিপি-১৬ একটি প্রকল্প । আরডিপি-১৬ এলজিইডির সঙ্গে কো-পার্টনার হিসেবে কাজ করছে । এ প্রকল্পটি বরগুনা, পটুয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় কাজ করছে । ১৯৯৯ সালে বরগুনায় এর কাজ শুরু হয় । কর্মপদ্ধতি : আরডিপি-১৬ প্রকল্পের কাজগুলো দুই পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয় । প্রথমত, গ্রুপ ভিত্তিক মহিলাদের সঙ্গে এলসিএস চুক্তির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, টেন্ডারের মাধ্যমে । বরগুনায় চুক্তির মাধ্যমে নারী শ্রমিকরা প্রতিদিন খাল কাটার কাজ করছেন । চুক্তি অনুযায়ী ৬০ হাজার মাটি ২ লাখ ৩০ হাজার টাকায় চুক্তি নিয়ে ৩ মাস মেয়াদে কাজ সম্পন্ন করতে হয় । প্রতি গ্রুপে ২৪ জন করে নারী শ্রমিক থাকেন । এদের মধ্যে সভাপতি ও সেক্রেটারী থাকেন । সভাপতি-সেক্রেটারী দলনেতা হিসেবে কাজের সবকিছু তদারকি করেন ।

মজুরি : চুক্তি সম্পাদনের পর মজুরির টাকা সভাপতি ও সেক্রেটারীর যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের মাঝে বিবরণ করা হয় । এতে একজন শ্রমিক প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ টাকা মজুরি পান ।

লাল বাহিনী : বরগুনার এসব নারী শ্রমিক লাল পোষাকে সজ্জিত হয়ে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন । লাল পোশাকে সজ্জিত বলে কেউ কেউ তাদের ‘লাল বাহিনী’ নাম দিয়েছেন । তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে খাল কাটা, ইট ভাঙ্গা ও রাস্তার কাজ ।

কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা : গ্রামীণ নারী শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীনও হচ্ছেন । এর মধ্যেও তারা সবকিছু উপেক্ষা করে দু’বেলা দু’মুঠো আহারের জোগানে কাজ করে যাচ্ছেন । সাহসিকতার সাথে মাথায় ঝুড়ি আর হাতে কোদাল, বেলচা নিয়ে প্রকাশ্যে নারীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন । তবে পুরুষশাসিত সমাজে কেউ কেউ তা গ্রহণ করতে রাজি নন । ডানিডা নারীদের বেপরোয়া করে তুলেছে । আবার কেউ দিচ্ছেন ধর্মীয় ফতোয়া ।

মাঠ পরিদর্শনে দেখা গেছে, এই প্রকল্পের বেশিরভাগ নারী শ্রমিকই স্বামী পরিত্যাক্তা। তাদের আয়ের পথ দেখিয়েছে এই আরডিপি-১৬। বরগুনার বিভিন্ন উপজেলা সদরসহ সবমিলিয়ে সহস্রাধিক নারী শ্রমিক দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। দেখা গেছে, রাতের বেলা কুপি বাতি জ্বালিয়ে নারীরা খাল কাটার কাজ করছেন। জেলার বিভিন্ন উপজেলার মধ্যে আমতলীতে ৭৫ জন, বেতাগীতে ৫০০ জন, তালতলীতে ৫০ জন, পাথরঘাটায় ৩৫০ জন নারী শ্রমিক কাজ করছেন। গুলবুনিয়া খাল অর্থাৎ ভাড়ানী খাল কাটায় কর্মরত কিছু মহিলার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই প্রকল্পে কাজ করে তারা আর্থিকভাবে মোটামুটি স্বচ্ছল হয়ে উঠেছেন। একটি গ্রুপের সভাপতি রাবেয়া বেগম জানায়, আর কিছু না হলেও দু'বেলা দু'মুঠো আহারের জোগান হচ্ছে। এতেই তাদের সুখ। এমনিভাবে এ অঞ্চলের নারীরা জীবনের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। প্রকল্পের ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার ইসরাইল হোসেন জানান, এই প্রকল্প যেমন তৈরী করেছে নারীদের জন্য আয়ের পথ, তেমনি কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধারও সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সকল নারী শ্রমিকের জন্য বয়স্ক শিক্ষা, চিকিৎসা সেবাসহ কাজের জন্য কোদাল, ঝুঁড়ি, হাতুড়ি, ছাতা, বেলচা, কড়াই এবং পোশাকসহ সকল সরঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারী শ্রমিকরা হয়েছেন সচেতন, পেয়েছেন ভাগ্য উন্নয়নের নতুন পথ।

১২৩) পাথরঘাটার হতদরিদ্র জয়নব আশা'র ঋণে ব্যবসা করে আজ স্বাবলম্বী

মুশফিক আরিফ (বরগুনা):

প্রচন্ড অভাব-অনটনের মধ্যে দিন যাপন করতেন বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার জয়নব বিবি। স্বামী শাহ আলমের রোজগারে ৬ সদস্যের পরিবারে একবেলা খাবার জুটলে অন্যবেলা জুটতো না।

এ রকম অবস্থায় ১৯৯৪ সালে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা'র পাথরঘাটা শাখার ঋণ কর্মকর্তা আবুল বাশারের সঙ্গে জয়নবের পরিচয় ঘটে। জয়নব তার অভাব-অনটনের কথা খুলে বললে আবুল বাশার তাকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের আশ্বাস দেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী জয়নব দেরি না করে উপজেলার বড়ইতলা গ্রামের কাকলী ভূমিহীন সমিতির সদস্য হন। পরে তিনি ২ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে স্বামীকে একটি রিক্সা ক্রয় করে দেন। রিকশা চালিয়ে যা উপার্জন হয়, তা দিয়ে সংসারের খরচ চালিয়ে জয়নব বিবি ধীরে ধীরে আশার ঋণ পরিশোধ করেন। পরে দ্বিতীয়বার ৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আরো একটি রিকশা ক্রয় করেন এবং এক পর্যায়ে এ ঋণের টাকাও পরিশোধ করেন। এর পরে জয়নব আরো ৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির সামনে একটি মুদি দোকান খুলে বসেন। পরবর্তী সময়ে আশার ঋণ পরিশোধ করার পরে মুদি দোকানের আয় থেকে জয়নব বাড়ির আঙিনায় একটি ধান ভানার মেশিন স্থাপন করেন। পরে ২০০২ সালে তিনি ছোট আকারে একটি মুরগির ফার্ম করেন। লাভের মুখ দেখে ২০০৪ সালে বড়ো একটি মুরগীর ফার্ম স্থাপন করেন। বর্তমানে ৬০০টি মুরগি ও ৫০০ মুরগির বাচ্চা রয়েছে তার ফার্মে। এভাবে জয়নবের একটির পর একটি আয়ের পথ তৈরী ও ৮-৯ বছরে নিরলস পরিশ্রমে হতদরিদ্র পরিবাটি আজ স্বচ্ছল সুখী। এক সময় তার মাথা গোঁজার ভিটা পর্যন্ত ছিল না। এখন তিনি ভিটাবাড়ি সব করেছেন। মুরগির ফার্মে ২ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে তার। বড়ো ছেলেকে লেখা-পড়া করাচ্ছেন। এক সময়ের হতদরিদ্র জয়নবের জীবনে এখন সুখের ছোঁয়া। নিরলস প্রচেষ্টা এবং আশা'র সহযোগিতাই তার সুখের হাতিয়ার।

এ ব্যাপারে আশা'র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জাহিদুল ইসলাম জানান, পাথরঘাটা উপজেলায় দারিদ্র বিমোচনে আশা'র অনেক ঋণ প্রকল্প চালু রয়েছে। জাল-নৌকা ক্রয়, মাছ ধরার ট্রলার তৈরি, বাঁশ বেতের কাজ, মুড়ি ভাজা, গরু-ছাগল পালন, পোল্ট্রি ফার্ম, নার্সারি ইত্যাদির ওপর ঋণ প্রদান করা হয়। পাথরঘাটা উপজেলায় ৫হাজার ৫৫০টি পরিবার আশা'র সহযোগিতায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে আশা'র জেলা কর্মকর্তা বলেন, আশা'র সদস্যদের জন্য বিনা মূল্যে ওষুধ বিতরণ, চিকিৎসা সেবা, দুর্যোগকালীন সুদবিহীণ ঋণ প্রদান, ঋণ বীমা, জীবন বীমাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

(ছবি আছে)

১২৪) বরগুনায় আশ্রয়হীন শিশুদের দুর্ভোগ চরমে
আমিন সোহেল (বরগুনা) :

বরগুনার দুই শতাধিক পরিবারের ভূমিহীন মানুষ মাথা গোজার ঠাই হারিয়ে মানবেতর জীবন- যাপন করছে। অনাহার অর্ধাহারে কাটছে তাদের দিন। বাঁচার লড়াইয়ে আজ তারা দিশেহারা। প্রতিকূলতার সাথে অবিরাম যুদ্ধ করে চলছে অভাবী মানুষ। ক্ষুধার যন্ত্রনা আর শিশু সন্তানদের বেদনাময় করুন আকুতি পিতা-মাতাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে সর্বস্ব বিক্রি করে, নিঃস্ব হয়ে পরেছে অনেক পরিবার। তাই তাদের শিশু সন্তানের লেখা পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। এমনি একটি পরিবারের সন্তান দ্বীপালী বয়স নয় কি দশ বছর। দ্বীপালী বড়িয়াল পাড়া আজাহার আলী তালুকদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীতে লেখাপড়া করতো। দ্বীপালী স্কুলে না যাওয়ার কারণ হিসাবে জানা গেছে তাদের পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়ায় আর্থিক সংকটে ভূগছে। যাদের পেটে আহার নেই , তারা স্কুলে যাবে কি করে। ছবি রানী জানায়, তার মেয়ে, কাকলি ও দ্বীপালি স্কুলে যেত কিন্তু এখন খাবার অভাব ও অর্থ সংকটের জন্য এবং আশ্রয়হীন হয়ে পড়ায় মালামাল পাহারা দেয়ার জন্য তাদের স্কুলে যেতে দেয়া হচ্ছে না। দ্বীপালীদের মত স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে শারমিন, শিউলি, কাজল, শাহনাজ, রহিম, রনি, সাদ্দাম, ওয়ালিউল্লাহরা।

চলতি বছরের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে বরগুনার বড়িয়াল পাড়া বস্তির ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করা হলে দ্বীপালীর মত প্রায় ৫ শতাধিক শিশু-কিশোর হয়ে পড়ে আশ্রয়হীন। মাথা গোজার ঠাঁই হারানোর পাশাপাশি খাদ্য সংকট ভূমিহীন- আশ্রয়হীন শিশুদের দিশেহারা করে তুলেছে। দু'বেলা দু-মুঠো খাবার অনেকেরই জুটছে না। অনাহার অর্ধাহারে শিশু-সন্তানেরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে। ক্ষুধার যন্ত্রনায় শিশুদের আহাজারী আর্তনাদ মা-বাবকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে যে কটা টাকা আয় হয় তা দিয়ে ঘরে শিশু সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণ চালানো খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পরেছে। সাহেদা জানান, আশ্রয়হীন হয়ে পড়ার পর থেকে কাজে যেতে না পারায় প্রায়ই ৮ বছরের শিশু সন্তান ওয়ালিউল্লাহর মুখে খাবার তুলে দিতে পারেন না। সরেজমিনে দিয়ে দেখা যায়, ক্ষুধার যন্ত্রনায় মায়ের গলা জড়িয়ে ধয়ে একমুঠো খাবারের আবদার করছিল। অসহায় মা তার শিশু সন্তানকে খাবার দিতে না পেরে বকা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। অনাহারী শিশুটি ক্ষুধার যন্ত্রনায় ভুলতে গিয়ে পাশের খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য জগতে চলে যায়। বস্তিবাসী ছিন্নমূলরা সারা জীবন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম

করে একটু একটু করে জমানো টাকা আর ঋণের টাকা নিয়ে ডোবানালা ভরাট করে মাথা গোজার ঠাই তৈরী করেছিল। সেই ঘরখানা ভেঙ্গে দেখায় তারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। রাত কাটাছে খোলা আকাশের নিচে। ঋণের বোঝা পরিশোধ করতে গিয়ে অনেকেরই ঘর বিক্রি করে দিতে হয়েছে। তাদের ছাপড়া দিয়ে মাথা গোজার সামর্থটুকুও নেই। বর্তমানে আশ্রয়হীন ছিন্নমূলরা গনপূর্ত বিভাগের চাষাবাদ যোগ্য নিচু জমিতে বসবাস করছে। সেই জমিটুকুও শহীদ নামের একজন লীজ নিয়েছেন, এক বছরের জন্য। ভূমিহীনদের দুর্ভোগ দেখে শহীদ তাদেরকে আপাতত আশ্রয়ের অনুমতি দিয়েছে। বৃষ্টিতে মাঝে মধ্যেই নিচু জমি পানিতে তলিয়ে যায়। তখন ছিন্নমূলদের সারারাত বসে অথবা দাড়িয়ে কাটাতে হয়। এদিকে মাথা গোজার ঠাই নেই, অন্যদিকে আহার নেই, সীমাহীন দূভোর্গ পোহাচ্ছে ছিন্নমূল মানুষেরা। খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা প্রকট থাকার ধারন করেছে। আর্থিক সংকটে তারা দিশেহারা। বেঁচে থাকার মত অবস্থা তাদের নেই। দুশ্চিতা আর হতাশায় তারা দিন কাটাচ্ছে।

বরগুনা জেলা ছিন্নমূল সমিতির সভাপতি ইউনুস আলী হাওলাদার জানান, যেখানে তারা বসবাস করছিলেন সেই জমি গনপূর্ত বিভাগের আপাতত কোন কাজে লাগছে না। তাদেরকে পূর্নবাসনের ব্যবস্থা না করে এভাবে উচ্ছেদ করা অমানবিক। তিনি উচ্ছেদ হওয়া প্রতিটি পারিবারকে পূর্নবাসনের অনুরোধ জানান, বরগুনা জেলা প্রশাসক মোঃ আলতাফ হোসেন জানান, আশ্রয়হীনদের, পূর্নবাসনের চেষ্টা করা হচ্ছে- ইতোমধ্যেই পোটকাখালী আশ্রয়ণ প্রকল্পে কয়েকটি পরিবারকে ঘর দেওয়া হয়েছে। বাকীদের পর্যায়ক্রমে ঘর দেওয়া হবে।

১২৫) বরগুনা শহরে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে

আমিন সোহেল (বরগুনা) :

বরগুনা পৌর শহরে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অসচ্ছল স্কুলগামী শিশুরা দারিদ্রতার কারনে স্কুলে না গিয়ে জীবিকার সন্ধানে কম মজুরিতেও ঝুকিপূর্ণ নানা ধরণের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। দারিদ্রতা ছাড়াও অশিক্ষা, পারিবারিক বিচ্ছেদ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রকৃতিক দূর্যোগের ফলেও শিশু শ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অভাবের তাড়নায় শিশুরা ঝুঁকিপূর্ন বিভিন্ন প্রকার কঠিন কাজেশ্রম বিক্রি করছে ।৬ থেকে ১২ বছরের শিশুদের পারিবারিক চাহিদা মেটাতে সামাজিক বিভিন্ন কারণে জীবিকা নির্বাহের জন্য এসব শিশু কাজ করছে- মটর গ্যারেজ, টেম্পু চালনা, রাইস মিলের কাজ, স্ব-মিলের কাজ, ইট ভাটায়, মাটি কাটা, ভ্যান চালনো, রিকশা চালানো, হোটেল রোস্তরায় কাজ, রাজমিস্ত্রির যোগালির কাজ, বাসের হেলপার, তরিতরকারি বিক্রি, জেলে ট্রলারে মাছ ধরতে সাগরে যাওয়া, নদীতে পোনা মাছ ধরা ও বিভিন্ন কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কেউ কেউ ভবিষ্যতের মেকানিক হবার আশায় বিনা বেতনেও কাজ করছে। শিশুরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ। এরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মৌলিক অধিকার শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, বিনোদন ও নিরাপত্তা। দরিদ্রতার তাড়নায় বই খাতার পরিবর্তে তাদের হাতে দা, কুড়াল, কোদাল, হাতুড়ি, বেলচা ইত্যাদি তুলে দিচ্ছেন তাদের পিতা-মাতা ও

অভিভাবকরা। অপরদিকে কম পয়সায় বেশী শ্রম পাওয়ার আশায় স্বার্থন্বেষী- মালিকরাও শিশুদের কাজে লাগাচ্ছে। অভিশত্ব পিতা-মাতারা কেউ কেউ শিশুদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিতেও দ্বিধা বোধ করছেন না। এক শ্রেনীর অশিক্ষিত পিতা-মাতা এখনও শিশুদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কাজ-কর্মের দিকে উপস্থিত করছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, কাজ করে খাওয়া ভালো। শিশুরা অবজ্ঞায় ও অবহেলায় সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে কাজ করতে গিয়ে তাপ, ময়লা, অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস, পানীয় জলের অভাব, অত্যাধিক কাজের চাপ ও দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

শিশু শ্রম বন্ধের ব্যাপারে এতদাঞ্চলে কোন প্রতিষ্ঠানই কাজ করছে না। সরকারি ভাবে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও শ্রমে নিরুৎসাহিত করে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করানোর জন্য কোন প্রতিষ্ঠানই এগিয়ে আসছে না। বরগুনার স্থানীয় কয়েকটি এনজিও সংস্থার সাথে আলাপ কালে তারা জানান, অত্র অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যারা শিশুশ্রমের সাথে জড়িত তাদের বেশির ভাগই হত দরিদ্র ও গরিব তাই তাদের এপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সরকারের পৃষ্ঠাপোষকতা জরুরী। বরগুনায় হোটেল রেস্তোরায় এবং কল কারখানায় শিশুশ্রমিক আছে এমন মালিকদের সাথে আলাপ কালে তারা জানান, শিশুদের বাবা-মা অনেক অনুরোধ করে আমাদের এখানে কাজ দিয়েছে। আমরা শিশুদের কাজে নিতে আগ্রহী নই।

১২৬) বরগুনা মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রেও চিকিৎসায় দৈন্যদশা

স্বপন কুমার ঢালী (বরগুনা) :

বরগুনা মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স স্বল্পতা, পর্যাপ্ত শয্যা না থাকা, কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলা ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে চিকিৎসা ব্যহত হচ্ছে। ফলে রোগীদের ভোগান্তি তে পরতে হচ্ছে। কমছে চিকিৎসার মান। জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য হানি ও র্অ অপচয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত জনবল নিয়োগ, সরকারের নীতিমালঅ যথাযথ বাস্তবায়ন, মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরন এবং সেবা আরও বৃদিাধ করা গেলে এ অবস্থার উত্তরণ সম্ভব। সরেজমিন ভুক্তভোগী, স্থানীয় বাসিন্দা, জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদেও সাথে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বরগুনা সদর থেকে দুই কিলোমিটার দূওে অবস্থিত জেলা মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র ২০০১ সালের ৬ জানুয়ারি তৎকালীন স্বাস্থ্যকল্যান মন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম এর উদ্বোধন করেন। ১০ শয্যা বিশিষ্ট এ চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চার জন চিকিৎসক ও দুই জন নার্স থাকার কথা থাকলেও ওয়েছে শুধু একজন চিকিৎসক।

১২৭) মেহেরুন্নেছার স্বপ্নপূরন

সামিয়া নাছরিন সাম্মি (বরগুনা) :

বরগুনার কেওড়াবুনিয়া গ্রামের মেহেরুন্নেছা একদিন স্বপ্ন দেখতেন তিনবেলা খেয়ে ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করবেন। স্বামী সংসার নিয়ে সুখে থাকবেন। সেই স্বপ্ন চোখে নিয়ে এনজিও আশা থেকে ১৩ বছর আগে সামান্য ঋন নিয়ে শুরু করেছিলেন শপিং ব্যাগ তৈরির কাজ। আজ তিনি স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়াও ছেলেদের লেখাপড়া করার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আবী আবদুল্লাহ সেন্টুর স্ত্রী মেহেরুননেছা জানান, একসময় তার বসত বাড়ির ভিটেটুকু ছাড়া আহার জোগারেরর সম্বলটুকু ছিলো না।

না খেয়ে অর্ধাহারে সন্তানদের নিয়ে দিন কাটিয়েছেন। ছেলেরা স্কুলে যেত কিন্তু পয়সার অভাবে পাঠাতে পরেননি। কিন্তু এখন খাবার অঅর পড়ালেখা নিয়ে চিন্তা করতে হয়না। এখন তার নতুন টিনের ঘর উঠেছে। এখন তিনি ১৩ টি পরিবারের নারী পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। নিজেও মাসে লাভ করেছেন ১০ হাজার টাকা।
প্রথমে মাত্র ৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটিমাত্র মেশিন কিনে শুরু করেছিলেন শপিং ব্যাগ তৈরির কাজ। বর্তমানে সাতটি মেশিন দিয়ে বাড়ির আঙিনায় আলাদা ঘর নির্মান করে ব্যাগ তৈরির কাজ করছেন। এখানে বেশিরভাগই নারী শ্রমিক। ব্যাগ তৈরির জন্য ডাকা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সেগুলো পুরুষ শ্যমিকরা প্রস্তুত করে কারখানায়নিয়ে আসেন পরে নারীরা সেই প্রস্তুতকৃত কাঁচামাল দিয়ে বিভিন্ন সাইজের ব্যাগ তৈরি করে থাকেন। পলিথিন বন্ধ হওয়ার পর এই ব্যাগের চাহিদা বাড়ায় জেলার সর্বত্রই এ ব্যাগ সরবরাহ করা হচ্ছে। মেহেরুন্নেছা আরও জানান, তার পরিবার অঅর্থিকভাবে পুরোপুরি স্বচ্ছল। দুই ছেলে কলেজে লেখাপড়া করছে। ছেলেদের লেখাপড়ার খরচও আসছে এ প্রতিষ্ঠান থেকে। মেহেরুন্নেছা বলেন- "অনেক কষ্ট করেছি জীবনে। এখন আমার সুখের দিন। ভাল প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আমার এ প্রতিষ্ঠান আরও অনেক বিস্তৃত হবে।"

১২৮) বরগুনা সদর হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ড নেই।

জাফর হোসেন (বরগুনা):

বেড নেই, নার্স সংকট, ডাক্তার ও ঔষধ সংকট এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে মুখ থুবরে পরেছে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের শিশুদের চিকিৎসা ব্যবস্থা। ফলে প্রতিদিন শত শত অভিভাবক শিশুদের নিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।
বরগুনা জেনারেল হাসপাতালটি সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে ৫০ শয্যার অবকাঠামো নিয়ে নির্মিত হয়। ১৯৯৭ সালে এ হাসপাতালটি ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু ১০০ শয্যার হাসপাতাল হিসেবে অবকাঠামোগত কোনো উন্নয়ন করা হয়নি এখন পর্যন্ত। অল্প জায়গার মধ্যে রোগীদের চাপাচাপি করে চিকিৎসা সেবা নিতে হয়। হাসপাতালটিতে নারী ও পুরুষের জন্য দুটি আলাদা ওয়ার্ড থাকলেও এখানে শিশুদের জন্য কোনো ওয়ার্ড নেই। ফলে শিশুদের চিকিৎসাসেবা হয়ে পড়েছে ঝুকিঁপূর্ন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জরুরী প্রয়োজনে মহিলা ওয়ার্ডের মধ্যে শিশুদের জন্য তিনটি বেড করে দিলেও এখানে কোনো শিশুদের চিকিৎসা সেবা নিতে দেখা যায়নি। অন্যান্য রোগীরা বেড তিনটি ব্যবহার করছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন শিশু রোগী চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতির অভাবে শিশুদের চিকিৎসাসেবা মারাত্মক ব্যহত হচ্ছে।
হাসপাতালটিতে নয়জন ডাক্তারের পদ থাকলেও রয়েছেন একজন। একজনের পক্ষে এত রোগীর চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব নয়বলে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আলমগীর হোসেন জানান।
এ বিষয়ে কথা হয় বরগুনা উপজেলার রোডপাড়া গ্রামের রিক্সাচালক ইউসুফ আলীর সাথে। তিনি জানান, তার একমাত্র সন্তান রুবেল (৬) এর হার্নিয়ার সমস্যার জন্য পাঁচবার ডাক্তারের কাছে এসেছেন। কিন্তু ভীড়ের কারনে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারেননি। তার অর্থনৈতিক অবস্থা এত দুর্বল যে বরগুনার বাইরে ঢাকা বা বরিশালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়।
শিংড়াবুনিয়া গ্রামের হাওয়া বেগম জানান তার অসুস্থ শিশুকে নিয়ে তিনবার হাসপাতালে এসে সিরিয়াল দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেননি। প্রতিবার বাড়ি থেকে আসতে যেতে তা প্রায় একশত টাকা খরচ হয়। তার মত দরিদ্র পরিবারের জন্য এটা বহন করা কষ্টসাধ্য।
এমনিভাবে আর্থিক দৈন্যতার কারনে অনেক শিশু চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেনা। ফলে বরগুনার শিশুরা এখন উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। বরগুনা হাসপাতালের একমাত্র শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ

আলমগীর হোসেন বলেন- "বর্তমানে হাসপাতালটিতে চিকিৎসা সেবা দিতে ১৫-২০ জন ডাক্তারের প্রয়োজন। আর শিশুদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে অআলাদা একটি ওয়ার্ডস্থাপন করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।" এ বিষয়ে ভুক্তভুগি ও ডাক্তার সহ সকলের দাবী বরগুনা সদর হাসপাতালে একটি আলাদা শিশু ওয়ার্ড নির্মাণ করা হোক।

১২৯) যৌতুক লোভী স্বামীর নির্যাতনে থমকে গেছে নমিতার জীবন।
স্বপন দাস (বরগুনা) :
থমকে আছে বরগুনার বেতাগীর বুড়ামজুমদার গ্রামের নমিতার জীবন। যৌতুক নামের অভিশাপ উচ্চ শিক্ষিত এই নমিতার জীবনের চলার পথকে থামিয়ে দিয়েছে। পিতা বিমল চন্দ্র হাওলাদার তার নম্র, ভদ্র, উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে দেন পিরোজপুরের রায়ের কাঠি গ্রামের মাখন লাল সিকদারের ছেলে মানবেন্দ্র সিকদার (পার্থ) এর সাথে। ২০০৪ সালে ২৬ জানুয়ারি হিন্দু রীতি অনুসারে তাদের বিয়ে হয়। বিয়েতে তিন লাখ টাকা খরচ করেন নমিতার দরিদ্র বাবা।
বিয়ের তিন মাস যেতে না যেতেই নববধূ নমিতার উপর নেমে আসে স্বামীর অমানবিক নির্যাতন। যৌতুকরৌভী স্বামীর নির্যাতনের বর্ননা দিতে গিয়ে অর্নাস মাস্টার্স শেষ করে অআইন কলেজে অধ্যায়নরত মেয়েটির চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরছিলো। নমিতা জানায় তার স্বামী নির্মমভাবে তাকে নির্যাতন করেছে। তাকে না খাইয়ে মারতে চেয়েছে। এসিড মেরে শরীর ঝলসে দেয়ার হুমকি দিয়ে বলত বাবার বাড়ি থেকে দুলাখ টাকা এনে দিতে। এমনকি এ যৌতুকের দাবীতে অন্ধকার কক্ষে বন্দি করে রাখা হয়েছে তাকে। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের অমানবিক নির্যাতনের নির্মম কাহনী শুনে নমিতার বাবা গোয়ালের গরু ও গাছ বিক্রি করে, এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে মেয়ের সুখের জন্য একলাখ টাকা তুলে দেয় মেয়েজামাইয়ের হাতে। কিন্তু এ টাকা পেয়েও ক্ষান্ত হয়নি পার্থ। বাকি এক লাখ টাকা দাবী করে নমিতার উপর আরও বেশি নির্যাতন শুরু করে দেয়। এমন সময়ে চলে আসে দূর্গাপূজা। নমিতার বাবা পূজা উপলক্ষ্যে বেয়াই মাখন লাল সিকদারকে বেড়াতে আনেন। এ সময়ে যৌতুক বিষয়ে তার সাথে তর্ক হলে পূত্রবধুকে বাবার বাড়িতে রেখে সে নিজবাড়িতে চলে যায়।
পরে নমিতা কোনো উপায় না পেয়ে ২০০৪ সালের ১৭ নভেম্বর যৌতুক নিরোধ আইনের ধারা (৪) অনুযায়ী বরগুনা কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তার স্বামী পার্থ ২০০৫ সালের ২৪প্রিল গ্রেফতার হয়। মাত্র একদিন পরই তার জামিন মঞ্জুর করেন দায়রা জজ আদালত। নমিতা তখন ঢাকায় পড়াশুনা করছেন। দীর্ঘ তিন বছর তিনি ঢাকায় অবস্থান করে মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। যৌতুকলোভী স্বামীর বিচার হবে এ আশায় তিনি আদালত প্রাঙ্গনে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। নমিতার একটাই প্রত্যাশা যৌতুকের করনে আর কারও ভাগ্যে যেন এমন নির্যাতন নেমে না আসে। নমিতা বলেন- "আমি জানি নির্যাতনের রূপ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। আমাকে ওরা শেষ করে দিয়েছে। এ যৌতুক প্রথা উচ্ছেদের জন্য আমি লড়ে যাব যতদিন জীবন আছে।"
(ছবি আছে)

১৩০) বরগুনায় শিশুপার্কের অভাবে শিশুদের বিকাশ বাধাঁগ্রস্থ হচ্ছে।
শাহনাজ লাভলী (বরগুনা) :
বরগুনা জেলা সদরে কোনো শিশুপার্ক নেই। শিশুপার্কের জন্য নির্ধারিত জায়গাটি বর্তমানে পরিত্যাক্ত। এটা যে শিশুপার্ক তাও বোঝার কেনো উপায় নেই। কারন ইতোপূর্বে স্থাপিত দোলনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে। সেখানে শিশুদের যাবার কোনো সুযোগ নেই। নেই শিশু বান্ধব পরিবেশ।

এখানে এখন গরু ছাগল বিচরন করে। আর শিশু পার্কের জায়গায় বসতি গড়েছে অস্থায়ী পোনা মাছ বিক্রেতারা। শিশুপার্কের অভাবে বিনোদন সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা।

১৯৮৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী বরগুনা জেলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই জেলা সদরে একটি শিশু পার্ক স্থাপনের দাবী জোড়ালো হয়। এ প্রেক্ষিতে জেলঅ পরিষদের তত্ত্বাবধানে কালেক্টরেট ভবনের দিঘির পাড়ে ২০ শতাংশ জমির উপর শিশু পার্ক নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হয়। শিশুদের খেলা ও বিনোদনের জন্য ২/৩ টি দেলনা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে সেগুলো বিফল হয়ে যায়। বর্তমানে সেগুলোর অস্তিত্ব খুজেঁ পাওয়া যাবেনা। কিন্তু পূনার্ঙ্গ শিশুপার্ক কখনই করা হয়নি। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিশুপার্কের জন্য তাদের কোনো অর্থ বরাদ্দ নেই।তাই কোনো কাজ করতে পারবেনা।
অপরদিকে বরগুনা পৌরসভা প্রথম শ্রেনীতে উন্নীত হবার পরে প্রতিবছর বাজেটে শিশু পার্কের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকে। কিন্তু বাস্তবায়ন হয়না। পৌরচেয়ারম্যান এ্যাড. মোঃ শাহজাহান জানান, শিশুপার্ক নির্মানের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ পৌরতহবিলে নেই। এজন্য শিশুপার্ক বাস্তবায়ন করা যাচ্ছেনা। তবে চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পৌর পরিষদের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে বলে তিনি জানান। এদিকে জেলা শহরে শিশুপার্ক না থাকায় শিশুদের শারীরীক ও মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানান ব্রাঞ্চ রোডের এক শিশুর বাবা হাসানুর রহমান। অনেক অভিভাবক শিশুদের নিয়ে বিকেলে সার্কিট হাউজ মাঠে, টাউন হল ব্রীজে বা খোলা রাস্তায় ঘুরে পার্কের অভাব মেটানোর চেষ্টা করেন।
বরগুনার শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আলমগীর জানান শিশুপার্ক বিষয়ে বলেণ- "শিশুদের শরীর ও মনের বিকাশের জন্য বিনোদন প্রয়োজন। আর এজন্য শিশুপার্ক অপরিহার্য।"

১৩১) বরগুনার নুপুর সন্তানের পিতৃপরিচয় চায়
স্বপন দাস/ আমিন সোহেল (বরগুনা) :
মাত্র সাড়ে চার মাসের শিশু সন্তান সীমাকে নিয়ে প্রশাসন সহ প্রভাবশালীরে দ্বারে দ্বারে ঘুরে এখন আদালতের কাছে তার সন্তানের পিতৃপরি য়ের দাবিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নুপুর বেগম (১৫)।বরগুনার ছোট তালতলী গ্রামের আটঘরের দিন মজুর আব্দুল কুদ্দুসের মেয়ে সে।

নুপুর জানায় ২০০৬ সালের ১৬ জুলাই একই গ্রামের প্রতিবেশী বাবুল মুন্সীর বখাটে ছেলে সুমন (২০) অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নুপুরকে ধর্ষন করে। পরবর্তীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সুমন তার সাথে শারীরীক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে নুপুর অন্ত:সত্ত্বা হয়ে পড়লে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য চেষ্টা চালানো হয়। নুপুর রাজী না হওয়ায় একলাখ টাকার লোভ দেখিয়ে অন্যের ঘাড়ে দায় চাপাতে বলঅ হয় নুপুরকে। কিন্তু অনাগত সন্তানের পিতৃপরিচয়ের দাবিতে অনড় থাকে নুপুর। চলতি বছরের ১১ মার্চ নুপুর বাদী হয়ে তার সন্তানের পিতৃপরিচয়ের দাবীতে সুমন মুন্সী, বাবুল মুন্সী ও ফাতেমা বেগমকে আসামী করে আদালতে মামলা করে। এরই মধ্যে ২৯ মার্চ নুপুর একটি কন্যা সন্ত্যানের জন্ম দেয়। সে তার নাম রাখে সীমা। বরগুনা থানার এস.আই আক্তার হোসেন ১৬ এপ্রিল সুমনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে। চার্জশিট দাখিলের পর থেকেই সুমন ও তার আত্মীয় স্বজনরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য নুপুর ও তার পরিবারকে চাপ প্রয়োগ করে ও হত্যার হুমকী দেয়ায় নুপুর ও তার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নুপুর বলে- "জীবন চলে গেলেও আমি আমার সন্তানের পিতৃ পরিচয় নিশ্চিত করব।"

১৩২)আমতলীর চাওড়া জেলেপল্লীর শিশুরা স্কুলে যায়না

সাফায়েত আল মামুন (বরগুনা) :

বরগুনার আমতলীর চাওড়া বৈঠাকাটা জেলেপল্লীর অধিকাংশ শিশু স্কুলে যায়না । ফলে এখানে প্রাথমিক শিক্ষার গতিশীলতা নেই । এতে এখানকার কোমলমতি শিশুরা শুধূমাত্র শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছেনা এগিয়ে যাচ্ছে অজ্ঞতা অঅর অন্ধকারের দিকে ।

প্রমত্তা পায়রার কোল ঘেষে অবস্থিত চাওড়া বৈঠাকাটা জেলেপল্লীর জেলেরা দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে । তারা এখানে বাস করছে প্রায় ৫০ বছর ধরে । এ জেলেপল্লীতে বাস করছে প্রায় তিন শতাধীক পরিবার । এসব পরিবারে মোট ৯২০ জন মানুষ বাস করে যাদের মধ্যে পুরুষ ৪২০ জন, নারী ৩৫০ জন আর ১৫০ জন আছে শিশু ।

এখানকার অধিকাংশ শিশুর স্কুলে যাওয়ার বয়স হলেও এরা স্কুলে যায়না । ফলে সম্পূর্ন শিক্ষা ছাড়াই এরা বেড়ে উঠছে । পাশাপাশি এদের প্রতিভা বিকাশের পথও রুদ্ধ । সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এরা নিয়োজিত হচ্ছে নানা পেশায় । পরিবারের আয় উপার্জনের জন্য তারা শ্যমে নেমে পড়ছে ।

চাওড়া জেলেপল্লী সংলগ্ন এখানে রয়েছে একটি সরকারি ও একটি রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় । রয়েছে একটি মাদ্রাসা । পাশাপাশি বেসরকারিভাবে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে । এখানকার শিশুরা কেন বিদ্যালয়মুখী হয়না এ প্রশ্ন সবার । তবে প্রাথমিকভাবে সকলেই সংসারের অভাব অনটনকে দায়ী করেছেন । তবে কেউ কেউ বলেছেন ভিন্ন কথা । সরকারের প্রাথমিক শিক্ষায় গতিশীলতা আনতে এখানে জোড়ালো কোনো উদ্যোগ নেই । এ ব্যাপারে বৈঠাকাটা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ খলিলুর রহমান জানান, জেলেপল্লীর শিশুরা বাবামায়ের সাথে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে । তারা সংসারে উপার্জনের জোগান দেয় । এ কারনে বাবা মাও সন্তানদের কাজে নিয়োজিত রাখতে চায় । জেলেপল্লীর জেলে রহিম গাজী জানান, তার ছেলে ও মেয়েকে লেখাপড়া করানোর চেয়ে তারা টাকা রোজগার করবে এটাই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ন । এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হারুনর রশিদের সাথে আলাপ কালে সে জানায়, অজ্ঞতা, অসচেতনতা আর দারিদ্রই এর পেছনের কারন । তবে আগের চেয়ে মানুষ এখন অনেক সচেতন । কষ্ট করে হলেও তারা সন্তানকে স্কুলে পাঠায় ।

সমুদ্রগামী জেলে মোঃ ইউসুফ মিয়া, হেলাল মুন্সী, মোঃ নিজাম, মালেক সহ অনেকে জানিয়েছেন সংসারে অভাবের কারনেই তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়না । হেলালমুন্সী বলেন -"আমাগো বাচনের সুযোগ কইরা দের আমরা পোলাপানগো স্কুলে পাঠামু" । এ বিষয়ে উপজেলা মৎস কর্মকর্তা মোঃ সাব্বির হোসেনের সাথে কথা বললে সে জানায় জেলেদের নানাভাবে সহযোগিতা করছে সরকার । এখন জেলেদের উচিত তাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা ।

১৩৩) মার্তৃভাষা নিয়ে বিপাকে রাখাইন জেলেপল্লীর শিশুরা ।

সাফায়েত আল মামুন (বরগুনা):

নিজের ভাষা ভুলে গেলে নিজেদের সংস্কৃতিই ভুলে যাবে এই আশংকায় দিন কাটাচ্ছে বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার তালতলী আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায় । নিজস্ব স্কুল না থাকায় রাখাইন সন্তানরা একদিকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষা ঠিকমত পাচ্ছে না অন্যদিকে মার্তৃভাষা শিখতে না পারায় তারা তাদের সঙস্কৃতি ধরে রাখতে পারছেনা । ফলে দিনদিন হারিয়ে যাচ্ছে আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা, শিক্ষা সঙস্কৃতি । তালতলী রাখাইনপাড়া পরিদর্শন করে রাখাইনদের সাথে কথা বলে ক্ষলে এ তথ্য পাওয়া গেছে ।

মার্তৃভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক শিশুর প্রথম অধিকার। রাখাইন শিশুরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় নিজস্ব ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি ভুলে শিশুরা ক্রমাগত অপসংস্কৃতিতে ঝুঁকে পড়েছে বলেও মন্তব্য এখানকার রাখাইনদের। বাংলাদেশে বসবাসকারী বিধায় বাংলাভাষার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ভাষায় অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে তারা।
জানা যায় দুইশ বাইস বছর পূর্বে রাখাইনরা এদেশে বসবাসের জন্যে এলেও এ অঞ্চলের তাদের নিজেদের ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি শিক্ষার সুযোগ পায়নি। সহস্রাব্দ উন্ন নের একটি গুরুত্বপূর্ন লক্ষ অর্জনের জন্য যেখানে জাতি বর্ন নির্বিশেষে সব শিশুর দ্বার প্রান্তে শিক্ষার বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে সেখানে এদেশে বসবাসকারী রাখাইন সন্তানদের অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষা ঠিকমত পাচ্ছেনা।
প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা থাকলেও থাকছেনা নিজস্ব ভাষাজ্ঞানের লেশমাত্র। এ কারনে রাখাইন শিশুদের অভিভাবকরা চিন্তিত। তাদের শংকা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মূল সংস্কৃতি থেকে একসময় হারিয়ে যাবে। তখন ধার করা সংস্কৃতি নিয়ে তারা বেশিদূর এগোতে পারবেনা।
রাখাইন নেতা মং তাহান বলেন—“বিশ্বায়নের সাথে তাল মেলাতে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার চর্চা রয়েছে সর্বত্র। আর রাখাইনদের ভাষা চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রযোয্য নয়। তারা কোনো ভাষাই সঠিকভাবে চর্চা করতে পারছেনা। এ কারনে রাখাইনদের ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি অনেকাংশে বিপন্ন।”
সম্প্রতি রাখাইনদের ভাষা শিষক্ষা সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখতে কাজ করছে রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন –আরডিএফ)। পাড়াভিত্তিক তাদের তিনটি ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার শিশু শিক্ষা কেন্দ্র অঅছে। তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সংস্থার সহকারী পরিচালক কাজী সোহেব ফকরুল জানান, রাখাইন শিশুর মধ্যে তার নিজস্ব ভাষা ও জ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষার পাশাপাশি তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাই এ সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।
স্কুলের শিক্ষিকা খেন খেন জানান, প্রায় সব পরিবারের শিশুরাই এখানে আসে। তাদের মার্তৃ আদরে পাঠ্য বই অনুযায়ী এখানে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে।

স্থানীয় রাখাইনরা অভিযোগ করেছে এসব সংস্থা রাখাইনদের নিজস্ব ভাষার পাশ কাটিয়ে বার্মিজ ভাষা শেখাচ্ছে। যা রাখাইনদের মূল ভাষা নয়। রাখাইনদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি সৃষ্টি করাই এ সঙস্থার মূল লক্ষ্য। এত গোটা রাখাইন জাতি অপসস্কৃতিতে ঝুঁকে পড়ছে বলে রাখাইনদের আশংকা।

১৩৪) এক নুর জাহান / সুখের আশায় আশার চরে এসে সুখের দেখা মেলেনি।

স্বপন দাস (বরগুনা) :

“হারাজীবন দুহের পর এটটু সুহের আশায় আমরা আশার চরে আইছিলাম। কিন্তু অনেক বছর কাইট্টা গেলেও পোড়া কপালে একদিনের লাইগ্গাও হেই সুখের মুখ দেহা দেলেনা”- কথাগুলো বলছিলো বরগুনার আশার চরের শুটকি মাছ ছাটাই শ্রমিক নুরজাহান।
নুরজাহানের কথাশুনে আরও জানা গেল আশার চরে তার কয়েক যুগ কেটে গেছে। সুখ কি তা সে জানেনা। জন্মই তার দুঃখ নিয়ে কবে দুঃখের দিন কাটবে তা জানেনা সে। সাধ আহ্লাদ দূরের কথা জীবন ধারনই তার কাছে বড় বোঝা। বয়স জিজ্ঞেস করতেই সে চিন্তায় পড়ে গেল। একপর্যায়ে আঙ্গুল টিপে জানাল ৫৫ বছর হবে। স্বামীর নাম আনোয়ার হোসেন। বাড়ি পাথরঘাটা আঙ্গার পাড়া গ্রামে। বিশ বছর আগে নুরজাহান স্বামীর সাথে আশার চরে এসেছিলো। সেই থেকে সে এখনও এই চরে রয়ে গেছে। একে একে এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ের মা হয়েছেন। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। দুই মেয়ে খেনও অবিবাহিত। ছেলে গোলাম সরোয়ার (৩৫) কর্মক্ষম। বৃদ্ধ বয়সে নুরজাহান মাছ ছাটাইয়ের কাজে যে

আয় করে এতেই তাদের সংসার চলে। মেয়েদের স্বামীরাও নিত্যান্ত দরিদ্র। তাদের পক্ষেও নুরজাহানকে দেখা সম্ভব নয়।
নানা রোগ বাসা বেধেঁছে নুরজাহানের শরীরে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মাথা ঝিম ঝিম করে। হাটু কোমরে বাতের ব্যথা। কাজ করত গেলে উঠে দাঁড়াতে হিমশিম খায়। অতিকষ্টে নুরজাহান বলে উঠল- "বাবা আমার শরীরের কষ্টের লগে আমার মনের মধ্যেও অনেক কষ্ট। এ্যাহোন আর আগের মত কাম করতে পারিনা। বুড়ি দেইখা আমারে কেউ কাম দিতে চায়না।" জানা গেল ছয় মাস এখানে কাজ করে আর ছয় মাস বসে থাকতে হয়। তারপরেও কোন এক আশার আলোর অপেক্ষায় আশারচরে বসে দিন গুনছে নুরজাহান। সে আশা কি মৃত্যুর জানেনা নুরজাহান।

১৩৫) যৌতুকের শিকার বালিয়াতলীর ফাতিমা

আবু জাফর মোঃ সালেহ (বরগুনা) :

যৌতুকের শিকার হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে বালিয়াতলী গ্রামের মোসাঃ ফাতিমা বেগম (২৪)। তার কষ্টের কথা বিভিন্ন মহলে জানালেও কোনো সমাধান পাননি তিনি।
বরগুনার আমতলীর বালিয়াতলী গ্রামের মোঃ মোতাহার গাজী এর বড় মেয়ে ফাতিমা। ছয় বছর আগে তার বিয়ে হয় একই উপজেলার কচুপাত্রা গ্রামের মোঃ আমজাদ বুখারীর পুত্র মোঃ খলিলুর রহমানের সাথে। ফাতেমার বাবা জানান, তার মেয়ে জামাই কয়েকবার টাকা দাবী করে মেয়েকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। মেয়ের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে নিজে না খেয়ে কোনোভাবে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করে দিয়ে দেয়। কিন্তু সে টাকায় জামাইয়ের চাহিদা মেটেনা। তাই মেয়েকে আবারও তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। মোতাহার গাজী বলেন- "আমার পক্ষে সম্ভব হয়না জামাইয়ের দাবীকৃত ১২ হাজার টাকা দেয়ার। যে জমি ছিলেঅ সব নদী ভাঙ্গনে চলে গেছে। আমি এখন নদীতে মাছ ধরে যা পাই তা দিয়েই সংসার চালাতে হয়। কিন্তু টাকা জমা করে মেয়ের কষ্ট দূর করতে পারিনা কোনো ভাবেই।"

এ ব্যাপারে ঐ এলাকার মজিদ জোমাদ্দার (৪৫), আঃ রশিদ মিয়া (৫০) এবং রব মিয়া (৬০) সহ অনেকেই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন-"ফাতিমার অবস্থা আমরা সবাই জানলেও করার কিছু নেই। ফাতিমা এখন বাবার বাড়িতে থেকে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।" ফাতিমাকে আইনি সহায়তা নেয়ার কথা জানতে চাইলে সে বলে- "স্বামীর ঘরে মামলা করে গেলে শান্তি পাওয়া যায়না। পরে আরও মাইর খাইতে হইবে। তার চাইতে আমি যেভাবে পারি সেইভাবে খাব। যেদিন টাকা জোগার করতে পারব সেইদিন স্বামীর ঘরে যাব।"
এ বিষয়ে ইউপি সদস্য মোঃ অঅব্দুর রাজ্জাক জানানযার সমস্যা সে যদি এগিয়ে না অঅসে তাহলে আমরা কি করবেন। তিনি আরও বলেন আমাদের নারীদের মধ্যে এখনও সচেতনতার অভাব রয়েছে।

১৩৬) আমতলী উপজেলার কর্মজীবী নারীরা স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত

সাফায়েত আল মামুন (বরগুনা) :

বরগুনার আমতলী উপজেলার কর্মজীবী নারীরা স্বাস্থ্যসেবা থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। দারিদ্র, অসতেনতা, অপুষ্টি এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় এসব নারীদের মার্তৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে।
আমতলীর স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার গুনগত মান বৃদ্ধি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্থ সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমতলীর হাসপাতালে নারী রোগীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিমাসে গড়ে আমতলীর ৩১ বেডের হাসপাতালে আন্তবিভাগে প্রায় দুশ ৬০ জন

এবং বহিবিভাগে প্রায় তিন হাজার জন নারী চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করছে। অন্যদিকে আমতলী উপজেলার কুকুয়া ইউনিয়নের ১০ বেডের হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রায় এক হাজার ৫০০ জন নারী চিকিৎসা সুবিধা নিচ্ছে। কিন্তু নারীদের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব বিশেষ করে এএনসি ও পিএনসির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে নারী রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা। অন্যদিকে নারী চিকিৎসক অন্যত্র বদলী হওয়ায় নারীরা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে আগ্রহ হারাচ্ছে বলে আমতলী হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

সরকারি ও বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী আমতলীতে গর্ভবতী মায়েদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার পাঁচশ। এর মধ্যে মধ্যে ২৫% গর্ভবতী মা অপুষ্টির শিকার। ডাক্তারী নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক গর্ভবতী মাকে প্রসবপূর্ব পর্যন্ত কমপক্ষে তিনবার চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়ার কথা থাকলেও ৮৭% মা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত চিকিৎসক, হাসপাতাল, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিকের শরনাপন্ন হয়েছেন। এবং ১৩% গর্ভবতী মা আদৌ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছেনা। এদের অধিকাংশই কর্মজীবী ও দরিদ্র নারী। পারিবারিক অসহযোগিতা, কাজের ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা, দারিদ্রও অসচেতনতাই এ জন্য দায়ী। হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গেছে গড়ে প্রতিমাসে আমতলীতে প্রায় ৩০০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে। প্রসবকালীন সময়ে ৮ থেকে ১০ জন শিশু মারা যায় এবং প্রসবজনিত কারনে হাজারে তিন থেকে চারজন মা মারা যায়।

স্বাস্থ্য সমস্যায় নারীরা ডাক্তারের শরনাপন্ন না হওয়ার কারন সম্পর্কে বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনএনএস'র নির্বাহী পরিচালক শাহাবুদ্দিন পান্না জানান, কর্মজীবী নারী শিক্ষিত হোক বা না হোক এদের অধিকাংশই এখনও অসচেতন এবং স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন। এরা জানেনা প্রসবকালীন করনীয় সম্পর্কে। তিনি আরও জানান নারীপক্ষের সহায়তায় বরগুনায় ইতমধ্যে নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত একটি অ্যাডভোকেসি পার্টনারশীপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। আমতলীতে এ নিয়ে কাজ হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পরিদর্শিকা আবেদা নাসরীন বলেন –"কর্মজীবী নারীরা স্বামীরা তাদের স্ত্রীর অসুস্থতার দিকে খেয়াল রাখেনা। এসব নারীরা স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ পায়।"

হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা কেন্দ্রগুলোতে নারীদের অভিগম্যতা সৃষ্টিসহ নারীদের বিশেষ করে প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

১৩৭) বরগুনার চরাঞ্চলের শিশুরা অধিকার বঞ্চিত

তালুকদার মোঃ মাসউদ (বরগুনা) :

বরগুনার চরাঞ্চলের অসংখ্য শিশু অধিকার বঞ্চিত। খুব ছোট থেকে শিশুরা নানা রকম শ্রমের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। তারা বঞ্চিত মৌলিক অধিকার থেকে। সচেতন মানুষের অবহেলা অসচেতনতা এবং দারিদ্র এ শিশু শ্রমের মূল কারন। সরকারের নীতমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং কাছাকাছি প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল না থাকায় শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে চরাঞ্চলের অনেক শিশু। সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা গেছে অসংখ্য শিশু পোনামাছ ধরছে দোকানে কাজ করছে। এসব শিশুরা কিছু লেখাপড়া জানলেও কেনোদিন স্কুলে যায়নি। অনেক শিশুকে দেখা গেছে রোগাক্রান্ত ও শারীরীকভাবে অক্ষম। তবুও তারা কাজ করছে। কুমির মারার শিশু সোহরাব মিয়ার ছেলে শ্রমিক মিলন (১০) জানায় ওরা তিন বোন ও দুই ভাই মা বাবাসহ সাতজন আছে পরিবারে। এত বড় পরিবারের খরচ যোগার করা তার একার পক্ষে সম্ভব না। তাই বাবার সাথে কাজ করছে। মিলনের বাবা বলেন- "বাড়িতে পোলার মা রোগা, প্রতিমাসে ৫০০

টাকার ঔষধ লাগে ।তারউপর সবাইর খাওন পরন । এইজন্য মিলনরে মাছ ধরতে আমার সাথে নিছি ।”
এ এলাকায় দেখা যায় স্কুলের সময়ে শিশুরা স্কুলে না রগিয়ে পোনা ধরে ।
এ সব অধিকার বঞ্চিত শিশুদের পাশে সচেতন মানুষ ও সরকারের নীতিমালার সুষ্ঠূ প্রয়োগ নেই বলে অনেকে মনে করেন । এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান চরের শিশুদের জন্য সরকারের আলাদা ব্যবস্থা নেয়া দরকার ।

১৩৮) যৌতুক কেড়ে নিল বকুলের সুখ
মোসাঃ ফারজানা মুন্নী (বরগুনা):
“মানুষের ঘরে কাম করতে আর ইচ্ছা করেনা । জীবনে কোনোদিন সুহের মুখ দেকলাম না । এহন ঠিকমত কামও পাইনা”-কথাগুলো বললেন বেতাগী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের ৪০ বছর বয়সী বকুল বেগম ।
একটা সময়ে বকুলের চোখ ভরা স্বপ্ন ছিলো । মা বাবার সংসারে বকুল ছিলো দু ভাই বোনের মধ্যে ছোট । অভাব অনটনের কারনে পড়াশোনা তো দূরের কথা ঠিকমত খেতেও পারেনি । বকুলের তাই স্বপ্ন ছিলো ভাল ঘরে বিয়ে হবে । ঠিকমত খেতে পারবে । বিয়ে হয়েছিলো ঠিকই । কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস । সুখ তার কপালে সইল না । যৌতুক কেড়ে নিয়েছে তার সব সুখ ।

স্বামী আবুল কালাম (৫৫) স’মিলে কাজ করত । দুটো ছেলে সন্তান নিয়ে সংসার ভালই কাটছিলো । এর মধ্যে স্বামী তার কাছে দাবী করে পাঁচ হাজার টাকা । এ টাকা দিতে না পারায় প্রচুর মারধর করত তাকে । শুরু হয় তার কষ্টের দিন । স্বামী আবুল কালাম আবার মোটা অংকের টাকা নিয়ে বিয়ে করে সংসার শুরু করে । অসহায় হয়ে পড়ে বকুল । ছেলেদের নিয়ে চলে আসে বাবার বাড়ি । কোনোভাবে মাথাগোজার ঠাঁই পায় ।
জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য পুরুষের পাশাপাশি কাঠ কাটার কাজ বেছে নেয় । বকুল জানালেন, কাঠ কাঠা অনেক কষ্টের কাম, হ্যারপরও করি, জীবন বাঁচানোর জন্য । সারাদিন যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চলেনা । ছেলেদের পড়াশুনার ব্যাপারে বলেন –“হুনছি মাইয়াগো পড়াইতে টাহা লাগেনা, আমার তো সব পোলা ।”

১৩৯) হাটতে পারেনা কিন্তু গাছে উঠতে পারে ।
রোজিনা আক্তার মালা (বরগুনা) :
ঠিকভাবে হাটতে পারেনা কিন্তু গাছে উঠতে পারে । পারে সব ধরনের কাজ করতে । এছাড়া চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র হয়েও কম-বেশি ইংরেজি বানান করতে পারে । এমনকি নদীনালা পুকুরে মাছ ধরতে পারে । সে শুধু গাছে উঠতেই পারদর্শী নয় সব কাজেই পারদর্শী । তার মধ্যে রয়েছে সম্ভাবনামত প্রতিভা । লেখাপড়ায়ও স্বাভাবিক শিশুদের অনেকের চেয়ে এগিয়ে । বেতাগীর ইমরান এমনই এক প্রতিভাবান শিশু । পুরো নাম মোঃ ইমরান হোসেন খান (১১) । সে পঙ্গু এবং বেতাগী সালেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার এবতেদায়ীর চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র । সহায় সম্বলহীন ভ্যান চালক মোঃ হাফিজুর রহমান টিপুর দ্বিতীয় সন্তান সে । ইমরান জনম থেকেই পঙ্গু । সে ভুমিষ্ট হয়েছে এক পা নিয়ে । ইমরানের বাবার বসতভিটা ছাড়া আর কিছু নেই । তবুও সে তার একমাত্র পুত্র সন্তানকে পড়াশোনা করাতে চায় । তিনি বলেন- “আমি এ ভ্যান চালাইয়া সাত সদস্যের সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি । রোজ আয় হয় ৫০-৬০ টাকা । সংসারে ব্যয় হয় পুরো টাকা । তারপরও মাঝেমধ্যে ধারকর্য করতে হয় ।

ইমরানের বাবা জানান, তার চার সন্তানের মধ্যে তিনটিই পড়া শোনা করে। ১৬ বছর ধরে তিনি ভ্যান চালকের কাজ করছেন। ইমরানের মা লিপি আকতার বলেন- "আমার ছেলেডারে লেহাপড়া করাইতে চাই। ওর বাপে একটা ভাল কাজ পাইলে পোলাডার লেহাপড়া চালান যাইত।"

১৪০) নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের অভাবে বেতাগী হাসপাতালে শিশুদের চিকিৎসা ব্যহত

রোজিনা আক্তার মালা (বরগুনা) :

ডাক্তার , ঔষধ সংকট, হাসপাতালে আলাদা শিশু ওয়ার্ড সহ পর্যাপ্ত বেড না থাকায় বেতাগীতে শতকরা ৮০ ভাগ শিশু স্বাস্থ্যসেবা ব্যহত হচ্ছে।

আর্থিক দৈন্যতা, অসচেতনতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ অভিভাবক। শিশুদের ঝাঁড়ফুক ও পানিপড়াসহ ফকিরি চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারনে শিশুরা রুগ্ন ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠছে। ভুক্তভোগী, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি ও চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বৃটিশ আমলের শেষ দিকে জেলা পরিষদের অীধনে বেতাগী হাসপাতালের যাত্রা শুরু হলেও ১৯৮২ সালে ৩১ শয্যা নিয়ে পূর্নাঙ্গ হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০2 সালে ৫০ শয্যার অঅধুনিক হাসপাতালেনন্নীত করে নতুন ভবন নির্মান করা হলেও এখানে খাবার, ঔষধ সংক, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি জনবল নিয়োগ এ ধরনের কোনো সুবিধা বাড়ানো হয়নি। চালু করা হয়নি হাসপাতাল ও শিশুদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড। এখানে গড়ে প্রতিদিন ৫০ জন শিশু চিৎিসা নিতে আসলেও তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নৈরাশাজনক অবস্থা। নেই কোনো চিকিৎসার আলাদা সরঞ্জাম। ডায়রিয়ার জন্য সুই, স্যালাইন, অক্সিজেন ও খাবারের কোনো ব্যবস্থঅ। এর ফলে শিশুদের নির্দিষ্ট করে চিকিৎসা, আলাদা যত্ন নেয়া, মায়েদের বুকের দুধ পান করানো সম্ভব হয়না। বেডের অভাবে মেঝেতে থাকতে হয়। প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায়না।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা শিশু নাইমের মা হেপী বেগম জানান প্রায়শই সিট ভর্তি রোগী থাকায় সন্তানদের নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়।

পৌর কমিশনার হুমায়ুন কবির অভিযোগ করেন শিশু ওয়ার্ডের অভাবে শিশু রোগীদের বরিশাল পটুয়াখালী এমনকি ঢাকা নিয়ে যেতে হয়। এতে চিকিৎসার ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া টাইফয়েড নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুরা মেঝেতে থাকলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। পূর্ন বয়স্ক রোগী ও শিশু রোগীরা এক জায়গায় অবস্থান করায় ছোঁয়াতে রোগগুলো শিশুদের সংক্রমিত করে।

অনেক মায়েদের অভিমত শিশুদের কম বয়সে সোনা রূপা দিয়ে হাত পায়ে ও গলায় বল্লা চাঁদ, মাদুলি, পানিও সুতা পড়া, তাবিজকবজ ব্যবহার করলে সন্তানরা রোগবালাই ও দানবের কবল থেকে রক্ষা পাবে। এ ধরনের অপচিকিৎসার প্রতি এখনও এ এলাকার মানুিষের ঝোঁক রয়েছে বলে পল্লী চিকিৎসক জগদীশ চন্দ্র সরকার জানান। এ প্রসঙ্গে মেডিকেল অফিসার আল মোহিত বলেন-"অশিক্ষা আর অসচেতনতার কারনে আজও এর প্রবনতা রয়েছে। তারা এতে কতটুকু উপকৃত হন কেবলমাত্র তারাই জানেন।" তিনি এ বিষয়ে মায়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোস্তাক আল মেহেদী জানান উপজেলা পর্যায়ে শিশু ওয়ার্ডের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে হাসপাতালের নতুন ভবনের উদ্বোধন হলে অন্তত আলাদা বেড করে শিশুদের চিকিৎসার দুর্ভোগ লাঘব ও ব্যয় কমানো যেতে পারে।

১৪১) শোভরানীর চোখে এখন আশার স্বপ্ন

রোজিনা আক্তার মালা (বরগুনা) :

২৫ বছর আগে বরিশালের বাকেরগঞ্জের কলসকাঠী গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম শোভারানীর। জীবনের ১৮ টি বসন্ত পেরোনোর পর ৭ বছর আগে তার বিয়ে হয় বরগুনার বেতাগী উপজেলার গড়িয়াবুনিয়া গ্রামের ধোপা পেশায় নিয়োজিত সুনীল চন্দ্র দাসের সাথে। শৈশব তারুন্যে কৃষক বাবার পরিবারে সুখ সাচ্ছন্দের অভাব থাকলেও অন্নকষ্ট তেমন একটা অনুভব করেনি। কিন্তু স্বামীর সংসারে এসে অভাব অনটনে হাবুডুবু খাচ্ছিল শোভারানী।

স্বামীর যা আয় তা দিয়ে কোনোভাবে সংসার চলে। গ্রামে ধোপার কাছে কাপড় ইস্ত্রি করতে তেমন মানুষ আসেনা। এত আয় না হলে উনুনে হাড়ি চাপেনা। দিন কাটাতে হয় অর্ধাহারে কোনোদিন অনাহারে। এ অনটনের মধ্যেও জীবনের গতি থেমে থাকেনা। সংসারে আসে ফুটফুটে সন্তান। এবার শোভারানী ছেলে ভবিষ্যত চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। সে প্রানপনে স্থির করে শ্রম দিয়ে সংসারের অভাব ঘুচানোর। কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পায়না। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায় তার চোখে কেবলই হতাশা। এরপর মাথায় আসে ক্ষুদ্রঋণের কথা। যা দিয়ে ঘরে বসে কিছু আয় করা সম্ভব। বাড়ির পাশে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইকোনোমিক ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন ইভডা'র গ্রাম সংগঠন থাকায় স্বামীর সাথে আলাপ করে পাপিয়া মহিলা সমিতির সদস্য অন্তভূর্ক্ত হয়ে যায়।

প্রথম দফায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মুড়ির ধান কিনে মুড়ি ভাজার কাজ শুরু করে। তার কাজের একনিষ্ঠতায় হাতের যাদুর পরশে শোভার মুড়ির খ্যাতি স্বল্প দিনের মধ্যেই আশে পাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। দিনদিন চাহিদা বেড়ে যায়। ঋণের কিস্তি যথানিয়মে সময়মত পরিশোধ করে তার পুঁজি বাড়িয়ে নেয়। দ্বিতীয় দফায় ৭ হাজার টাকা ঋণ নেয়।

শোভা এখন একজন সফল মুড়ি ভাজার কারিগর। বাড়িতে এখন তার ছোটখাট মুড়ি ভাজার কারখানা। পরিবারে স্বামী শ্বাশুড়িকে এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে সংসারে স্বচ্ছলতার পথ বের করে দিয়েছে। স্বামীকে দিয়ে বাজার থেকে মুড়ির ধান কিনে আনায়। প্রতিমনে পরিবহন সহ খরচ পড়ে ৫ শত ৫০ টাকা। শোভা ধান সিদ্ধ করে শুকায়। মুড়িভাজার উপযুক্ত হলে মেশিনে ভাঙ্গিয়ে চাল করে। রবি ও বৃহস্পতিবার নিয়ামতি বন্দর, সোম ও শুক্রবার গড়িয়াবুনিয়ায় তার বাড়ির কাছাকাছি হাটে বসে। শোভা স্বামীকে দিয়ে মুড়ি পাঠিয়ে দেয়। মহাজনরা একসঙ্গে সব মুড়ি কিনে নিয়ে যায়। কখনও কখনও খুচরা ও বিক্রি করেন। এতে পাইকারিরর চেয়ে লাভ একটু বেশি হয়।

প্রতিমন মুড়ি ১২০০ থেকে ১২৫০ টাকা বিক্রি করে মন প্রতি লাভ থাকে ২৫০ টাকা। মাঝে মাঝে এর বেশিও লাভ হয়। প্রতি হাটে তিনি দুইমন মুড়ি বাজারে পাঠান। এ মুড়ি বিক্রি করতে স্বামী সুনীলের তেমন কোনো অসুবিধা হয়না। তিনি বলেন বর্ষার মৌসুমে মুড়ির ব্যবসা ভাল হয়না। তখন প্রায়ই জমানো পয়সা খরচ করতে হয়। তবে পরিশ্রম বেশি হলেও মুড়ির ব্যবসা লাভজনক। শোভারানীর ঘর ছোট হলেও সেখানেই মুড়ির জন্য ধান ভেজানোর জন্য মাটির পাত্র বসান। ঘরের মধ্যে ধান ঢেলে রাখার পর আর পা ফেলার জায়গা থাকেনা তাই তিনি আর কিছু দিনের মধ্যেই আর একটা ঘর তুলবেন বলে জানান। তিনি বলেন- এখন আমার চিন্তা নাই অঅর। আমার ছেলে সজিব কে মানুষ করব, পড়ালেখা করাব। ও চাকুরী করবে।"

১৪২) পিয়ারার জীবন সংগ্রাম

কামরুন্নেছা মুন্নী (বরগুনা) :

আর্থিক দৈন্যতা আর নানা প্রতিকূলতার মধ্য থেকে অবশেষে আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন বরগুনা সদর উপজেলার উরবুনিয়া গ্রামের জীবন সংগ্রামী পিয়ারা বেগম (৪০)।

দুই সন্তান নিয়ে স্বামীর ঘরে সুখেই দিনযাপন করছিলেন তিনি। কিন্তু স্বামী আঃ রাজ্জাকের মৃত্যুতে দুই পুত্র গোলাম সরোয়ার (১৫) ও আল আমীন (১৩) কে নিয়ে চরম দৈন্যতার মুখোমুখি হন। গ্রামে কোন

কর্মসংস্থান না পেয়ে চলে আসেন বরগুনা সদরের বাঁশবুনিয়া গ্রামে বাবার বাড়ীতে। সন্তানদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অভাবী বাবার বিধবা কন্যা পিয়ারা কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে বরগুনাতে কাজের সন্ধানে বের হন। অবশেষে খুজেঁ পান বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা ও বাসাবাড়িতে পানি সরবরহের কাজ। মাস শেষে তার ইনকাম ১৫৬০ টাকা। এ টাকা দিয়ে পরিবারের ভরন পোষন সহ সন্তানদের পড়াশুনার খরচ বহন করেন। তার বড় ছেলে গোলাম সরোয়ার ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জি.পি.এ -৫ পেয়েছে। পিয়ারা বেগমকে তার ছেলের পরীক্ষার ফলাফলের কথা জানতে চাইলে এক ঝলক হেসে উঠে বলেন–"যে কয় টাকা কাম কইরা পাই তা দিয়া সংসার চলেনা। তাই পোলার ফরম ফিলাপের স্থানীয় দু একজনের কাছে হাত পাততে হইছে। এসব কষ্টের ফল আমি পাইছি।"
তিনি আরও জানান তার ছোট ছেলেটাও বেশ মেধাবী। পড়াশুনার খরচ বহন করতে পারেননা বলে ওকে স্থানীয় এতিমখানায় ভর্তি করে দিয়েছেন। পানি টনার মত কাজকে অবলম্বন করে গুছিয়ে নিচ্ছেন সন্তানদের ভবিষ্যত।

১৪৩) বরগুনায় কলেজ ছাত্রী ধর্ষনের চেষ্টা
মামলা করে নিরাপত্তাহীনতায় গোটা পরিবার
এম হারুনর রশিদ রিংকু (বরগুনা) :
বরগুনায় কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী একটি পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মামলার আসামীরা এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় তারা এ মামলার সাক্ষীদেরও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। মামলার বাদী ঐ তরুনীর বাবা অভিযোগ করেন সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা সবসময় আতংকে দিন কাটাচ্ছেন।
স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে বরগুনা সদর উপজেলার আমতলীর নিমতলী গ্রামের কলেজ পড়ুয়া তরুনী (১৭) গত ২৬ জুন দুপুরে পাশের বাড়ির টিউবয়েল থেকে পানি আনতে যায়। এ সময় এলাকার প্রভাবশালী ইউপি সদস্য আফজাল হোসেনের ছেলে সোহেল ও জয়নাল মল্লিকের ছেলে রিপন এ তরুনীর মুখ চেপে ধরে নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষনের চেষ্টা চালায়। এ সময় তরুনীর ডাক-চিৎকারে পার্শ্ববর্তী লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে। পরে লাঞ্ছিত তরুনীর বাবা স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীদের সহায়তায় বরগুনা থানায় ওই দুই যুবককে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পর অভিযুক্তরা পালিয়ে বেড়ালে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। ঘটনার সাক্ষীদেরও সাক্ষ্য না দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। এ তরুনীর বাবা অভিযোগ করেন, আসামীদের পরিবারের লোকজন বর্তমানে তার পরিবারকে দেশ ছাড়া করার এবং তরুনীকে অপহরন করার হুমকী দিচ্ছে। এ ঘটনায় পরিবার পরিজন নিয়ে খুব নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছেন তারা।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বরগুনা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বরকত হোসেন সাংবাদিকদের জানান, প্রাথমিক তদন্তে এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তিনি ওই পরিবারটির নিরাপত্তা দেয়ার আশ্বাস দিয়ে বলেন অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালের প্রথম দিকে ওই গ্রামে অপর এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবারের মেয়ে ধর্ষনের শিকার হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত রাসেল সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েছে। এ মামলাটি বর্তমানে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে।

১৪৪) সাহেরা বেগমের জীবনচিত্র ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

জাহিদুল ইসলাম যাদু (বাগেরহাট):

নুন আনতে পানতা ফুরানো নিম্ন আয়ের ভাসমান জীবন সাহেরা খাতুনের। স্বামী, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি নিয়ে পুরাতন কোর্ট চত্তরে আটোসাটো দরজা বিহীন ভাঙ্গা ঘরে বসবাস তার। স্বামী মোসলেম শেখ (৭৫) অক্ষম। এক ছেলে জাহিদুল ইসলাম আদাড় (৩০) বিয়ে করে আলাদা বসবাস করে। বাগের হাটের বিখ্যাত চটপটি ও চপের দোকানদার অমূল্য রায়ের মসলা পেষা, কোটা বাছা ও পানি টানাই সাহেরা খাতুনের পেশা। যে আয়ে প্রায় ১৫ বছর ধরে সংসারের ঘানি চলছে ধুক ধুক করে। পাঁচ ছেলেমেয়ে ছিলো তার। এখন বেঁচে আছে এক ছেলে আদাড় ও এক মেয়ে পিয়ারা খাতুন (২৮)। পিয়ারা খাতুনের দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে যাওয়ার তেমন জায়গা নেই বলে মায়ের সংসারেই বসবাস করে। তার স্বামী আয়নাল শেখ তার খোজঁ খবর নেয়না বলে মায়ের আয়ের উপর নির্ভর করেই চলতে হয়। তাই তিন বেলা ভরপেট খেতে পায়না সাহেরা বেগমের পরিবারের সদস্যরা।

এখন যেখানে তারা থাকছে সে জায়গা থেকে কবে যে উচ্ছেদ হবে এ আশংকায় বিহ্বল সাহেরা। কারন ইতমধ্যে গোপালকাঠি আশ্রয়ন প্রকল্প, ৩ নং ব্যারাক এ সমস্ত জায়গায় বাস করেছেন আবার উচ্ছেদ হয়েছেন,তাই উচ্ছেদের আতংক থেকেই যায় তাদের। অথচ সাহেরার স্বামীর একসময় পৈত্রিক ভিটে ছিলো পিরোজপুরের নাজিরপুর থানার বুইচ্চাকাঠি গ্রামে। সে জমি কৌশলে দখল করেছে স্বজনেরা। এখন তাই ভাসমান জীবনযাপন।

অভাবের কারনে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে না পারলেও অনেক কষ্টে ছেলে আদাড়কে বড় করেছেন সাহেরা, বিয়েও করিয়েছেন। কিন্তু সে এখন মা-বাবার খোঁজ খবর নেয়না, বউ নিয়ে আলাদা থাকে। আদাড়ের কথা বলতে বলতে কেঁদে উঠলেন সাহেরা। স্থানীয় পৌর কমিশনারের মাধ্যমে স্বামীর জন্য একটি বৃদ্ধ ভাতার কার্ড জুটিয়েছেন তিনি। প্রতি তিন মাস পর কখনও ৬০০ টাকা আবার কখনও ৫০০ টাকা পায় মোসলেম উদ্দিন। যা দিয়ে তার ঔষধের ব্যয়ও মেটেনা। সমস্ত বর্ষাকালে ঘরে বসে বৃষ্টিতে ভিজে কাটিয়েছে পুরো পরিবার। অনেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সাহায্য না পেয়ে এখন আর কারও কাছে যান না। পাশের বাড়িতে মাঝে মধ্যে একটু আধটু কাজ করে দেয়ার সুবাদে তাদের টয়লেটটি ব্যবহারের সুযোগ পান।

সাহেরার বিষয়ে কথা হয় মহিলা পরিষদ নেত্রী শিল্পী সমাদ্দারের সাথে। তিনি বলেন- “সাহেরার মত ভূমিহীনদের জন্য দরকার সরকারের স্থায়ী পুনঃর্বাসন করা এবং আয় বর্ধক প্রকল্পের আওতায় এনে বাঁচিয়ে রাখা।”

শেষ বয়সে সাহেরা কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, কে তার দেখাশুনা করবে জানেন না তিনি। তার কথায় - “আমাদের দেখার কেউ নেই, কোনো কূল কি হবেনা আমাগো? যহন কাজ করতে পারব না তহন কে আমাগো মুখে খাওন দেবে? কাপড় পাবনা, চিকিৎসা পাবনা তয় বাচঁব ক্যামনে?

১৪৫) সাহায্য ছাড়া দুস্থ্য শিশু লিমার ভবিষ্যত

জাহিদুল ইসলাম যাদু (বাগেরহাট):

জন্ম থেকেই লিমার দুই পা বিকলাঙ্গ। মা কাজল রেখা ও বাবা নূর ইসলাম সরদারের একমাত্র কন্যা লিমা (৮)। একটি মাইনর অপারেশন করালেই স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে শিশুটি। লিমার বাবা মা, মানব কল্যান সংগঠন ব্লাড ও ডাক্তারের সাথে কথা বলে জানা গেছে চিকিৎসা খরচ বিশ হাজার টাকা প্রায় যা এ গরিব অসহায় পরিবারটির পক্ষে নির্বাহ করা সম্ভব নয়।

শিশু কন্যা লিমাকে নিয়ে মা কাজল রেখা তার মা হাসিনা বেগমের কাছে থাকেন। উল্লেখ্য কাজল রেখার জন্মের পরই তার বাবা তার মাকে ছেড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে। সেই থেকে হাসিনা অন্যের বাড়িতে কাজ করে কাজল রেখাকে বড় করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের বছর খানেক পরেই দু'পা বিকলাঙ্গ অবস্থায় জন্মে রিমা। আর লিমার বাবা তার জন্মের দু' চার মাসের মাথায় একটি কিডনি নষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পরেন। নুর ইসলাম ফুটপাতে কাঁচা তরকারি বিক্রি করে দৈনিক যা আয় করে তা দিয়ে খাওয়া পরাই চলেনা। তাই তারা নিরুপায় হয়ে হাসিনা বেগমের কাছে থাকেন। লিমা আর লিমার বাবা দুজনেই অসুস্থ।

এরই মধ্যে বাগেরহাটের মানব কল্যান সংগঠন (ব্লাড) লিমার চিকিৎসা সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। ব্লাড-এর সাধারন সম্পাদর জাহিদুল ইসলাম জানান, তারা ৬ আগস্ট বাগেরহাট সদর হাসপাতালের বিষেশজ্ঞ অর্থোপেডিক ডাক্তার মাহবুবুল আলমের কাছে লিমা ও তার বাবা মাকে নিয়ে দেখিয়েছে। তিনি দ্রুত অপারেশন করানোর তাগিদ দিয়ে জানিয়েছেন বয়স বাড়ার সাথে সাথে লিমার পায়ের হাড় শক্ত হয়ে যাবে ও অপারেশনের ঝামেলা বাড়বে। আর লিমার বয়স যদি আরও কম হত তাহলে বাগেরহাটেই অপারেশন করানো যেত। কিন্তু এখন নিতে হবে ঢাকাতে।
ব্লাড উদ্যোগ নিয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের। তারা লিমার জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদনপত্র দিয়েছে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেও অনেকে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।
লিমার জন্য আর কি কেউ সাহায্যের হাত বাড়াবেনা? এ আকুতি লিমার মা কাজল রেখার।

১৪৬) বাগেরহাট যৌন পল্লীর শিশুরা অধিকার বঞ্চিত
সাইফুল ইসলাম (বাগেরহাট):
অভিভাবকদের অসচেতনতা ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে বাগেরহাট যৌনপল্লীর শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ও নানা রকম অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পরছে। ফলে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাঁগ্রস্ত হচ্ছে। অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতনতা ও সম্মেলিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টজন। ১৩ আগস্ট ২০০৭ সরেজনি বাগেরহাট যৌনপল্লী পরিদর্শনে এ সমস্ত তথ্য উঠে আসে।

১৯৬৮/৬৯ সালে বাগেরহাট শহরের মধ্যস্থলে কচুয়াপট্টিতে এ পল্লীটি গড়ে ওঠে। এখানে ৩৫ টি ঘরে ৮৭ টি পরিবারের বাস। এখান কার ১১৮ জন শিশু বেড়ে উঠছে ঝুঁকিপূর্নভাবে।
এখানকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে পল্লীর বেশিরভাগ শিশু স্কুলে যায়না। অল্প সংখ্যক যারা স্কুলে যায় তারাও প্রাইমারির চৌকাঠ পেরোতে পারেনা। জেসমিন (১০) ও চুমকী (৯) জানায় তারা স্কুলে গেলে তাদের সহপাঠিরা তাদের তীরস্কার করে। তাদের সাথে বসেনা, মেশেনা। তাই তারা স্কুলে যায়না। ফারুক (১০) বলে-"মায় কইছে স্কুলে যাইয়া জজ ব্যারিস্টার হবিতো আর না, তার চাইতে কাম কর বাঁচতে পারবি।"
রাসেল (১২) বলে- "পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ার পর মা আর বই খাতা, স্কুলের খরচ দিতে চায়না, আমার পড়ার খুব ইচ্ছা।" সন্তানদের পড়ালেখার বিষয়ে কথা বললে তারা জানান, তাদের এ পেশায় অর্থ নেই, সম্মান নেই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর মত অর্থ নেই তার উপর স্কুলে গেলে ওদের সাথে সবাই খারাপ আচরন করে। তাই পড়াশুনার ব্যাপারে তারা উদাসীন।
পারুল, বুলু, জয়া সহ কয়েকজন মা জানান, পল্লীর ভেতরে ছোট স্কুলের ব্যবস্থা করলে তাদের সন্তানদের পড়ালেখা করাতে পারবে।

এখানকার শিশুরা অনেকে ঝুঁকিপূর্ন কাজে নিয়োজিত। মর্জিনা (১৫) অন্যের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করত। একদিন মালিকের ছেলে তাকে শারিরীকভাবে লাঞ্চিত করে। এর পর সে মায়ের পেশা বেছে নেয়। তার কথায় -"খারাপ কাজ করতে হইলে বাইরে কেন, যে জায়গার কাজ সে জায়গায়ই করি।"

মিলি (১৫) মায়ের প্রচন্ড অসুস্থতার সময় উপায়ান্তর না পেয়ে মায়ের পেশা বেছে নেয়। জানা গেছে, অনেক মা স্বেচ্ছায় তার মেয়েকে এ কাজে নিয়োজিত করে। এ সম্পর্কে সালমা (৩৮) বলেন- "জন্ম যার পাড়াতে সে এ কাজ না করে কি কাজ করবে।"

আর যৌনকর্মীদের ছেলেরা রিক্সা চালান থেকে শুরু করে দোকানে কাজ, কুলির কাজ এমনকি নেশাদ্রব্য বিক্রির মত অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পরে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মা জানান, তিন বছর আগে তার ১৪ বছরের ছেলেটি নেশারদ্রব্য বিক্রি করত। একদিন তার কাস্টমার এক ছাত্র নেতা তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে একটি মিছিলের উপর বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়। কিন্তু তার আগেই বোমা"ফেটে গিয়ে ছেলেটি আহত ও পঙ্গু হয়ে যায়। এভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় তারা চুরি, মারামারি সহ নানা অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। শিশুদের এ ঝুঁকিপূর্ন কাজ সম্পর্কে এক মা ছবি (৪০) বলেন-"আমরা নিজেরাই করি খারপ কাম, ওরা যে যেভাবে পারে বেঁচে থাক।"

বাগেরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান বলেন-"এখানকার শিশুরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ওদের বেশিরভাগ তো পৃথিবীতে অবৈধভাবে এসেছে। ওরা যদি স্কুলে যেতে চায় তবে ওদের কেউ না করবেনা। সব স্কুলে বলা আছে ওদের ভর্তি করার জন্য। তিনি এ বিষয়ে এনজিওগুলোর পদক্ষেপ নেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আপাতত সরকারি কোনো পরিকল্পনা নেই তবে এখানকার পরিবেশের দিকে তিনি নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন।

(ছবি আছে)

১৪৭) গ্রামীন নারীদের শ্রমজীবন

শাহনাজ আক্তার পলি (বাগেরহাট):

গ্রামীন সমাজে নারীদের একটা বড় অংশ জড়িত আছে শ্রম নির্ভর জীবনে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খেটে খাওয়া নারীদের হালচিত্র তাই অনেকটা একই রকম। অজোপাড়াগাঁয়ের নারীরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা পেশায় শ্রম বিনিয়োগ করে। এদের কেউ মাটি কাটে কেউ তা বহন করে। আবার কেউ বহন করে ধান গমের ভারি বোঝা। এছাড়া চাষাবাদ ক্ষেত খামারে কাজও করে থাকে মংলার দরিদ্র নারীরা। মূলত গ্রামীন কাজকর্ম অনেকটাই মৌসুম ভিত্তিক। বর্ষাপূর্ব সময়ে তারা সাধারনত মাটি কাটার কাজ করে থাকে। মাটি কেটে পথ ঘাট, পুকুর, ভিটে বাড়ি বাঁধাই করে থাকে। আর অন্যান্য ফল ফসলের মৌসুমে করে ক্ষেত খামারের কাজ। আলুর মৌসুমে আলু বপন, উত্তোলন ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করে মংলার নারীরা। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তারা কাজ করে। জীবন সংগ্রামের মাঝে ওরা জীবনের আলো খুজে বেড়ায়। তবুও জীবন প্রবাহে তাদের আশার আলো ফোটে না। সারাদিন কাজ করে ৪০-৭০ টাকার বেশি উপার্জন করতে পারেনা।

গ্রামীন নারীদের মজুরী প্রদানে মালিকরা দায়সারা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একমাত্র উপার্জনের পথ বলে এ পারিশ্রমিক গ্রহণেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা। সাধারনত গ্রামের বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা দরিদ্র নারীরা শ্রম বিক্রিতে আগ্রহী হয়। মংলার নারী আবেদা খাতুন ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করে সর্বস্ব হারিয়েছেন। শেষে উপায়ান্তর না পেয়ে শ্রম বিক্রি করছেন। শ্রমজীবী নারী কাঞ্চনী (৫০) বিধবা হয়েছে প্রায় দেড়যুগ আগে। এক পুত্র ও তিন কন্যা সহ পুরো পরিবারের ব্যয়ভার তার। রাস্তার মাটিকাটার কাজ করত সে। কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন আর এ কাজ করতে পারেনা। এখন সে বিভিন্ন মৌসুমে ক্ষেত খামারের কাজ

করে থাকে। প্রতিদিন কাজ পায়ও না। কাজ পেলে অনাহারেই দিন কাটে তাদের। সে বলে - "যে কয়ডা টাহা পাই তা পেডে দিমু না শইল্লে দিমু না পোলাপাইনগো খাওয়ামু ?" আবেদা ও কাঞ্চনীদের মত এ অবস্থা প্রায় সব নারী শ্রমিকেরই। তাদের সবার পাওয়া না পাওয়ার কথাই একটা জায়গায় এসে থেমে যায় বাচতে হবে যে !

১৪৮) মোরেলগঞ্জে ঝুঁকিপূর্ন শিশু শ্রম বাড়ছে দিনদিন/ ব্যহত হচ্ছে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য
মাসুমা আক্তার রুনু (বাগেরহাট):

বাগের হাটের মোরেলগঞ্জে ঝুঁকিপূর্ন কাজে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বাড়ছে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেও অধিকাংশ শিশু বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার আলো থেকে। অভাবের তাড়নায় মূলত এরা ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে শ্রমে আত্মনিয়োগ করছে। দেখা গেছে অধিকাংশ শিশুর বয়স ৭-১৫ বছরের মধ্যে।

উপজেলা সদর সহ সবকটি ইউনিয়নের বাজার গুলোতে নানা ধরনের পেশায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছে শিশুরা। দরিদ্র পিতামাতার অভাবের সংসারে অর্থের যোগান দিয়ে যাচ্ছে ৭-১৫ বছরের কমপক্ষে ২ হাজার শিশু। কামাল (১০), বাহার (৮), রাসেল (১৩), ছোটন (১২), রিয়াজুল (১৫), ছোটকু (৭), মুন্নি (৯), কারিমা (৭)-এসব শিশুরা ওয়ার্কশপে ইটভাটায়, ইট পাথর ভাঙ্গা, গাড়ির হেলপার, রিক্সা ভ্যান চালানো, মুদির দোকান, ফেরিকরা, বাড়িতে কাজ সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে উপার্জন করছে।

একইভাবে নিয়জিত একজন বয়স্ক কর্মচারির দৈনিক বেতন ১২০-১৫০ টাকা। পক্ষান্তরে একজন শিশু শ্রমিক পায় ৩৫-৫০ টাকা। অল্প টাকায় অধিক খাটানো যায় বলে অনেকেই শিশু শ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে আগ্রহী এবং সামান্য অপরাধেও তাকে শারীরীকভাবে নির্যাতন করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিশুরা প্রতিবাদী হয়না বলে সুবিধা অনেক। শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় সব দুঃখ মেনে নিতে বাধ্য হয়।

কর্মরত শিশুর অধিকাংশই দরিদ্র দিনমজুর পিতা মাতার সন্তান। একদিন কাজ না করলে তাদের দু'বেলা খাবার জোটেনা। অনেক সময় উপোষ থাকতেও হয়। তাই দরিদ্র পরিবারের বেশিরভাগ শিশু অভাব ও অর্থের মোহে পড়ে অর্থ উর্পাজনে চলে যায়।

বারইখালী গ্রামের সাত বছরের শিশু কন্যা কারিমা আক্তার প্রতিবেশিদের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে। মাঝে মধ্যে স্কুলে যায় সে। তবে নিয়মিত না।

কারিমার বাবা দুলাল শেখ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। সংসারে উপার্জনক্ষম দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। নিরুপায় হয়ে গৃহপরিচারিকার কাজ নিয়েছে মা পারুল বেগম। তার পক্ষে সম্ভব হয়না সবার অন্ন সংস্থানের। তাই কারিমাকে ১০০ টাকা বেতনে কাজ দিয়েছে অন্যের বাসায়।

অভিভাবকহীন অনেক শিশু টোকাইয়ের কাজ করে সারা শহর ঘুরে। রাজমিস্ত্রির কাজে আছে অনেক শিশু। উপজেলায় পুরানো মালপত্র কেনার নামে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ভাংগারী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় ও বহিরাগত এসব ব্যবসায়িরা উপজেলা সদর, বাজারে নিকটবর্তী এলাকায় দোকান ভাড়া নিয়ে চালাচ্ছে এ ব্যবসা। ব্যবসায়িক স্বার্থে তারা এলাকার দরিদ্র, দিনমজুর, অসহায় পরিবারের শিশুদের লাগাচ্ছে এ কাজে। বিনিময়ে এদের দেয়া হয় ১০-৩০ টাকা পর্যন্ত। আবার কখনও কখনও দু' চার পিচ পাপর ভাজা। এ লোভে শিশুরা নেমে পড়ছে ভাংগারি কুড়িয়ে অর্থ উপার্জনের কাজে। উপজেলা সদরের নিকারী পাড়ার বাদশা সেখ (৪০) এর পুত্র বাহার (১০)ভাংগারি কুড়িয়ে সংসারে অর্থের যোগান দিচ্ছে। স্কুলে যাবার সুযোগ কখনও তার হয়নি। বাহার ও কারিমার মত অনেক শিশু অর্থ উপার্জনের জন্য পড়াশুনা বাদ দিয়ে কাজে নেমে পড়েছে। ফলে ব্যহত হচ্ছে সরকারে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। ঘটছে সম্ভাবনাময় কিছু মেধার মৃত্যু। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষককের আন্তরিকতা।

১৪৯) মোরেলগঞ্জে নারী নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে

মাসুমা আক্তার রুনু (বাগেরহাট):

বাড়েরহাটের মোরলগঞ্জে নারী নির্যাতনের ঘটনা দিনদিন বেড়ে চলছে। অসচেতনতা ও আইনের প্রয়োগ না থাকায় ছোঁয়াচে রোগের মত প্রতিটি নারী কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকে আত্মহত্যার মত পথও বেছে নিচ্ছে। অধিকাংশ ঘটনায় স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে স্ত্রী। স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ভুক্তভোগী পরিবারের সাথে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গত সাত/আট মাসে মোড়েলগঞ্জে ধর্ষন, খুন, মারপিটের শিকার হয়েছে দুই শতাধীক নারী। মারপিটের কারনে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে ৭০-৮০ জন। যাদের বয়স ১২-৭০ বছর। আত্মহত্যা করেছে ৪০ জনেরও বেশি। কমপক্ষে ১৫ জনকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে প্রচার করা হয়েছে এবং অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড হয়েছে। ঘাতকরা পুলিশের সাথে আতাত করে অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করায় বেশিরভাগ মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে মৃতার মস্তিস্ক বিকৃত ছিলো। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে ১০ আগস্ট ২০০৭ বিকেলে উপজেলার বনগ্রাম গ্রামে। যৌতুক লোভী স্বামী ও শাশুড়ির নির্যাতনে মৃত্যু ঘটেছে সবিতা রানী দাস (১৯) নামে একজন অন্তসত্ত্বা নারীর।
বনগ্রামের মৃত রাখাল চন্দ্র দাসের ছেলে গোবিন্দ দাস (৩২) এর সাথে দেড় বছর পূর্বে বিয়ে হয় যশোর সদরের মালঞ্চ গ্রামের গোপাল কুমার সরকারের মেয়ে সবিতা রানীর। বিয়ের কিছুদিন পর তার স্বামী ২৫,০০০ টাকা যৌতুক দাবী করে। সবিতা দিতে অস্বীকার করলে তার উপর শুরু করে শারীরীক ও মানসিক নির্যাতন। ঘটনার দিন এ টাকার দাবীতে ঝগড়া ঝাটির এক পর্যায়ে সবিতাকে বেধড়ক মারপিট করে স্বামী গোবিন্দ দাস ও শাশুড়ি। ঘটনা স্থলে সবিতা মারা গেলে স্বামী ও শাশুড়ি বাড়ি ছেড়ে পালায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে বাগেরহাট হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

এ উপজেলার রানী (৩০) ও আনোয়ারা বেগম (৪৫) নামে দুই গৃহবধুর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। ১৬ এপ্রিল জামিরতলা গ্রামে ধর্ষিত হয়েছে এক নববধূ। এ ঘটনায় সে নিজেই বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা সত্বেও ৭/৮ দিন ঘুরিয়ে পুলিশ শেষ পর্যন্ত মামলা নেয়নি। জুয়াতলী গ্রামের হাসেম আলী ফকিরের ছেলে ফারুক ফকির (৩৫) তাকে ধর্ষন করে বলে অভিযোগে বলা হয়েছিলো।
২৩ মে রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের কাসলা গ্রামে নবম শ্রেনীর এক স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর অভিযোগে পুলিশ একই গ্রামের শামীম হোসেন (২৫) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করলেও চার পাঁচ ঘন্টা পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।
২৫ জুলাই গুলিশাখালী গ্রামে মহিদুল ইসলামের কন্যা ৫ম শ্রেনীর ছাত্রী তানিয়া আক্তার (১২) পারিবারিক কলহ ও শারীরীক নির্যাতনের কারনে নিজ গৃহে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।
২৫ জুলাই ভাইজোড়া গ্রামের সুমা বেগম নামের এক গৃহবধূকে হত্যা করে স্বামীর বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনার পর সুমার স্বামী বনী আমিন (৩০) পলাতক। এ ঘটনায় অপমৃত্যর মামলা রেকর্ড করা হলেও আত্মহত্যার কোনো অলামত পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ১৪ এপ্রিল সালমা আক্তার (১৩) কে বারই খালী গ্রামের জাকির হোসেন (২৫) নামে এক যুবক ভুল বুঝিয়ে নিয়ে যাবার সময় লাফিয়ে পড়ে গুরুতর আহত হয় ৭ম শ্রেনীতে পড়ুয়া সালমা। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকলেও তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে সালমার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগার কারনে মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

(ছবি আছে)

১৫০) বাগেরহাটে নারী শ্রমিকরা অবহেলিত ।

মোঃ আলমগীর হোসেন (বাগেরহাট):

বাগেরহাট বিসিক শিল্প নগরীতে কর্মরত নারী শ্রমিকরা অবহেলার শিকার । তারার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেনা । ফলে সংসার সন্তান নিয়ে তাদের কোনোভাবে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে । তাদের মজুরী কিছুটা বাড়িয়ে দিলে তারা সবদিক থেকে একটু ভাল অবস্থানে থাকতে পারবে বলে মনে করছেন তারা ।

বাগেরহাট বিসিক শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১ মার্চ ১৯৮৬ সালে । এখানে মোট ৪৫ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চালু আছে ৩০ টি । এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করা নারী শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ১৮০ জন । কঠোর পরিশ্রম করেও তারা ন্যায্য মজুরী পাচ্ছেনা । কহিনুর (৩৫) জানান, নির্ধারিত সময়ের পরেও তাদের দিয়ে কাজ করানো হলেও তারা মজুরী পায়না । একই কাজে পুরুষ শ্রমিকরা মজুরী পায় তাদের থেকে অনেক বেশি । রাজিয়া আক্তার (২৫) জানান পাঁচ বছর যাবৎ তিনি এখানে নারকেল থেকে তেল উৎপাদন কারখানায় কাজ করছেন । তার স্বামী রিক্সা চালক । ছেলে শাহীন তাকে সাহায্য করা ও ছোট বোনকে দেখাশুনা করার জন্য তার সাথে মিলে আসে । প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধা ৭ টা পর্যন্ত কাজ করে এখানে । ১১ ঘন্টা কাজ করে ৪০০-৫০০ নারকেলের ফালা তুলতে পারে । ১০০ নারকেলের ফালা তুলতে পারলে পায় ৭-৮ টাকা । যা পরিশ্রমের তুলনায় একেবারে কম । এ টাকায় তার সংসার চালানো দায় । কিন্তু রাজিয়া বলেন-“আমাদের উপায় নেই, কম দেলেও এ কাম করা লাগবে এইডা মালিক বোঝে ।”

পারভীন (৩০) জানায়, কোনো শ্রমিক অসুস্থ হয়ে গেলে মালিকের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়না বেশির ভাগ সময় । যদিও বা পাওয়া যায় তবে সুস্থ হয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করে ঐ পরিমান কাজ উঠিয়ে দিতে হয় । এ ব্যাপারে একজন মালিক বলেন- “এখানে অনেক এনজিও স্বাস্থ্য সেবা দেয়, শ্রমিকরা এ সুবিধা পায় ।” কিন্তু শ্রমিকরা জানান, তারা কখনই কোনো এনজিওকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে দেখেনি ।

এখানে যে সব নারীরা কাজে আসে তাদের অনেকের সাথে ছোট ছেলেমেয়ে থাকে । ওদের রাখার জন্য আলাদা কোনো ঘর না থাকায় এ নোংরা পরিবেশে থেকে অনেক অসুখে ভোগে বলে জানিয়েছেন নারী শ্রমিক ময়না বেগম । তিনি আরও জানান, এখানে তারা পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা মাঝে মধ্যে লাঞ্চনার শিকার হন । লায়লা (২৩) বলেন -“একটু কামে এদিক সেদিক হইলেই মালিক আমাদের মত শ্রমিক বাদ দিয়া অন্য মানুষ রাখে, এ জন্য ভয়ে থাকি ।” আরও কয়েকজন নারী শ্রমিক জানান মালিকদের খেয়াল খুশিমত তাদের চলতে হয় । এদিক সেদিক হলেই চাকরি চলে যাবে বলে হুমকী দেয় । মজুরী নিয়ে কথা বলে অনেককে এ কাজ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে ।

বিসিক শিল্প নগরীর উপ-ব্যবস্থাপক মোঃ সাখাওয়াত হোসেনের কাছে নারী শ্রমিকদের বেতন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন-“এটা মিল মালিকদের দায়িত্ব, আমরা কিছু জানিনা ।”

১৫১) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্নের সন্ধানে ওরা সুন্দরবনে

ফারজানা জেমিন স্মরনী (বাগেরহাট):

“ইস্কুলে গ্যালে খামু কি, ইস্কুল কি আমাগো ভাত দেবে? হ্যার চাইতে জঙ্গলই ভালা । কাঠ টোহামু, মাছ ধরমু, বেইচচা চাউল কিনমু”- কথাগুলো কেবল সুন্দরবনের শিশু শ্রমিক জামাল হোসেন (৯) এর একার নয়, বাগেরহাটের সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা শিশু শ্রমিকদের প্রত্যেকের কণ্ঠেই এ কথার

প্রতিধ্বনি। ওরা সত্যিকারের জলে কুমির আর ডাঙ্গায় কুমিরের সাথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাছ ধরা , কাঠ কাটার কাজ করছে। পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অভাবে এসব শিশুরা স্রেফ দু' মুঠো ভাতের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ন শ্রমে জড়িয়ে পরছে। তাদের বয়স ৭ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। এ বয়সের অন্য শিশুরা যখন বই খাতা নিয়ে স্কুলে যায় ওরা তখন ভয়ঙ্কর সুন্দরবনে অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়ায়।

জানা গেছে, কেবলমাত্র বাগেরহাটের সুন্দরবন সংলগ্ন শরনখোলা উপজেলার গুলিশাখালী, গাবতলী, রাজেস্বর, বগী, চালিতাবুনিয়া, সোনাতলা প্রভৃতি ছয় শতাধীক শিশু মাছ ধরা, কাঠ কাটা, বরশী পাতা, পোনা ধরা, ট্রলার চালানো, গোলপাতা, গড়ান, নল সংগ্রহ, মধু সংগ্রহের মত ঝুঁকি পূর্ন কাজে জড়িত। তারা দিনভর শ্রম দিয়ে পায় ২০- ৪০ টাকা। খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগা তারপর সন্ধায় ঘরে ফেরা এই তাদের দিনলিপি। দিনলিপিতে কোথাও নেই খেলাধূলা, কিংবা স্কুলে যাওয়া।

বনের সীমানা থেকে মাত্র পাঁচশ গজ দূরে খুড়িয়াখালীগ্রামের পাউবো ভেড়িবাধের উপর কুঁড়ে ঘরের ছিন্নমূল পরিবারের শিশু রিয়াদুল (১৫)। মা, দুই ভাই আর দুউ বোন নিয়ে তাদের পাঁচ জনের সংসার। বাবা সেই ১৩ বছর আগে সামান্য জ্বরে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। মা মনোয়ারা বেগম স্বামীর মৃত্যুর পর চার সন্তান নিয়ে পথে নামে। রিয়াদুল নয় বছরে পা রাখতেই সংসারের ঘানি এসে পরে তার কাধেঁও। বাঘ কুমিরের মুখে জঙ্গল নদীতে কাঠ কুড়ানো, কাঠ কাটা, পোনা ধরা, মাছ ধরা কখনও নৌকায় হেলপার হিসেবে কাজ করা এসবই করে সে।

তেরাবেকা গ্রামের নয় বছরের মামুনের বাবা নেই। ওয়াপদা ভেড়িবাধে তার বাস। সকালে উঠে পাশের মরা ভোলা নদী সাঁতরিয়ে বনে যায়। এক আটি কাঠ কুঁড়ায়ে আবার নদী পার হয়ে ফিরে আসে স্থানীয় বাজারে। সে কাঠ বিক্রি করে ১৫/২০ টাকা যা পায় তাই তাদের সারাদিন চলার সম্বল।

শিশু শ্রমিক তাহের (৯), নাসের (১২), রাসেল (৮), রিয়াজুল (১৫), পারভেজ (১১), কামাল (১২) এরা সকলেই হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। বনে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই বাঘ, করি, সাপের হাতে জখম হয়েছে, কেউ কেউ হয়েছে নিহত। ৫ ফেব্রুয়ারি বগী গ্রামের খালেক মিয়ার ছেলে কামরুল (১৪) বনের সুপতি এলাকায় এবং ২৫ সেপ্টেম্বর খুড়িয়াখালীর আশরাফ আলীর ছেলে রাসেল (১৩) দুধমুখী এলাকায় মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের কবলে প্রান হারায়। এ গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে জাহাঙ্গীর বনের ডোরা এলাকায় নিহত হয় সাপের ছোবলে।

মরা ভোলার শিশু শ্রমিক ডালিমের ভাষায়-"কুমিরে সাপে অহরহ আমাগো সাথীরে মাইরা ফালাইতাছে। কিন্তু কি করমু, প্যাডের দায়ে জঙ্গলে যাই।"

মশা মাছির কামড়, পচা লতাপাতার বিরূপ আবহাওয়া, হারভাঙ্গা খাটুনির ফলে শ্রমজীবী শিশুরা ক্রমে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। তারা নানা ধরনের চর্ম রোগ ও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। শিক্ষার কোনো সুযোগ তাদের মিলছেনা। অসামাজিক ও নোংরা পরিবেশে বাস করে বড় হয়ে এসব শিশুরা অসামজিক কর্মকান্ডের দিকে ধাবিত হয়। জানা গেছে শরনখোলায় বনদস্যু হিসেবে এ পর্যন্ত যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাদের অনেকেই সুন্দরবনে শিশু শ্রমিকের কাজ করত।

সুন্দরবনের শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য অসহায় পরিবারগুলোর পূর্নবাসনের পাশপাশি শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য অথবা মজুরী কর্মসূচি চালু করা দরকার বলে মনে করছেন সংশ্লিস্টজন।

১৫২) বাগেরহাটের চিংড়ি চাষে শিশু শ্রমিক

আবু বকর সিদ্দিক অপু (বাগেরহাট):

অভিভাবকদের উদাসীনতা ও মালিক পক্ষের আন্তরিকতার অভাব থাকায় বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি চাষে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চরম দারিদ্র ও শিশু শ্রম আইনের বাস্তবায়ন না থাকার কারনে এ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে ভুক্ত ভোগী ও সংশ্লিষ্টজন জানিয়েছেন। এ ধরনের শিশু শ্রম প্রতিরোধে দু'একটি এনজিও কাজ করলেও আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছেনা।

দেশে শিশুদের জন্য আইন থাকলেও তা থাকছে শুধু কাগজে কলমে। ফলে ঝুঁকিপূর্ন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। উপকূলীয় জেলা হিসেবে চিহ্নিত বাগের হাট জেলার ঝুঁকিপূর্ন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অগনিত। চিংড়ি অধ্যুষিত এ এলাকায় দিন মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরা চিংড়ি ঘেরে শ্রম দেয়।

চিংড়ি ঘেরে খাবারের জন্য বিলে শামুক কুড়ানো ও শামুক ভাঙ্গার কাজে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুরা অনেকে দরিদ্র পিতামাতার সহযোগী হিসেবে কাজ করে। বটতলা এলাকার শিশু শ্রমিক তাহমিনা আক্তার জানায় তাদের এলাকায় আয়ের উৎস মৎস চাষ। মৎস চাষের মধ্যে প্রধান হল চিংড়ি চাষ। এ চিংড়ির চাষের জন্য মাছের খাদ্য আহরন করতে হয়। এ কাজে শিশু শ্রমিকরা বেশি প্রাধান্য পায়। চিংড়ি চাষীরা কম মজুরীতে শিশুদের ব্যবহার করতে পারে বলে শিশুদের কদর বেশি। চিংড়ির খাবারের জন্য শিশুরা বিলে গিয়ে শামুক কুড়ায় এবং নিয়ে এসে সে শামুক ভাঙ্গতে হয়। এতে তাদের হাতে পায়ে চুলকানি, পাঁচড়া, চর্মরোগ, ক্ষতের সৃষ্টিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

এরকম একজন শিশু বিলকিস (৯)। সে বলে- "শামুক কাটার পর শামুকের হাতে লাইগা থাকে। কিছুতেই যায়না। হাত দিয়ে খাবার খাইতে গেলে গন্ধে বমি হয়। কতদিন হইছে প্যাট ভইরা ভাত খাইতে পারিনা।" এত কষ্ট করেও ওরা মহাজনের কাছ থেকে ন্যায্য মজুরী পায়না। সারাদিন কাজ করে ২০-২৫ টাকা পেলেও কোন রকম এদিক সেদিক হলে মার খেতে হয় প্রতিনিয়তই। এনজিও সূত্রে জানা যায় জেলার ৫ টি উপজেলা বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, কচুয়া, চিতলমারী ও মোড়েল গঞ্জ উপজেলার মোট ২১৮ জন শিশু শামুক সংগ্রহ ও ভাঙ্গার মত ঝুঁকিপূর্ন শ্রমে নিয়োজিত। এসব শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে এনজিওগুলো সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১৫৩) মংলা বন্দরের সিগনাল টাওয়ার বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রা

মহিউদ্দিন আহমেদ (বাগেরহাট):

দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর মংলার প্রানকেন্দ্রে আবস্থিত সিগনাল টাওয়ার এলাকার বস্তির নারী ও শিশুরা বসবাসের জন্য নামমাত্র একটু বাসস্থান পেলেও তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার বঞ্চিত। দারিদ্রতা, সংসারে পুরুষদের দায়িত্বহীনতা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবই মূলত এর জন্য দায়ী।

সিগনাল টাওয়ার বস্তিতে অর্ধশতাব্দী যাবত বসবাসকারী প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের বাস। এ বস্তির নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। অধিকাংশ লোক খোলা পায়খানা ব্যবহার করে। পানীয় জলের নেই কোনো সুব্যবস্থা। প্রায় এক মাইল দূরের একটি পুকুরের পানি এরা পান করে। ফলে প্রায়ই তার পেটের পীড়ায় ভোগে। আর রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসারও তেমন কোনো সুব্যবস্থা নেই। সূর্যের হাসি চিহ্নিত পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহের রবিবার এখানে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের প্রশ্ন করা হলে তারা জানান, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে এ বস্তির নারী ও শিশুরা তাদের কাছে কম আসে। কিন্তু বস্তিবাসী আমেনা (৩০) বলেন-"এরা তো শুধু ঔষদের নাম কইয়া দেয়। ঔষধ কিনতে টাকা লাগেনা, টাকা পামু কই?"

এখানকার লোকজন জন্ম নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে অসচেতন। কালাম ও হাজেরা বিবি ২০ বছরের সংসারে এক ছেলে ও সাত মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স ১৮ আর ছোটমেয়ের বয়স সাত। এ বিষয়ে হাজেরা বিবি বলেন- "হুনছি ঐডা (জন্মনিয়ন্ত্রন) হারাম কাজ, তাই করিনাই।" আর কালা, বলেন-"রিজিক দেওনের মালিক তো আল্লা, আমার কি করার আছে।"

এ বস্তির অদূরে একটি হাইস্কুল থাকলেও মংলার অন্যান্য স্কুলের তুলনায় এর অবস্থা নাজুক। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমরেন্দ্রনাথ ৯৫৮) এর সাথে কথা বলে জানা যায়, স্কুলের বেতন আদায়ের হার খুব কম। এর কারন মূলত আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা। ঝরে পড়া ছেলেমেয়েদর সংখ্যা অনেক। বেশির ভাগ ছেলে মেয়ে ৫ম থেকে ৮ম শ্রেনীর মধ্যে ঝরে পড়ে। ছেলেদের ক্ষেত্রে এ হার বেশি। কারন দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা স্কুলে না এসে শ্রমের মাধ্যমে রোজগার করে।

এ বস্তির স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আরও বেশি চিকিৎসা সেবা দেয়া, স্কুলে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা চালু করা ও পানি সমস্যা মেটাতে টিউবয়েল স্থাপন জরুরী বলে মনে করছেন ভুক্তভোগীসহ সংশ্লিষ্টজন।

১৫৪) ঠোঙ্গা বানাইয়ে আর বৃত্তিপাওয়া ছেলেডারে পড়াইতে পারমুনা

নন্দ কিশোর চক্রবর্তী পার্থ (বাগেরহাট):

"করুনা চাইনা, কর্মসংস্থান চাই"- ঠিক এরকম বলছিলেন বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের দুই সন্তানের জননী মৃত গোবিন্দ দাসের স্ত্রী ইলা রানী দাস (৩৫)।

৬ মাস পূর্বে স্বামী গোবিন্দ দাস মারা যায়। কিন্তু থেমে থাকেনি ইলারানীর জীবন। টেলেন্টপুলে বৃত্তি পাওয়া সন্তান সজল (১১) এবং দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্র উৎপল (১৮) এ দুজনের পড়ার খরচ চালিয়ে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। কিনতে পারছেন না মেধাবী ছেলে সজলের বই। আয় মাত্র ৩০-৪০ টাকা দৈনিক, যা আসে ঠোঙ্গা বানিয়ে আর শুকনো সুপারি কুচিয়ে। ক্লান্তিতে, কষ্টে হতাশায় বন্ধ হয়ে আসে চোখ। কিন্তু কিছু করার নেই। এ যে জীবন সংগ্রাম।

এত কষ্টের পরও ৩০-৪০ টাকায় সংসার চলেনা, একবেলা খেলে অন্য দুই বেলা সন্তানদের নিয়ে আধপেট খেয়ে কিংবা না খেয়েই থাকতে হয়।

সংসারের এ অবস্থায় বড় ছেলে উৎপল লেখাপড়া ছেড়ে কাজ করতে চাইলেও ইলা রানী ভাবছেন অন্য কথা। তার কথায় -"বড় ছেলেডার আইএ পাশ করলি একটা এনজিওতে ঢুকতি পারবে তাই ভাবতেছি ছোডডারে একটা মিষ্টির দোকারে থোব।" কথা শেষ হতেই অশ্রু সজল চোখে ইলা রানী বলে -"সাহায্য চাইনা, করুনা চাইনা, কর্মসংস্থান চাই।"

১৫৫) বাগের হাটের প্রথম নারী ও শিশুপাচার প্রতিরোধ মতবিনিময় সভা

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক অপু (বাগেরহাট):

১৫ আগস্ট রুপান্তরের উদ্যোগে বাগেরহাট "আস বাংলাদেশ" কার্যালয়ে বিকেল ৪ টায় নারী ও শিশুপাচার প্রতিরোধে সুধিজনদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা পরিষদের সভাপদি তহুরা হোসেনের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন শাপলাফুলের নির্বাহী পরিচালক রেহেনা পারভীন লাকি, প্রধান শিক্ষিকা সেলিনা বেগম, মহিলা নেত্রী শিল্পী জমাদ্দার, পারভীন আহমেদ, রিনা আক্তার, শরীফা খানম, অগ্রযাত্রার সভানেত্রী আম্বিয়া খাতুন প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় বক্তারা নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শহরের ৪০ জন নারী নেত্রী তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। এটাই এ জেলাই নারী ও শিশু পাচার রোধে প্রথম মতবিনিময় সভা।

নারী নেত্রী রেহানা পারভীন লাকি বলেন, ১০ আগস্ট বিকেলে মোরেলগঞ্জের বনোগ্রামের ৬ মাসের অন্তঃসত্বা সবিতা রানী দাস (১৯) এর পেটে লাথি মেরে তার সন্তান নষ্ট করে দেয় তার স্বামী দেবু কুমার

দাস। এরপর চলে তার উপর অমানসিক নির্যাতন। শেষে একপর্যায়ে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সবিতা। সেখানেও সে ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে সবিতার বাবা গোপাল সরকার থানায় অভিযোগ দিতে গেলে পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেনি। মহিলা নেত্রিরা এ ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানান। সভায় বাগেরহাট থেকে শিশু ও নারী পাচার ও নির্যাতন প্রতিরোধে জোর ভুমিকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

(ছবি আছে)

১৫৬) শিশু শ্রমিক ওরা

নন্দ কিশোর চক্রবর্তী (বাগেরহাট):

"আমড়া খান আমড়া, ঝাল মসল্লা আমড়া, ভিটামিন সি যুক্ত আমড়া, কেউ কি নেবেন, হারাদিন প্যাডে ভাত পড়েনাই"- সন্ধ্যার দিকে বাগেরহাট বাস টার্মিনালে দাড়িয়ে এমনি করে আমড়া কেনার জন্য অনুনয় বিনয় করছিলো বরিশালের খলিল শেখের আট/নয় বছরের রিপন। সাথে তার ছোট ভাই চকলেট বিক্রেতা রহিম (৭) এবং পথশিশু চাঁন মিয়া (৯)। এদের মধ্যে রিপন ও রহিমের বাবা বাগের হাটে রিক্সা চালালেও চাঁনমিয়ার বাবা থাকে বরিশালের তুষখালী গ্রামে, পেশা সাগরে মাছ ধরা।

রিপন জানায় তার বাবা প্রায়ই অসুস্থ থাকে রিক্সা চালাতে পারেনা। তাই তারা দু ভাই মিলে যা কিছু পায় তা তুলে দেয় মায়ের হাতে। অভাবের সংসারে কোনোদিনই পড়ালেখা হয়ে ওঠেনি। ছোট ভাই রহিম মাঝে মাঝে স্কুলে ভর্তি হওয়ার কথা বললে তার মা ধমকে ওঠে ছেলেকে বলে জানায় তারা। ভাল কিছু খাবার খাওয়া তাদের হয়না। কোনো রকম চাল আর ডাল হলেই হয়ে যায়। দুপুরে কি দিয়ে ভাত খেয়েছ রহিমকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে "ডাইল দিয়া ভাত খাইছি, মায় কইছে রাইতে আলু রানবে "। ওরা জানায় দৈনিক ২০-৩০ টাকা আয় করলে ওরা অন্ত:ত একবেলা খেতে পারে তা না হলে পুরোদিনই উপাস।

চাঁন মিয়ার থাকার কোনো নির্ধারিত জায়গা নেই। সে যে হোটেলে কাজ করে সেখানে ঘুমায় আবার কখনও বাস স্টেশনেও ঘুমায়। এ বাস স্টেশনের এক হোটেলেই সে কাজ করে। তার বাবা মার কাছে যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু তারা তাকে নিতে আসেনা বলে চাঁন মিয়ার অনেক ক্ষোভ। সে অশ্রু সজল কণ্ঠে বলে ওঠে -"আমার বাপ মা আছে আর মুই চান মিয়া হোটেলে থালাবাসন ধুই, বেতন পাইনা প্যাটে ভাতে থাক্কি। আমার কেউ নাই লাথি গুতা খাইয়া মানুষ হচ্ছি।"

এ শিশুদের সাথে কথা বলে জানা গেল স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও অভাবের কারনে আজ তারা রাস্তায়। তারা জানায় তাদের মত অনেক শিশু বাগের হাটে বিভিন্ন জায়গায় লেদ মেশিন, চামড়া শিল্প, চিংড়ির ডিপো, ওয়েলডিং, বরফমিল প্রভৃতি স্থানে কাজ করছে। এসব শিশুর ভবিষ্যত কি তারা জানেনা। শুধু জানে বেঁচে থাকতে হলে কাজ করতে হবে।

(ছবি আছে)

১৫৭) শরীফের জীবন চলা

আবু বকর সিদ্দিক অপু (বাগেরহাট):

দারিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ন শিশু শ্রমের করাল গ্রাসে মানবেতর জীবন যাপন করছে অনেক হত দরিদ্র পরিবার। এ রকম অন্ধকার জীবন পথের উদ্দেশ্যহীন এক পথিক শরীফ শেখ (১৩)। বাগেরহাট জেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের কেআলী দরগাহ্ এলাকায় তার বাস। বাবা হেমায়েত শেখ ও মা তানজিলা বেগম। শরিফের বয়স যখন চার তখন তার বাবা তা মায়ের বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তখন থেকেই হেমায়েত শেখ তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের আর কোনো খোঁজ খবর নেন নি। এদিকে

তানজিলা বেগম তার সন্তানদের নিয়ে স্বামীর আধা কাঠা জায়গায় থেকে যায়। নিজের ও সন্তানদের ভরন পোষনের জন্য তানজিলা প্রতিবেশিদের বাড়িতে কাজ করে। অন্যের বাড়িতে কাজ করে চারটি মানুষের অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করতে হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে শরীফ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে কিছু করার চিন্তা করে। সে রাজমিস্ত্রীর যোগাল (সহায়তাকারী) হিসেবে যোগ দেয়। সিমেন্ট বালু মেশানো, নির্মাণ সামগ্রী কড়াই ভর্তি করে মাথায় বহন করে প্রতিদিনই ঝুঁকিপূর্ন মই বেয়ে তাকে নির্মাণাধীন ভবনের উপরভাগে ওঠানামা করতে হয়। সিমেন্ট বালির কারনে ঘাড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। দিন শেষে এ শিশুটি মজুরী পায় মাত্র ৩০ টাকা। এখানেও রয়েছে বৈষম্য সেটা কেবল শিশু বলে। দিন শেষে টাকা হাতে নিয়ে কিছু বলেনা শরীফ। কেবল ভাবে এ টাকায় তার ভাইবোনের একবেলা অন্তত খাওয়ার জোগার হবে। ভাইবোনদের পড়াশুনা করাবে এটা তার একমাত্র লক্ষ্য। সে নিজে পড়াশুনা করতে পারেনি। তাই তাকে যোগালির কাজ করতে হয়। তার আশা তার ভাই বোনরা চাকুরী করবে, তাদের অভাব থাকবেনা। শরীফের কথায়- "আর কয়ডা বছর পরই আমি নিজে রাজমিস্ত্রী হইতে পারমু। তহন অনেক টাকা হইবে, টাকা জমাইয়া সবকিছু করমু।" এ সবকিছু কি জানেনা শরীফ।

১৫৮) বগেরহাটের শিশু শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ন কাজে নিয়োজিত

মোঃ আলমগীর হোসেন (বাগেরহাট):

"ইস্কুলে যাইতে মন চায় কিন্তু কাজ না করলে খামু কি"- কথাগুলো বলে শিশু শ্রমিক ইব্রাহিম (১৪)। সে বাদাম বিক্রি করে জীবীকা নির্বাহ করে।

শিশু শ্রমিক মনসুর খা (১০) বাবা জয়নাল খা। বাড়ি পিরোজপুরের নাজিরপুর থানায়। সে কাজ করে বাগেরহাটে একটি ওয়ার্কশপে। যে বয়সে কোমল হাতে থাকবে বই আজ সে হাতে লোহা পেটাচ্ছে সে, ওয়েলডিং এর মত ঝুকিঁপূর্ন কাজ করছে। চোখের পানি ফেলছে বাবা মায়ের কাছে যাবার জন্য। বাবা ওর পেশায় দিনমজুর। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সে মেঝ। সংসারে অভাবের কারনে লেখাপড়া বাদ দিয়ে কাজে এসেছে সে। তার মনে স্বপ্ন জাগে বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাবে, খেলবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজ শুরু, রাত ৮ টা পর্যন্ত চলে কাজ। দীর্ঘ সময় কাজ করে মাসে মজুরী পায় পাঁচশত টাকা আর তিন বেলা খাওয়া। কাজে সামান্য ভুল হলে মালিকের কাছে বকুনি শুনতে হয় আর খেতে হয় মার। নিরবে সব সহ্য করতে হয় চাকুরী চলে যাবার ভয়ে।

শামীম (১০) সে দেড় বছর যাবৎ একটি চায়ের দোকানে কাজ করছে। তৃতীয় শ্রেনী পযর্ন্ত পড়াশুনা করেছে সে। ইচ্ছে থাকা সত্বেও অভাবের কারনে পড়ালেখা ছেড়ে কাজে আসতে হয়েছে। একদিকে মালিকের গালাগালি অন্য দিকে কাস্টমারের বকাবকিও শুনতে হয় তাকে। নেই কোন বিশ্রামের সময়। খাবার সময়ে যাও একটু সময় পাওয়া যায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। চায়ের দোকানের মালিকের কাছে জানতে চাইলে বলে- "কোন নির্যাতন করা হয়না যথেষ্ট বিশ্রামের সময় দেয়া হয়।"

অভিভাবকদের অসচেতনতার কারনে শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা হয়না। দর্জির দোকানে কাজ করে রুস্তম (১৩)। তার বাবা সেকান্দার আলী বলেন - "ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করানোর ইচ্ছে থাকলেও টাকার অভাবে পড়াতে পারছিনা। বড় ছেলে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ার পর স্কুলের বেতন বই কেনার টাকা যোগার করতে না পারায় এবং সংসারের অভাব ঘোচানোর জন্য ছেলেকে দোকানের কাজে নিয়োজিত করেছি।"

ছেলে শিশুদের পাশাপাশি মেয়ে শিশুরাও যুক্ত হচ্ছে শ্রমে। তবে তারা বেশিরভাগ গৃহস্থলির কাজ ও বাসাবাড়িতে কাজ করে। সালমা (১৩) জানায়, তার মা তাকে পড়াতে চায়না। সালমার কথায় –"মা কয় তুই মাইয়া তোর পড়ার দরকার কি?" আবার স্বপ্না (১২) কাজ করে গৃহপরিচারিকার। সারাদিন কাজ করে রাতে ঘুমাতে যায় বাবা মায়ের কাছে। সে জানায়, সে যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ির গৃহকর্তী তাকে অনেক মারধর করে। কিন্তু তারপরও সে কাজ ছাড়েনা। ওখানে কাজ করে সে ২০০ টাকা পায়। এ দিয়ে অসুস্থ মায়ের ঔষধের জোগার হয় বলে।

শিশু শ্রমিক আসলাম (১৫) জানায়, কাজ করতে এসে তার পরিচয় হয় কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ীর সাথে। তারা তাকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সাথে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। এক সময় সে তাদের সাথে মাদকদ্রব্য বহনের মত ঝুঁকিপূর্ন কাজ করতে শুরু করে। এখন সে এ কাজেই আছে। ইব্রাহিম মনসুর, শামীম, সালমা, আসলামের মত অনেক শিশু বাগেরহাটে নানা পেশায় আছে। তারা শৈশবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। পারেনি সহপাঠিদের সাথে স্কুলে যেতে, খেলতে। এত কম বয়সেই তাদের বইতে হচ্ছে সংসারের বোঝা। বাগের হাটের শিশু শ্রমিকদের নিয়ে কথা হয় এখানকার পৌরচেয়ারম্যানের সাথে। তিনি বলেন-"শিশুদের পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করে শিশু শ্রম বন্ধ করতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি শিশু শ্রম নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সচেতনতার প্রতি গুরুত্ব দেন।

১৫৯) মাত্র নয় মাসে ভেঙ্গে গেল সালমার স্বপ্ন।

এস আরিফ (বাগেরহাট):

যে মেয়েটি ঘুরে বেড়াতো মনের আনন্দে, যেখানে খুশি যেত পারত। বন্ধুদের সাথে গল্প করে বেড়াত, খেলত হঠাৎ সে মেয়েটি বড় হয়ে গেল। বুদ্ধিমত্তায় বড় হয়নি বড় বড় হয়েছে দায়িত্বের দিক থেকে। ওর নাম সালমা। বয়স আনুমানিক ১৫ বছর হবে। এ বয়সেই তার মাথায় চেপেছে সংসারের দায়িত্ব। কিন্তু কিভাবে সামলাবে সে?

বিয়ে হয়ে গেল সালমার। নয়মাস সংসার করল। তারপরই হঠাৎ এটি সার্টিফিকেট তার বাকী জীবনাটে অন্ধকারের পথ দেখাল। সে সার্টিফিকেটটি ছিলো তালাকনামা।

সালমা পিরোজপুর জেলার কাউখালির ব্যাকোটিয়া গ্রামের বাবুল শেখের মেয়ে। অনেক সখ করে তার বাবা মা তাকে বিয়ে দিয়েছিলো বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার সম্মানকাঠি গ্রামের সহিদ সেখ (১৯) এর সাথে। ২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় সহিদের বাবা সামছু শেখ জানান তার ছেলের বয়স ১৯ বছর। কিন্তু কাজী লিখেছে ২৬ বছর। আর মেয়ের মা মেয়ের বয়স বলেছে ১৮ বছর। কাজী লিখেছে ১৯ বছর। এ বিয়ের কাজী কচুয়া থানার আর্শাদ আলী খানের পুত্র আঃ মান্নান খান। এদের বিয়ের পর থেকে গ্রাম্য ও পুলিশি সালিস হয়েছে সাত বার। নয়মাসে সালমা স্বামী কর্তক শারীরীকভাবে নির্যাতিত হয়েছে আট বার। মোবাইল ফোন ধরাকে কেন্দ্র করে সালমার স্বামী তার গায়ে প্রথম হাত তোলে। গত একমাস আগে সালমা খালার বাড়ি পালিয়ে যেতে নিলে সহিদ তাকে ধরে এনে ভর দুপুরে দুই ঘন্টা চম্পল গাছের সাথে বেঁধে রাখে। পরে আশেপাশের লোকজন এসে ছাড়ায়।
এ অত্যাচারের কারন হিসেবে সালমা মনে করে সে তার স্বামীর পছন্দনীয় নয়। তাদের মন মানসিকতায় খাপ খায়না। তাই ১ আগস্ট ২০০৭ বিকেলে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ হয়। এ বিয়ে বিচ্ছেদে যেমন কাজীর তালাক লেখা বাবদ ৩৫০ টাকা আয় হয় অন্যদিকে দুটি জীবনে নেমে আসে করুন ট্রাজেডি। "আমার স্বামী আমারে পছন্দ করেনা, আমি এহন বাপ মায়ের কাছে যামু। এ জীবন দিয়া আমি কি করমু"- আপন

মনে বিরবির করতে থাকে সালমা। যখন সংসার শুরু করারও সময় হয়নি সালমার তখন তার জীবনে যোগ হয়েছে তালাকপ্রাপ্তা খেতাবটি।

১৬০) মংলায় বেড়ে যাচ্ছে নারী শ্রমিকের সংখ্যা

এসএস মহিউদ্দিন আহমেদ (বাগেরহাট):

সমুদ্রবন্দর মংলায় পন্য আমদানী রপ্তানী কমে যাওয়ায় জাহাজী শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। ফলে সংসারের আর্থিক যোগান দেওয়ার দায়িত্ব নারী ও শিশুদের উপর এসে পড়েছে। গত দুই তিন বছরে শহরে অনেক শ্রম সংক্রান্ত পেশায় নারীরা জড়িয়ে পড়েছে। যা এর আগে ছিলোনা বললেই চলে।

যে নারীর স্বামীরা দিনে ৫০০ টাকা আয় করত এবং নারীরা শুধূমাত্র গৃহস্থলীর কাজ করত সেই নারীরাই এখন হারভাঙ্গা খাটুনি খাটছে। নারী শ্রমিকরা মংলা ইপিজেড এর মধ্যকার বিভিন্ন শিল্পে কাজ করছে। এ শিল্পের একজন নারী জরিনা (৩০) জানায় এক সময় তার স্বামী আতাহার আলী জাহাজে ভর্তীআলার কাজ করত। রাতে ডিউটি হলে ৩০০ টাকা আর দিনে হলে ২৫০ টাকা পেত প্রতিদিন। আতাহার আলী এখন বেকার। তাই তাকে শ্রমে নামতে হয়েছে। এখন জরিনা মাসে ১৫০০ টাকা আয় করে আর তার বড় ছেলে রুস্তম (১৪) রিক্সা চালিয়েও কিছু আয় করে। এ দিয়েই তাদের সংসার চলে।

কিছু নারী গৃহপরিচারিকার কাজ করছে। কুলসুম (৪০) ঠেলা গাড়ি ঠেলার কাজ করে। দিনে সে ৭০ টাকা আয় করে। তবে প্রায়াই সে অসুস্থ থাকে।

মংলার নারী শ্রমিকদের আরেকটি প্রধান পেশা বাগদা ও গলদা চিংড়ির পোনা ধরা। নদীতে কারেন্টের টানা জাল ব্যবহার করে তারা এ রেনু ধরার কাজ করে। পোনা ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি করে এদের আয় কখনও ২০০ টাকা আবার কখনও ৫০ টাকা। মংলা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা পোনা ধরার কাজ করে।

মংলা পৌরসভার পার্শ্ববর্তী কাইনমারী গ্রামের লতা (৪৫) বিধবা হয়েছে প্রায় ১০ বছর পূর্বে। তার এক ছেলে এক মেয়ে। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ করেন। এভাবে তার ছেলে এবার এইচএসসি পাশ করেছে। আর মেয়েটি এসএসসি পাশ করেছে।

আর এক নারী শ্রমিক জরিনা বিবি (৪০)। সে বাগদার পোনা ধরার কাজ করত। সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে এখন। তার স্বামী জাহাজে কাজ করত তখন কোনো কাজ করত না। সে আয়ে তাদের সংসার চলত।

এসব নারীরা নানা ভাবে বঞ্চিত। তারা ন্যায্য পারিশ্রমিক যেমন পায়না তেমনি নানা ভাবে নির্যাতিত হয় কর্মক্ষেত্রে। তবুও সংসারের প্রয়োজনে তার এসেছে শ্রমে। নারীদের অনকূল শ্রম ক্ষেত্র নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ এসেছে অনেক নারীর পক্ষ থেকে।

১৬১) কন্যা শিশুদের বাল্য বিবাহের ঘটনা মংলায় নিত্য নৈমেত্তিক ব্যাপার

শাহনাজ আক্তার পলি (বাগেরহাট):

মংলা থানার অভ্যন্তরে বাল্য বিবাহ যেন একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে গেছে। প্রতি নিয়ত মংলা থানার বিভিন্ন এলাকা ও গ্রামগুলোতে কন্যা শিশুদের জোর করে বা তাদের মতের বিরুদ্ধে অভিভবকরা নিজেদের পছন্দসই পাএের হাতে তুলে দেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩১ জুলাই মংলা উপজেলা সোনাইলতলা গ্রামের আফজাল মল্লিক তার মেয়ে ইরানী খাতুনকে ১৮ বছর হওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে

দেন। বিয়ের পড়ান রামপাল উপজেলার ফরহাদ হাওলাদার। এ বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়ের সম্মতি না থাকলেও শুধু মাএ পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়ে রাজী হয়। পরবর্তীতে এ বিয়ে পড়াতে মংলা সোনাইলতলা ইউনিয়নের কাজী অপারগতা প্রকাশ করলে উভয় পক্ষের অভিভাবকগন রামপাল উপজেলার শ্রীতল গ্রামের কাজী ফয়লাহাট কামাল উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ নাজিম উদ্দিন এর মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করেন।

উল্লেখ্য গত ৪ জুলাই মংলা উপজেলার নির্বাহী অফিসার সৈয়দ মেহেদী হাসান উপজেলার সকল কাজী এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সাংবাদিকদের নিয়ে বাল্য বিয়ে রোধ করার বিষয়ে সভা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে মংলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার গত ১০ই জুলাই বেলা ১২ টায় সোনাইলতলা গ্রামে যান। বিকালে ইরানী খাতুনের পিতা আফজাল মল্লিককে পুলিশের হাতে তুলে দেন। একই সাথে রামপালের কাজী মোঃ নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য রামপালের ইউ, এন, ওর কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। পরবর্তীতে ইউ, এন, ও কাজীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন মংলা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে। কাজী মোঃ নাজিম তার কৃতকর্মের জন্য নির্বাহী অফিসারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।

১৬২) একটা সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি

শাহনাজ আক্তার পলি (বাগেরহাট):

ওর কি অবসর আছে ? মনে আনন্দ আছে ? রাতের বেলায় কি নিশ্চিন্তে ঘুম আছে ? না সত্যি করে বললে এসবের কিছুই ওর নেই। ওর আছে শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম ও জীবনের কিছু টুকরো টুকরো স্বপ্ন। লোকমানের বয়স ১৫। বয়সে শিশু হলেও জীবন যাপনে ও মোটেই শিশু হয়ে থাকতে পারে নি। সংসারের প্রতি দায়িত্ব ও স্বপ্ন পুরনের আশা বুকে নিয়ে ওকে দিন কাটাতে হচ্ছে। ওর কথার্বাতা, আচার আচরনে একজন দায়িত্ববান মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এতটুকু মাথায় রাজ্যের চিন্তা। নিজের পড়ার খরচ ও মা বাবাকে দু'বেলা ডাল ভাতের নিশ্চয়তা দেবার জন্য সারাদিন ব্যস্ত থাকা।

মংলা বন্দরের সিগনাল টাওয়ার এলাকায় লোকমানের বাস। বাবা শামসুল হক ও মা জাহানারা বেগমের দারিদ্রের কারনে কোন ছেলে মেয়েকেই তেমন লেখাপড়া করাতে পারেন নাই। কিন্তু লোকমান ছিল ব্যাতিক্রম।

৩ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে লোকমান হলো ৪র্থ সন্তান। খুব ছোট বেলায় স্কুলে গেলেও পরবর্তীতে অভাবের তাড়নায় লোকমানকে স্কুল ত্যাগ করতে হয়। লোকমানের ভাষায়- "মায় কয় ল্যাহা পড়া কইরা কি হইবো। কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নি। সকালে বাদাম বিক্রি ও রুটি বিক্রি করে ক্লাস থ্রি র্পযন্ত পড়াশুনা করি। পরে অবশ্য বাধ্য হয়ে রিক্সার হাতল ধরি।" সে জানায়, সকালে স্কুল হতে আসার পর বিকালে রিক্র্রা চালাতো। তাতে প্রতিদিন প্রায় ৬০/৭০ টাকা পেত। এ ভাবে পঞ্চম শ্রেনী র্পযন্ত পড়াশুনা করে। পরে পঞ্চম শ্রেনীতে সাধারন গ্রেডে বৃত্তি পায়। বৃত্তির টাকা ও নিজের আয়ের একটা অংশ দিয়ে মোটামুটি ভালই চলতো। কিন্তু দুঃভাগ্যক্রমে বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে যাওয়ায় সংসারের অনেকটা চাপ এসে পড়ে তার উপর। তার বোন স্বামী ও ১ সন্তান সহ চলে আসায় তার মাথার উপর বিরাট একটা চাপ পড়ে। মা ও ছোট দুই বোন অন্যের বাড়ীতে গৃহ পরিচালিকার কাজ করে পেটে ভাতের বিনিময়ে। তাই তাকে বাধ্য হয়ে রিক্র্রা চালানোর পাশাপাশি পোনা মাছ ধরতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তাকে রাত ২/৩ টা র্পযন্ত পোনা ধরতে হচ্ছে। তাই পড়ার সময় পায় না। সে বলে-"এত খাটুনির পরও পড়া হচ্ছে না তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আল্লাহ কেন আমাকে এই দুর্বিসহ জীবন দিলো।"

এতটুকু বয়সে এই খাটুনির পর সংসারের বোঝা বয়ে বেড়ানো এই শিশুটির সামনে কি কোন আলো আছে? সুন্দর একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন লোকমান দেখে। সে বড় হয়ে সরকারী কর্মকতা হতে চায়। কিন্তু

তার কোন সম্ভাবনা আছে কি ? এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে এই স্বপ্নের সত্যতা বলার মতো দুঃসাহসই বা কার আছে? তবু এই স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় না । মাঝে মাঝে ফ্যাকাশে হয়ে যায় । তারপরও লোকমান বলে- "বুকে একটা সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি" ।

১৬৩) ভিক্ষা নয় আজ চাই

মিজানুর রহমান সোহান (বাগেরহাট):

মরিয়ম বেগম (৫৫) প্রায় ১৫ বছর ধরে বাগেরহাট শহরে ভিক্ষা করছেন । তিনি জনান, তিন মেয়ে, দুই ছেলে আর পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে এ পর্যন্ত ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন । প্রতিদিন ৭০ থেকে ৮০ টাকা আয় হয় । এ ছাড়া ২/৩ কেজি চালও পেয়ে থাকে । ভিক্ষার জমানো টাকা দিয়ে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন । মরিয়ম বেগম জনান, ভিক্ষার ওপর নির্ভর করে তার পাঁচ জনের সংসার মোটামুটি ভালোই চলে যায় । বাগেরহাট শহরের কাছেই সোনাডাঙ্গা গ্রামে মরিয়ম বেগমের বাড়ি । প্রতিদিন সকাল ৮ টার মধ্যে বাগেরহাট শহরে চলে আসে । সারাদিন বাস স্ট্যান্ড ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর বিভিন্ন বাসাবাড়িতে ভিক্ষা করে বিকেল ৫ টার মধ্যে বাড়ি ফিরে যায় । তার এক মেয়ে আর এক ছেলে স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে । বৃদ্ধ স্বামী মোঃ নজরুল মোল্লা বাসের চাকায় দুই পা হারিয়ে এখন পঙ্গু জীবন যাপন করছেন । মরিয়ম বিবি ভিক্ষা করে স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে । তার শুধু একটাই চিন্তা স্বামীর পা দুটো আর ফিরে পাওয়া যাবেনা । এছাড়া বাড়ি ঘরও নতুন করে ঠিক করেছে এবং অপর মেয়ের বিয়ের জন্য টাকাও জমাচ্ছে । পছন্দমত কাজ না পেয়ে প্রথমে ভিক্ষা করতে শুরু করেছিল । এখন স্বচ্ছলতা এলেও তা ছাড়তে পারছে না মরিয়ম বেগম ।

১৬৪) ঝুকি র্পুন শিশু শ্রম

মোঃ মিজানুর রহমান সোহান (বাগেরহাট):

বাগেরহাটের দশানী গ্রামের মৃতু আব্বাস আলীর ছেলে পলাশ (১২) সারাদিন রিক্সা চলিয়ে সন্ধ্যা বেলায় চাল আলু কিনে বাড়ী ফিরে । অসুস্থ্য মা কোন রকম ভাত ও আলু সেদ্ধ রেঁধে দিবে । এ দিয়েই তাদের আহার শেষ হয় । তার একার রোজগারে চলে মা আর ছোট দুই বোনের সংসার ।

পলাশ জানেনা শিশু শ্রম কিংবা মানবাধিকার কি? পলাশের মত হাজারও শিশু আছে যাদের ছোট কাঁধে ভর করে চলে তাদের সংসার । এখন তাদের সংসার গড়ার সময় নয় । এখন হচ্ছে তাদের জীবন গড়ার সময় । অথচ এ সকল শিশু মা বাবার পাশাপাশি সংসারের হাল ধরতে রোজগারে নেমে পড়ে । জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু ।

পলাশের মতো যে সকল পরিবারে শিশুর কাজ করা একান্ত প্রয়োজন কিংবা সে ছাড়া উপার্জনের বিকল্প কোন পথ নেই সে ক্ষেএে শিশুটিকে কম পরিশ্রমের কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে । কাজের পাশাপাশি তার শিক্ষার বিষয়টি ও নিশ্চিত করতে হবে ।

দরিদ্র, ভূমিহীন, কর্মহীনতা, বন্যা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি কারনে মানুষ প্রতিদিন শহরমুখী হচ্ছে । ফলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েইে চলছে । শিল্প কারখানা গুলোতে শিশু শ্রমিক নিয়োগের আগে শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিধানাবলী মেনে চলা হয় না । ফলে দেখা যায় শিশুটি ৫ ঘন্টার অধিক সময় কিংবা রাএি বেলায় কাজ করছে । কিন্তু শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিধানাবলী ৩ (ক) তে শিশু শ্রমিকের কার্যকাল সম্পর্কে বলা আছে- কোন শিশু শ্রমিককে দিনে ৫ ঘন্টার বেশি আজ করানো যাবে না এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত তাকে নিয়োগ করা যাবে না । শিল্প কারখানা বাদেও দেশে অসংখ্য শিশু গৃহকাজ,

রেস্টুরেন্ট, হকার ও ফুল বিক্রি, কাগজ কুরানো, ইট ভাঙ্গার কাজের সথে যুক্ত। এ সকল কাজে শিশুটিকে দেখা যায় সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। শিশুর শারীরীক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেএে অবস্থানটি সর্মথন করা যায় না । এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন হওয়া উচিত।

শিশু শ্রম মানবতা বিরোধী। অল্প বয়স থেকে কঠিন পরিশ্রম শিশুর স্বাস্থ্য হানিকর। একটি সুস্থ শিশু জাতির সমাপদ। সুস্থ শিশুই গড়ে তুলতে পারে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ জাতি। তাই আমাদের পাশের শিশুটিকে পাঠিয়ে দিতে পারি নিকটর্বতী কোন স্কুলে। গড়ে তুলতে পারি ভবিষ্যত প্রজন্মের একটি ভীত।

১৬৫) বাগেরহাটে গুচ্ছ গ্রামে শিশু মুহিনের সংশয়পুর্ন জীবন

মিজানুর রহমান সোহান (বাগেরহাট):

গুচ্ছ গ্রামের মুহিন অন্ধকার জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। বাগেরহাট দড়াটানা নদীর চরে সরকার কর্তৃক এক খন্ড সংর্কীন জমির উপর গড়ে উঠেছে গুচ্ছ গ্রামটি। এখানকার অধিকাংশ ছেলে মেয়েই স্বাভাবিক জীবন এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। মুহিন এই গুচ্ছ গ্রামেরই একটি শিশু। তার পঙ্গু বাবা শফিকুল ইসলাম ও মা ছালমা বেগম। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সে ছোট। মা-বাবা অশিক্ষিত হওয়ায় পড়া লেখার প্রথমিক ধারণাটা ও সে পায়নি তার বয়স আট বছর। সে নদী পারাপারের মাঝির কাজ করে। লেখা পড়া ও খেলাধুলা করে সারাদিন সময় কাটানোর বয়স এখন তার। কিন্তু সারাদিন রোদ্রে পুরে মাঝির কাজ করে সে জীবন অতিবাহিত করছে। সে জানায় তার লেখাপড়া করার ভীষন ইচ্ছা। কিন্তু পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারনে সে লেখা পড়া করতে পারে না। সারাদিন তাকে নৌকায় এ পারে লোকজনকে আনা নেয়ার কাজ করতে হয়। প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট করতে হতো। তার হাতে ফোসকা পরে যেত। আর শরীরে ব্যথা হত। তারপরও অনেক নৌকা জোরে বাইতে না পারলে তাকে বড়দের কাছে গালমন্দ শুনতে হতো। তার এই অন্ধকারাচ্ছন্নজীবন থেকে সে মুক্তি পেতে চায়।

১৬৬) আগৈলঝাড়া ঃ নির্যাতিতা বিধবা মলিনা।

ছেলের অধিকার ফিরে পেতে প্রসাশনের দারস্থ অসহায় বিধবা মলিনা

তপন বসু (বরিশাল):

পরিবারের দাবি অনুযায়ী যৌতুক নিতে না পারায় আত্ম সম্মান বাঁচাতে স্বামীর আত্মহত্যা। সম্পতির দাবি নিশ্চিত করতে প্রশাসন সহ স্থানীয়দের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে গঞ্জনার শিকার মৃতের স্ত্রী ও পুত্র।

বিবরণে প্রকাশ, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার শুয়াগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় বোস এর মেয়ে মলিনার সাথে একই গ্রামের চন্দ্র কান্ত বৈদ্যর ছেলে শান্ত রঞ্জন বৈদ্যর সাথে ঘটা করে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় ১৬ বছর পূর্বে। ব্যবসায়ী স্বামীর আর্থিক সচ্ছলতায় সুখেই দিন কাটছিল নব দম্পত্তির । বিয়ের ২ বছর পর মলিনার কোল জুড়ে আসে একটি ছেলে সন্তান। নাম সুমন। স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি ভালবাসা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি শান্তর। শ্বশুর বাড়ি থেকে যৌতুক আনার জন্য বাবা চন্দ্র কান্ত বৈদ্য, মা, দেবর জোতির্ময়, জুরান, পরিতোষ ও একমাত্র মেয়ে শান্তর উপর মানসিক চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। দরিদ্র শ্বশুরের নিকট থেকে যৌতুক আনা অবাঞ্চিত মনে করায় শান্ত বাধ সাধলে শান্ত ও মলিনার উপর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক অকথ্য নির্যাতন। ব্যবসায়ী কারণে স্বামী শান্তর ব্যস্ততা ও রাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে থাকার সুযোগে ছোট দেবর জোতির্ময় মলিনাকে বিভিন্ন সময় কু-প্রস্তাব দিতে থাকে। এক পর্যায়ে শীলতাহানী করার ব্যর্থ ঘটনা মলিনা তার স্বামীর নিকট প্রকাশ করলে নির্যাতনের চরম খর্গ নেমে আসে তাদের উপর। দুশ্চরিত্রা বলেও আখ্যা পায় মলিনা। এক পর্যায়ে

পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিগ্রহের কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় শান্ত। ছেলে সুমনের বয়স তখন মাত্র সাড়ে ৩ বছর। এ ব্যপারে কোটালীপাড়া থানায় আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগ এনে মলিনা লিখিত অভিযোগ করে। নির্যাতনকারী কৌশলী পরিবার থানায় বসে তথাকথিত গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আপোষ রফা করে। যাতে মৃত শান্তর একমাত্র ছেলে সুমনকে এক বিঘা জমি লিখে দেয়া এবং শ্বশুর চন্দ্র কান্তর মৃত্যুর পর ওয়ারিশ সূত্রে ৪ এর ১ অংশ সুমন প্রাপ্ত হবে। তাছাড়া মলিনা ও সুমন বাবার বাড়ি অথবা শ্বশুরবাড়ি যেখানে ইচ্ছা থাকবে। তবে, তাদের সমস্ত ব্যয় ভার চন্দ্রকান্ত বহন করবে। কিন্তু কথা অনুযায়ী কাজ করেনি চন্দ্র কান্ত। ঠাঁই মেলেনি মলিনার স্বামীর ভিটায়। স্বামীর মৃত্যুর ১১ বছর পরেও কোন জায়গা পায়নি সুমন। উপরন্ত চন্দ্র কান্ত ৩০-৪০ বিঘা জমি থেকে সুমনকে বঞ্চিত করে পর্যায়ক্রমে বিক্রি করে সকল অর্থ ভারতে পাচার করছে। যা দিয়ে পায়রাডাঙ্গায় একটি বাড়ি বানিয়েছে। ওই বাড়িতে বড় ছেলে জুরান ও ছোট ছেলে পরিতোষ অবস্থান করছে। বাড়ি থাকা জোতির্ময় এর নামে বাকি সম্পত্তিও লিখে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে চন্দ্র কান্ত। মলিনার স্বামীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি দখলে রেখেছে জোতির্ময়। বর্তমানে মলিনা তার এক কাকা শ্বশুরের বাড়িতে আশ্রীতা হিসেবে রয়েছে। ছেলে সুমন এখন ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। জীবনের ব্যয় মেটানোর জন্য স্থানীয়দের সুপারিশে পুষ্টি প্রকল্পের সহায়তায় এস.জি.এস প্রোগ্রামে ৭ শত টাকা বেতনে চাকরী করছে মলিনা। দুর্মূল্যের বাজারে ৭ শত টাকা বেতনের চাকরী করে ছেলের লেখাপড়া ও নিজের ব্যয়ভার একরকম অমানবিক জীবন-যাপন করছে মলিনা। এসব নিগ্রহের ঘটনা জানিয়ে জেলা যৌথ বাহিনীর নিকট আবেদন করেছে। সংশিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান সুধারঞ্জন রায় ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, অধিকার বঞ্চিত মলিনা ও সুমনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে প্রশাসনের আশু দৃষ্টি কামনা করেন তিনি।

১৬৭) আগৈলঝাড়ায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা। ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

তপন বসু (বরিশাল):

আগৈলঝাড়ায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা। ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। অভিভাবকদের অসচেতনতা ও দারিদ্রতার কারণে এ সংখ্য বাড়ছে বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসের দাবী।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় ৬৫ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৪ টি রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫ টি কমিউনিটি বিদ্যালয় সহ মোট ৯৪ টি বিদ্যালয়ে ২০ হাজার ২ শত ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়া লেখার সুযোগ পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেনীতে ২০৯৪ জন বালক এবং ২০৯৮ জন বালিকা সহ ৪ হাজার ১ শত ৫২ জন, দ্বিতীয় শ্রেনীতে ২১৩৯ জন বালক এবং ২১৮৮ জন বালিকা সহ ৪ হাজার ৩ শত ২৭ জন বালিকা, তৃতীয় শ্রেনীতে ২১১৯ জন বালক এবং ২২২৩ জন বালিকা সহ ৪ হাজার ৩ শত ৪২ জন, চতুর্থ শ্রেনীতে ১৯৬৮ জন বালক এবং ১৯৬৮ জন বালিকা সহ মোট ৩ হাজার ৯ শত ৩৬ জন, পঞ্চম শ্রেনীতে ১৭৩৫ জন বালক এবং ১৭৫৮ জন বালিকা সহ মোট ৩ হাজার ৪ শত ৯৩ জন সহ সর্বমোট ২০ হাজার ২ শত ৫০ জন শিক্ষার্থী বর্তমানে অধ্যায়নরত রয়েছে। গড়ে ৪০% হিসেবে উপবৃত্তি প্রাপ্ত সুবিধা ভোগীর সংখ্যা ৮ হাজার একশ জন। যাদের গড় বয়স ৬ বছরের উপর থেকে ১০ বছরের উপর। এদের মধ্যে মোট ছাত্রী সংখ্যা ১০ হাজার ১শ ৯৫ জন। সূত্র মতে, ড্রপ আউট বা ঝড়ে পড়া শিশুর সংখ্যা ২% হিসেবে ৪শ ৫০ জন। যাদের অধিকাংশ অভিভাবকরা দরিদ্র এবং অসচেতন বলে শিক্ষা অফিসের দাবী। ৯৪ টি বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক রয়েছে ৩০২ জন। যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

অন্য দিকে এনজিও বহুল আগৈলঝাড়া উপজেলায় ৩৭ টি এনজিও রয়েছে। যার অধিকাংশই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ব্রাক, ওয়ার্ল্ড ভিশন, আলোশিখা সহ বেশ কিছু এনজিও। শুধু মাত্র ব্রাকের সূত্র মতে, ব্রাক এডুকেশন প্রোগ্রাম ও গভরনমেন্ট পার্টনারশীপ

প্রোগ্রাম (বিইপি এবং জিপিপি) ১৩ টি স্কুলে শিশু শ্রেনীতে ৭০ জন বালক ও ২৬০ জন বালিকা সহ ৩৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। যাদের বয়স ৫-৬ বছর। এছাড়া ২৪ টি বিদ্যালয়ে ২৩০ জন বালক ৪৮০ জন বালিকা সহ মোট ৭১০ জন ঝড়েপরা শিশু প্রথম শ্রেনী থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করছে। যাদের বয়স ৮-১১ বছর। এসব শিক্ষার্থী ছাড়াও ওয়ার্ল্ড ভিশন ও আলো শিখায় এর চেয়ে দ্বিগুন ঝড়ে পরা শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে। সরকারী হিসাবে ঝড়ে পরা শিশুর সংখ্যা ৪০৫ জন হলেও শুধুমাত্র ব্রাকেই এর সংখ্যা ৭১০ জন। একটি এনজিওর স্কুলেই সরকারী হিসাব মতে ঝড়েপরা শিশুর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুন হওয়ায় অন্যান্য এনজিওতে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় হিসেব মতে, আগৈলঝাড়ায় ঝড়ে পরা শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৫%। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অশিক্ষিত অসচেতন অভিভাবক ও দারিদ্রতার কারনে অধিকাংশ শিশু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনী থেকে ঝড়ে পরে। দারিদ্রতার জন্য তাদের শ্রম বিক্রি করতে হচ্ছে। অনেক পিতা মাতাই তাদের ছেলে মেয়ে দিয়ে বিভিন্ন মৌসুমে মৌসুমি কাজ করানো ফলে কোমল মতি শিশুরা স্কুল বিমুখ হয়। তা ছাড়া বাল্য বিয়ের কারনেও অনেক মেয়ে শিশু ঝড়েপরে। ছেলে শিশুরা বিভিন্ন ঝুকি পূর্ন পেশায় নিজেদের আত্ম নিয়োগ করছে। এক শ্রেনীর অসাধু লোক শিশুদেরকে শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগিয়ে একদিকে লেখাপড়ার সুজোগ থেকে বঞ্চিত করছে অন্যদিকে শ্রমের বিনিময়ে তাদের দেয়া হচ্ছে নাম মাত্র মূল্য। এছাড়া ও কিছু শিশু বিপদগামী হয়ে চুরি, ছিনতাই, মাদক সেবন ও ব্যবসা সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পরে। ফলে শিশু ও কিশোর অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। তাই সমাজের সকলের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শিশুদের স্কুলে পাঠিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষা শিশুর অধিকার, দাবী নয় এব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে হবে বলে মতামত দিয়েছেন সংশ্লিষ্টজন।

১৬৮) আগৈলঝাড়ায় বর্বোরোচিত শিশু নির্যাতন গৃহকর্তী গ্রেফতার

আগৈলঝাড়া (বরিশাল):

আগৈলঝাড়ায় শিক্ষকের স্ত্রী কর্তৃক অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে গৃহপরিচারিকা শিশু রাবেয়া (৯) নির্যাতনকারী গৃহকর্তী রাশিদা (৪০) কে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ। মামলাটি ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্য প্রভাবশালী বিএনপি নেতা কবির হোসেন তালুকদার বিভিন্ন তৎপরতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্যাতিতা শিশু জানায়, ৩ বছর পূর্বে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার রত্তনপুর গ্রামের মোস্ত ফা চৌকিদারের মেয়ে রাবেয়া (৯) কে কাজের জন্য উপজেলা সদরে ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমীর শিক্ষক হারুণ-অর-রশিদ এর তার বাসায় আনে। পূর্ব পরিচিত এবং দু-সম্পর্কের আত্মীয় হওয়ার সুবাদে রাবেয়ার বাবা শিশুকে কাজে দেয়ার ব্যাপারে অমত করেনি। কিন্তু কাজের কয়েক মাসের মধ্যে পরিবারের সকলের হুকুম মানতে ব্যার্থ হওয়ায় রাবেয়ার উপর ওই শিক্ষকের স্ত্রী রাশিদা (৪০) প্রতিদিন তাকে শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। একটি সাবান পুকুরে হারানোর অপরাধে সর্বপ্রথম তাকে দরজার লাট দিয়ে পিটিয়ে মাথায় চরম যখম সৃষ্টি করে। অন্য একদিন রান্না করতে গিয়ে গৃহকর্তী দেখেন তরকারী ধোয়া হয়নি, তখন চুলোয় তেল নাড়া গরম খুন্তি দিয়ে তার শরীরে চেপে ধরা হয়। সর্বশেষ গত ৩ দিন পূর্বে এঘটনা ঘটে। বাহিরের কোন চিকিৎসা না করায় ওই শিশুটির শরীরে বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের চিহ্ন যা ক্ষত আকারে দেখা যায়। কাজে যোগদানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বাংলা সিনেমার মত রাবেয়ার উপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল রাশিদা। পরিবারের অন্য সদস্যরাও রাবেয়ার উপর কমবেশি নির্যাতন চালাত বলে শিশুটি অভিযোগ করে। গতকাল শিশুটি একটি জামা ও প্যান্ট সাথে নিয়ে থানা গেটের সামনে বাড়ি যাওয়ার জন্য কান্নারত অবস্থায় পুলিশের কাছে আকুতি জানায় তাকে বাড়ি পৌঁছে

দেয়ার। পুলিশ নির্যাতনের ঘটনা শুনে কাজের মেয়ে শিশু রাশিদাকে নির্যাতনের অভিযোগে রাশিদার ভাড়া বাসা থেকে গ্রেফতার করেছে। রাশিদার গ্রামের বাড়ী মুলাদী উপজেলার বিদ্যানন্দপুর গ্রামে। তার বাবার নাম আবুল হোসেন মেম্বর। এ ব্যাপারে পুলিশের এসআই গাজি আব্দুর রহমান বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতনে সংশোধিত আইনে রাশিদাকে আসামী করে মামলা দায়ের করে। মামলা নং-৫ (২২-০৮-২০০৭)। পুলিশ রাশিদাকে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে প্রেরণ করেছে। শিশু রাবেয়াকে ২২ ধারায় জবান বন্দি প্রদানের পর নিরাপত্তা হেফাজতে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে পুলিশ জানায়। গৃহকর্ত্রী গ্রেফতারের পর তার প্রভাবশালী দুলাভাই উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমীর সাবেক সভাপতি কবির হোসেন তালুকদার তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়া ও মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

১৬৯) নিজভূমে পরবাসী ময়না

তপন বসু (বরিশাল):

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা বি এনপির সহ-প্রচার সম্পাদক ফিরোজুর রহমান লালুর ভূমি দস্যুতার শিকার গোপাল সেন গ্রামের অতিশীপর বৃদ্ধা ময়না রাণী মধু (৮০) সহায় সম্বল হারিয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। প্রশাসনের অনেক কর্তাদের দারস্থ হয়েও কোন সুফল পায়নী বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে উপজেলার বাগধা ইউনিয়নের গোপালসেন গ্রামের ওই বৃদ্ধা ও তার ছেলে ওয়ারিশ সূত্রে ৯৬ নং গোপালসেন মৌজায় ৮৮ নং খতিয়ানে ৪ একর ১২ শতক সম্পত্তির মালিক হন। এ সম্পত্তি এলাকার বিভিন্ন ভূমিখোর চক্র অবৈধভাবে দখলের চেষ্টা চালালে বৃদ্ধার স্বামী যদু নাথ মধু ১০৮ জনকে বিবাদী করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। যার নং ৭০/৮৫। ওই মামলায় আগৈলঝাড়া উপজেলা সহকারী জজ আবুল বাশার মুন্সি। ৮৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রায়ের ডিক্রি প্রদান করেন বাদীর পক্ষে। রায়ে বলা হয় বিবাদী গন ৬০ দিনের মধ্যে বাদী পক্ষকে বিরোধীয় ভূমি বিনা খরচায় বুঝিয়ে দিবে। অন্যথায় বাদী পক্ষ এ্যাডভোকেট/কমিশনার নিয়োগ করিয়া বাদীর দাবীকৃত ভূমি বন্টন করিয়া লইতে পারিবেন। যদু নাথ মধুরা তিন ভাইর মধ্যে বড় ভাই নগর বাসী মধু অবিবাহিত ও নিঃসন্তান অবস্থায় দেশে মারা যায় বলে তৎকালীন চেয়ারম্যান এমএ গফুর ১৯/০৭/১৯৮০ সালে সনদ পত্র প্রদান করেন। মেঝ ভাই যদু নাথের ২ পুত্র রমেশ ও অজিৎ। ছোট ভাইর ৫ মেয়ে বিয়ে দেয়ার পর মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয় ময়নার ২ ছেলে রমেশ ও অজিৎ। বড় ভাই নগর বাসীর ভূয়া পুত্র বিনোদ চন্দ্র হালদার সাজিয়ে ১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর আগৈলঝাড়া সাব-রেজিস্ট্রির অফিসে ২৩৫৩ নং দলিল লেখক মোঃ কাওছার হোসেনের মাধ্যমে একটি ভূয়া দলিল করে। যার নং ২০৪১। দলিল লেখকের দলিল নং ৩৬৬। ওই দলিলে সাড়ে ৮৭ শতক জমির মালিক কালু খাঁর পুত্র ফিরোজুর রহমান লালুর নাম গ্রহীতা হিসেবে পাওয়া যায়। তৎকালীন ক্ষমতাসীন জোট সরকারের সময় নিজের ও দলের প্রভাব খাটিয়ে লালু মাঠ জরিপের সময় সমস্ত সম্পত্তি তার নামে লিখে নেয়। পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী করায় অজিৎকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় হয়রানী ও শারীরিক নির্যাতন করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করায় লালু। বড় ভাই রমেশ ছোট ভাইর শিক্ষা পেয়ে পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারে খুব একটা চেষ্টা করেনি। বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকোরের সময় বৃদ্ধা ময়না সহ একই গ্রামের ১৪ জন অসহায় মানুষ তাদের ন্যায্য সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার আশায় জেলা যৌথ বাহিনীর নিকট লালু ও ধীরেন মধুর ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করেন। যৌথ বাহিনী বিষয়টি তদন্তের জন্য আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দায়ীত্ব দেন। নির্বাহী কর্মকর্তা স্বারক নং- উঃ নিঃ অঃ / আগৈল/ বরি/ ৫৫৮ মাধ্যমে ২৯ জুলাই উভয় পক্ষকে সকল প্রমান নিয়ে ৭ আগষ্ট তার কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার নোটিশ দেন। উভয় পক্ষ ওই তারিখে হাজির হয়। সম্পত্তি বঞ্চিত ময়না ও

তার ছেলে রমেশ সহ বাদিদের অভিযোগ শুনানিতে নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের সকল কাগজ পত্র ভাল ভাবে দেখেননি। ১৬ আগষ্ট ময়না লিখিত ভাবে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার আশায় আবেদন করলে নির্বাহী কর্মকর্তা যানান প্রতিবেদন দেয়া যাবেনা। তবে তিনি বলেন উঃ নিঃ অঃ / আগৈল/ বরি/ ৬০৩ স্বারকের মাধ্যমে ১১ আগষ্ট জেলা যৌথ বাহিনীর নিকট প্রেরন করা হয়েছে। এদিকে লালু এলাকায় বলে বেরাচ্ছে তদন্ত প্রতিবেদন তার পক্ষে গেছে। তবে প্রতিবেদনে কি লেখা আছে তা জানা সম্ভব হয়নি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, লালু এলাকার কমপক্ষে ২৫ টি পরিবারের সম্পত্তি গায়ের জোর ও ভুয়া দলিলের মাধ্যমে দখল করে আছে। দুর্বল লোকগুলোর আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শেষ পর্যন্ত জাঁলিয়াতির আশ্রয় নেয়া লালু গংরাই কি জিতে যাবে? এমন প্রশ্ন ভুক্তভোগি ময়না সহ অন্যন্যদের। এ ব্যাপারে ০১৭১৮-৮৫৯৪৯৫ ফোন নম্বরে একাধিকবার লালুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কয়েক দফা তারিখ দিয়ে সর্বশেষ ২৪ আগষ্ট এ প্রতিবেদকদের তার বাড়ি যেতে বলে। সময়মত তার বাড়ি পৌছলে তার স্ত্রী জানান তিনি বাড়ি নেই, কখন ফিরবেন জানিনা। ওই স্থানে বসে একাধিকবার ফোন করলেও লালু ফোন ধরেনি।

১৭০) স্ত্রীর দাবি নিয়ে প্রেমিকের বাড়িতে ৩ মাস অবস্থান।

তপন বসু (বরিশাল):

স্ত্রীর দাবি নিয়ে প্রেমিকের বাড়িতে ৩ মাস অবস্থান। প্রসাশন ও স্থানীয়রা নির্বিকার। বিয়ে না হলে আত্মহত্যার হুমকী দিয়েছে প্রেমিকা।

গোপালগঞ্জ জেলার শুয়াগ্রাম ইউনিয়নের নারায়ণখানা গ্রামের রামচন্দ্র হালদারের মেয়ে মায়া হালদার (২০) এর সাথে পার্শ্ববর্তী বাড়ির মৃতঃ কৃষ্ণ কান্ত বৈরাগীর ছেলে সমীর বৈরাগীর সাথে দীর্ঘ ৮ বছর প্রেমের সম্পর্ক চলে আসছিল। এ সম্পর্কের সুযোগকে কেন্দ্র করে বিয়ের প্রলোভনে সমীর মায়ার সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। একে একে মায়া ৪ বার অন্তঃসত্বা হয়ে পরে। এ নিয়ে এলাকায় একাধিকবার শালিস বৈঠক হয়। শালিস বৈঠকগুলোতে সমীরের পরিবার মায়ার সাথে বিয়ে দেয়ার কথা বলে আসছিল। এমনকি সমীর মায়ার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন করত বলে মায়া ও এলাকাবাসী জানায়। সর্বশেষ গত ১১ জুলাই সমীরের কথা অনুযায়ী মায়া সমীরের বাড়িতে ওঠে। এরপর সমীরের পরিবারের সদস্যরা তালবাহানা করতে শুরু করে। মায়া এক মাসের অবস্থানের মাথায় ১২ আগষ্ট সমীরের বড় ভাই ঢাকা উদয়ন স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক কিরন বৈরাগী ও মায়ার কাকাত ভাই সুশান্ত হালদার আহবায়ক হয়ে এ ঘটনায় শালিস বৈঠক ডাকে।

প্রয়াত সাবেক এমপি সতিশ হালদারের ছেলে শুয়াগ্রাম ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মনিন্দ্র হালদারের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা থেকে শেষ রাত পর্যন্ত বৈঠকে চেয়ারম্যান সুধারঞ্জন রায়, শিক্ষক প্রমানন্দ হালদার, মনোতোষ বৈদ্য ইউপি সদস্যা শান্তি লতা। প্রমানন্দ রায়, হরেন হালদার, কালীপদ বৈদ্য, সুশীল রাঢ়ী, সমীরের কাকা সুধন্য বৈরাগী, চন্দ্র কান্ত বৈরাগী, ধারাবাশাইল কলেজের অধ্যাপক সমীরের আত্মীয় গোপাল চন্দ্র, গফুর মিয়া ও উপজেলা সদর সহ গ্রামের শতাধিক লোকের উপস্থিতিতে এক সপ্তার মধ্যে মায়া ও সমীরের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হয়। মায়া ও তার পরিবারের অভিযোগ এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে না হওয়ায় শালিসদের কাছে এ ঘটনা জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি তারা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত ৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যা মালতী ভাবুক জানান, বিয়ে না হওয়ার জন্য চেয়ারম্যান সুধারঞ্জনই দায়ী। কারণ, ওই দিনই বিয়ে না পরিয়ে সমীরকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। সমীমের মা উর্মিল বৈরাগী (৬০) জানান, মায়ার অভিভাবকরা আমার কাছে কিছু দাবি করেনি। তারপরেও গ্রামবাসীরা যা করবে তাতে আমরা রাজি। আমরা এও বলেছি ভাল একটা ছেলে দেখে মায়ার বিয়ে দেয়া হোক আমরা সমস্ত খরচ বহন করব। এ ব্যাপারে মায়া তার প্রতিক্রিয়ায়

সমীরের মা'র উপস্থিতিতে জানান, আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব। সমীরকে না পেলে আমি এ বাড়িতেই আত্মহত্যা করব। আর মৃত্যুর জন্য এ বাড়ির লোকজন সহ শালিসরাই দায়ী থাকবে।
প্রায় দুমাস মায়া প্রেমিকের বাড়িতে অবস্থান করলেও শালিসরা কিংবা প্রসাশনের কোন লোক এ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে এর দায় কে নেবে ? এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান সুধারঞ্জন ফোনে জানান, আমরা বিয়ের কথা বলেছি সমীরের পরিবার শোনেনি। সমীরকে পাওয়া গেলে মায়ার সাথেই তার বিয়ে দেয়া হবে। এর পূর্বে সমীর ৫ টি বিয়ে করলেও মায়াকেই তার বিয়ে করতে হবে।

১৭১) নিজের পড়া বন্ধ করে অন্যের হাতে সুলভে বই তুলে দেয় কালাম

রাজু ইসলাম (বরিশাল):

এই পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকা। দেইখ্যা নেন, যেইডা লন, পাঁচ টাকা- বরিশাল লঞ্চ ঘাটে দাড়িয়ে হাত নেড়ে এভাবেই হাক দিচ্ছিল আট বছরের কালাম। এক হাতে কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া ঘাম মুচছে আর এক হাতে শিশুদের ছড়া, গল্প আর ছবি আকার বই বিক্রি করছে সে। যে বয়সে নিজের বই পড়ার কথা সে বয়সে অন্যেরহাতে সুলভে বই তুলে দিচ্ছে কালাম। হাক ডাক ছিলো ওর বিক্রির কৌশলমাত্র। কেবলমাত্র বাবা মায়ের রোজগারে সংসার না চলায় কালামকে বাধ্য হয়েই বই বিক্রির এ কাজে আসতে হয়েছে।
নগরীর বালুরমাঠ বস্তিতে পরিবারের সাথে ভাড়া করা বাসায় থকে সে। মা বাবা দুই বোন ও একটা ছোট ভাই আছে কালামের। ভাই বোনদের মধ্যে কালাম সবার বড়। বাবা রফিজ উদ্দিন রাজ যোগালিয়া। মা আলেয়া বিবি সংসারে কাজের পাশাপাশি বিড়ি কারখানায় কাজ করেন। তারপরেও কেন কালামকে বই বিক্রির কাজ করতে হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাব দেয় ম্লান হাসি হেসে।
সাজানো গোছানো বা দামি সাজসজ্জায় সজ্জিত নয় ওর দোকানটি। ফুটপাতে নীল রংয়ের পলিথিন বিছিয়ে তার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে বইগুলো। প্রতিটি বইয়ে তার চাহিদাও তাই মাত্র পাঁচ টাকা। প্রতিদিন প্রায় ১৫০ টাকার বই বিক্রি করে সে। এ টার্গেট পূরন করতে পারলে মহাজন তাকে খাবার ছাড়াও বিশ টাকা করে দেয়। বিক্রি বেশি হলে মাঝে মাঝে টাকা বাড়িয়ে দেয় বলে জানায় কালাম। বেশি বিক্রির আশায় এজন্য সে প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে লঞ্চঘাটে। যখনই লঞ্চের সাইরেন শোনে তখনই সরব হয়ে ওঠে কালাম। বাকি সময় বিক্রি করা বই থেকে এক এক করে ছড়াগুলো মুখে আওড়াতে থাকে সে। ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হয়েছিলো সে তারপর আর আগায়নি। পড়তে ইচ্ছা করেনা ? প্রশ্নটা শুনে থমকে যায় কালাম। এক এক করে তিন মিনিট কাটিয়ে দেয় নিস্তব্ধতায়। কিছুক্ষন পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে -"ইচ্ছা আবার করেনা! খুবই ইচ্ছা করে। কিন্তু আমাগো কপালে কি আর পড়ালেহা আছে ? বাপে কাম করে রাজ যোগাইল্যার। হের টাহা দিয়া ৮০০ দেই ঘরভাড়া। হের উপর আবার পড়ালেহা? বেচমু না পড়মু এবার আমনেই কন?" বইগুলো নাড়াতে নাড়াতে জানায় বই বিক্রি করে বলেই সে তার ছোট বোন কনাকে স্কুলে ভর্তি করাতে পেরেছে।

কালাম সমবয়েসিদের মাঝে সস্তা দামে বই বিক্রি করে শিক্ষার আলো ছড়ালেও নিজেই এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছে। কালামের এখন লক্ষ্য একটা বড় বই দোকানের মালিক হওয়া। যেখানে থাকবে তাকে সাজানো রাশি রাশি বই। শুধু ছোটদের জন্য না বড়দের বইও থাকবে এ কথাটা বলে ফেলে কিছুটা লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। এরপর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে কালাম। শুরু হয়ে যায় এই পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকা। দেইখা নেন, যেইডা লন, পাঁচ টাকা।

১৭২) এখানে একটা শিশু পার্ক ছিলো

রাজু ইসলাম (বরিশাল):

বরিশাল বেলস্ পার্কে বাবার সাথে বিকেলে ঘুরতে এসে পুরানো শিশু পার্কের ভাঙ্গা রাইটসটার দিকে বার বার ফিরে তাকাচ্ছিল ছয় বছরের রোহান। ঘুরে ফিরে বাবার কাছে তার জিজ্ঞাসা ছিল একটাই বাবা এখানে কারা খেলা করে।

ছোট রোহানের সরল এ জিজ্ঞাসায় ছিল কিছুটা আক্ষেপও। পরিত্যক্ত এ শিশু পার্কটি এখন গো-চারন ভূমিতে পরিনত হয়েছে। শুধু শিশু পার্ক নয় শিশু বিনোদনকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এ পর্যন্ত বরিশালে যতগুলো শিশু পার্ক তৈরি করা হয়েছিলো তা এখন শুধুই স্মৃতি চারন। সর্বশেষ বেসরকারি অর্থায়নে তৈরি হওয়া প্লানেট ওয়ার্ল্ড শিশু পার্কটাই বর্তমানে বরিশালের শিশু তরুনদের একমাত্র বিনোদনের স্থান।

শুধু রোহান নয় এ জিজ্ঞাসা ওর মত কয়েক হাজার শিশুর। এর সাথে সংশ্লিস্টরা শিশুর সুস্থ মানসিকতা বিকাশে শিশু পার্কের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও তা বাস্তবায়নে তারা নির্বাক।

জানা যায়, ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার বরিশালে প্রথম শিশু পার্ক নির্মান করেন। কালিবাড়ী রোডে নির্মিত পার্কটি অট্টালিকার সাথে মিশে গেছে। এর পাশে গড়ে উঠেছে বরিশাল সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিশাল অট্টালিকা। ১৯৭৬ সালে নগরীর বৈদ্যপাড়ায় নির্মাণ করা হয় অন্য আরেকটি শিশু পার্ক। তার অস্তিত্ব এখন বিলীন হয়ে গেছে।

দু বছরের মাথায় ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে শহরের সাগরদী বাজার সংলগ্ন মাঠে ও আমানত গঞ্জ এলাকাতে আরও দুটি শিশু পার্ক নির্মিত হয়। যা দুই তিন বছরেই অচল হয়ে যায়। তারপর ১৯৮০ সালে শহরের হাট খোলা এবং দুই বছরের মধ্যে শহরের বেলস পার্ক সংলগ্ন জমিতে পৃথক আরও একটি শিশু পার্ক তৈরি করা হয়। পার্কটি এখন পর্যন্ত তার শেষ স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে রয়েছে। কিছু মালামাল চুরি হয়ে গেছে। বাকি মালামাল রোদ বৃষ্টিতে মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো সংস্কারের জন্য তেমন কোনো বাজেট নেই বলে জানা যায়।

পার্কে বেড়াতে আসা একজন প্রবীন ব্যক্তি বলেন-"এ জায়গাটা অনেক সুন্দর ছিলো। অনেক ছেলেমেয়েরা আসত। মা বাবারাও বিকেলে ঘুরতে আসত। আর এখন খুব কষ্ট হয় শিশু পার্কের এ অবস্থা দেখলে। সরকারের উদ্যোগ নেয়া দরকার।"

বরিশালের বিনোদন প্রিয় শিশু কিশোররা একটু আনন্দ পেতে বেসরকারিভাবে পরিচালিত প্লানেট ওয়ার্ল্ড শিশু পার্কে ছুটে আছে। এ পার্কে প্রবেশমুল্য দশ টাকা। যে কোন রাইটসএ উঠতেও ১০ টাকা দরকার। তাই শহরের স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা এখানে আসতে পারলেও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের এখানে প্রবেশাধিকার ঈশ্বর নিজেই বন্ধ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বরিশাল জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা পংকজ রায় চৌধুরী জানান, বিনোদন শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটানোর প্রধান শর্ত। আমরা সরকারিভাবে খিছু কিছু কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এতে বেসরকারি সংগঠনের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। তিনি দাবী করেন শিশুদের বিনোদন কুক্ষিগত করা হলে তা হবে জাতিসংঘের শিশু অধিকারকে লংঘন করা।

১৭৩) ওদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়

নজরুল বিশ্বাস (বরিশাল):

আমি র‌্যাব হমু, পুলিশ হমু, পেলেন চালামু, হুন্ডা চালামু, যা খুশি তাই হমু তাতে আপনের কি? এভাবে ওর মনের কথাগুলো প্রকাশ করল রুবেল (৭)। বরিশাল লঞ্চঘাটে মাঝে মাঝে দেখা যায় ওকে টোকাই বেশে। এখনও ওর মনে অনেক স্বপ্ন। মা রাহেলা গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। বাবা নেই বলে জানালো

সে। থাকে নগরীর পলাশপুর বস্তিতে। ভোর হলেই কাধে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পরে। নগরীর বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গা কাঁচের বোতল, প্লাস্টিক, পুরানো লোহা, এসব কুড়িঁয়ে দিন শেষে চলে যায় নগরীর হাট খোলায়। সেখানে কুঁড়ানো জিনিসগুলো বিক্রি করে ২০/২৫ টাকায় বাসায় ফিরে টাকাগুলো মায়ের হাতে তুলে দেয়। একদিন অনেক টাকা হবে ওর। সেই টাকা দিয়ে যা খুশি তাই হওয়া যায় বলে রুবেলের ধারণা।

রুবেলের মত মামুন, জনি, আবদুল, সোহেল, রানা ওরাও এ শহরের টোকাই। সারাদিন ঘুরে ঘুরে পা ব্যাথা হয়ে যায়, লোকজন চোর মনে করে - কথাগুলো বলল সোহেল (১২)। ওদের সবারই রোজগার প্রতিদিন ১৫-২৫ এর মধ্যে।

আবদুল জানায় সে কয়েকদিন আগে লঞ্চঘাটের একটি দোকনে কাজ নিয়েছিলো। ওর হাত থেকে কাজের সময় একটি গ্লাস পরে ভেঙ্গে যায়। দোকানের মালিক ওকে অনেক মারধর করে। পরে ওখান থেকে সে পালিয়ে এস এ পেশায় নেমেছে।

এনজিওদের তথ্য মতে নগরীতে প্রায় ৫০০ টোকাই শিশু রয়েছে। কেউ কেউ কাজশেষে ঘরে ফিরলেও অনেকেরই ঘর নেই। বাবা মা বেঁচে আছে কিনা জানেনা। রাত হয়ে লঞ্চঘাটের পল্টুনে শুয়ে থাকতে দেখা যায়।

টোকাইদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা কেউ কেউ অপরাধের সাথে ইতমধ্যেই জড়িয়ে পড়েছে। চুরি করে ধরা পড়ে মার খেতে খেতে কয়েকজনের পিঠের চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। মাদকাসক্ত শিশু ও দেখা যায় তাদের মধ্যে। বরিশালের এনজিও আভাস সহ কয়েকটি এনজিও টোকাইদের নিয়ে কাজ করলেও তা নিত্যান্তই কম।

আভাসের নির্বাহী পরিচালক রহিমা সুলতানা কাজল জানান, তার সংস্থা প্রায় ২০০ জন টোকাই ও পথ শিশুদের নিয়ে কাজ করে। তিনি বলেন তবে এনজিও নয় টোকাই শিশুদের পূর্নবাসনে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা দরকার।

১৭৪) শিশুদের জীবন চলা / লক্ষ্য ওদের কয়েক গ্রাম চাল ডাল:

সি এইচ মাহবুব (বরিশাল):

রফিক (১০), সেলিম (১৩), টুকু (১৫) বয়সে ওরা শিশু হলেও ওদের আচার আচরন কথাবার্তা কিছুই শিশু সুলভ নয়। এতটুকু মাথায় রাজ্যের চিন্তা। কয়েকটা টাকার জন্য সারক্ষন ব্যস্ত থাকা। দিন শেষে সন্ধ্যাবেলা এ সামান্য রোজগারের ক'টি টাকা বাবা মায়ের হাতে তুলে দিতে না পারলে ওদের ঘরে যে চুলো জ্বলবেনা। অনাহারে রাত যাপন করতে হবে।

কয়েক গ্রাম চাল ডাল লবন সবজি জোগারের জন্য ওদের বেছে নিতে হয়েছে বিভিন্ন পেশা। কেউ ভিক্ষা করে , কেউ টোকাইয়ের কাজ করে, কেউ লঞ্চ ঘাটে পানি বিক্রির মত পেশা বেছে নিয়েছে ওরা।

রফিক নগরীর বালুরহাট মাঠ বস্তিতে মা ববার সাথে থাকে। ওর পেশা নগরীর লঞ্চ ঘাটে পানি বিক্রি। সংসার পরিচালনায় বাবাকে সাহায্য করতে তার এ পেশা বেছে নেয়া। বোতল সংগ্রহের জন্য তাকে সারারাত লঞ্চঘাটে কাটাতে হয়। ঢাকার লঞ্চ এলই শুরু হয় বোতল সংগ্রহ করা। তারপর সে বোতলে পানি ভরে রেখে দেয় নুরু মিয়ার পানির আড়তে। এজন্য তাকে কমিশন দিতে হয়। তা না দিলে এখানে পানি বেচতে পারবে না। সন্ধা থেকে রাত ৯ টা অবধি পানি বিক্রি করে আয় হয় ৮০-১০০ টাকা। নিজের খরচ বাদে বাকি টাকা তুলে দেয় বাবার হাতে। বাবা গনি মিয়া দিন মজুরের কাজ করে। দুজনের উপার্জনে কোনভাবে চলে তাদের সংসার।

সেলিমের বাবা নেই। মা গৃহপরিচারিকার কাজ করে সংসার চালাত। কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব পরে সেলিমের কাঁধে। তাই তাকে নামতে হচ্ছে ভিক্ষা বৃত্তিতে। লঞ্চ ঘাট ও বিভিন্ন বাজারে ছোট বোন তানিয়াকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে। দু ভাইবোনের আর্তি-মায়ের অসুখ দুইটা টাকা দেন , ওষুধ কিনমু। মাকে বাঁচানো এখন তার একমাত্র কাজ। এভাবে কতদিন চলবে সেলিম জানেনা। সেলিম বলে- "আমার মায় না বাঁচলে আমাগো কি হইবে।"

টুকু- নামের সাথে পেশায় তার চমৎকার মিল । কাজ করে টোকাইয়ের। থাকে রসুলপুর বস্তিতে। সকাল হলেই ছুটতে হয় কাজের সন্ধানে। নগরীর যত উচ্ছিষ্ট ফেলার ডাস্টবিন, ময়লা ফেলার ভাগার, রাস্তার ফুটপাত, লঞ্চঘাট এসমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে ছেড়া কাগজ, প্লাসিক ভাঙ্গা, ছেড়া জুতা স্যান্ডেল, এ সবই তার উপার্জনের উপাদান। টুকুর সাথে কথা হয় নগরীর এক তলা লঞ্চঘাটে। বাবা মা ভাইবোন মিলে ওদের ৬ জনের সংসার। বাবা দিন মজুর। বাবা মা সারাক্ষন মারধর করত। শেষে তাদের বস্তির নিতাই, কালু, ছলিম এদের দেখ দেখি সেও নেমে পরে টোকাইয়ের কাজে। সারাদিন ঘুরে ৪০-৫০ টাকা আয় হয়। আবার ভাল জিনিসপত্র পেলে ৮০-৯০ টাকাও হয়। আয় করার পর থেকে আর তাকে মারে না বাবা মা। লেখাপড়া করেনি টুকু। ছোট ভাই সুমন ও বোন রহিমাকে পড়ানোর ইচ্ছা তার। টুকু বলে- "ময়লা ঘাটতে ভাল লাগেনা, প্রথম প্রথম ঘিন লাগত এহন গা সওয়া হইয়া গেছে। এ কাম না করলে টাকা পামু কই?"
রফিক, সেলিম, টুকু সবারই কিছু স্বপ্ন আছে। স্কুলে যাওয়ার কিংবা বাবা মায়ের কোলে বসে ভাল খাবার খাওয়া কোনোদিনও হয়নি। বরং বাবা মাই অভাবের তাড়নায় পাঠিয়েছে এ কাজে। এখন লক্ষ্য ওদের শুধুমাত্র কয়েক গ্রাম চাল আর দুবেলা দুমুঠো ভাত।

১৭৫) এক ভরি স্বর্নের জন্য নির্যাতন
সি এইচ মাহবুব (বরিশাল):
মাত্র একভরি স্বর্ন। যৌতুক শ্বশুর বাড়ি থেকে দিতে না পারায় প্রতি নিয়ত নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে চলছিল। ঘটনাটি বরিশাল শহরতলীর চরবারিয়ার কাগাসুরা গ্রামে। ঘটনার নায়ক ট্রাক চালক আব্বাস উদ্দিন।
দু বছর আগে আব্বাস বিয়ে করে শায়েস্তাবাদের আইচা গ্রামে। মুক্তাকে মাত্র এক ভরি ওজনের সোনার গয়না দেয়ার কথা স্বীকার করেছিলো তার বাবা আবদুল খালেক। বিয়ে হয় মুক্তার। কিন্তু হতদরিদ্র পিতা সংসারের নানা সমস্যা মোকাবেলা করে জামাই আবক্সকে দেয়া কথা রক্ষা করতে পারেননি। প্রথম দিকে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করলেও ক্রমান্বয়ে এ সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। আব্বাস শ্বশুর বাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। মা রাজিয়া বেগম এ ক্ষেত্রে ছেলেকে উৎসাহিত করেন গয়না আদায়ের জন্য। সে স্ত্রী কে চাপ প্রয়োগ করে। অসহায় হয়ে পড়ে মুক্তা। বাবর আর্থিক দৈন্যতার কারনে তাকে বলতেও পারছেনা আবার স্বামীর নির্যাতন সহ্যও করতে পারছেনা। এরপর একদিন মুক্তা ঘর থেকে বের হয়ে অজানার পথে পা বাড়ায়। স্বামী তাকে খুঁজে বের করে বেদম মারধর করে। শ্বশুর হারুন মিয়া পুত্রবধুর পক্ষ নিতে গিয়ে তার স্ত্রীর জন্য পারেননি। দিন দিন বেড়েই চলছিলো মুক্তার উপর নির্যাতনের মাত্রা। স্থানীয়দের মধ্যে ঘটনাটি একপর্যায়ে জানাজানি হয়ে যায়। সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্যা পারুল বেগম এ বিষয় নিয়ে একাধিকবার আপোষ মিমাংসার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন।
১৬ জুলাই ২০০৭ বিকেলে কাগাসুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেসরকারি সংগঠন আভাসের সহযোগিতায় নারী নির্যাতন ভিজিলেন্স টিমের মাসিক সভায় পারুল বেগম বিষয়টি উত্থাপন করলে

তাৎক্ষনিক ভাবে এ টিমের সদস্যরা আব্বাসের বাড়ি যান। দীর্ঘক্ষন স্বামী স্ত্রী শাশুড়ির সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেন। অবশেষে আব্বাস উদ্দিন কোনো রকম কোনো যৌতুক নিবেন না অঙ্গিকারাবদ্ধ হন। এভাবেই শেষ পর্যন্ত যৌতুকের জন্য নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেল মুক্তা। মুক্তা বলে- "অনেক অত্যাচার সহ্য করছি। আরও আগে যদি মিের সদস্যরা আসত আমাকে এত কষ্ট পেতে হতনা।"

১৭৬) মনে নেই বাবা-মাকে

সি এইচ মাহবুব (বরিশাল):

সাত বছরের ছেলে ফয়সাল। মা বাবার কথা মনে নেই তার। তবে তার ধারনা তার বাবা দেখতে অনেক লম্বা। মা চাকুরী করেন। তবে কোথয় আছেন জানেনা। খুব শীঘ্র তাকে নিতে আসবেন তারা। এ ধারনা নিয়ে সারাদিন চঞ্চলতার সাথে কাজ রে যাচ্ছে সে। বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হল এর সামনে কাসেম মিয়া চায়ের দোকানে কাজ করে সে।

ফয়সালের মা নগরীর ভাসাবাড়িতে কাজ রত। তার বয়স যখন একবছর তখন বাবা আরেকটি বিয়ে করে চলে যায়। বিপাকে পরে অসহায় মা। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে ছোট্ট ফয়সালকে কাশেম মিয়ার হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত মায়া ছিন্ন করে পাড়ি জমায় চিটাগাংয়ে। সেখানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ নেয়। কাসেম মিয়ার কাছে বড় হতে থাকে ফয়সাল। যখন ফয়সালের বয়স পাঁচ তখন থেকেই কাশেম মিয়া তাকে চায়ের দোকানে কাজে নিযুক্ত করেন। যে যখন চায়ের অর্ডার দেয় তখন কাশেম মিয়া ফয়সালের হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলেন দিয়ে আয়।

কোনরকম ভুল হলে কাশেম মিয়ার বকুনি আর চর থাপ্পর এই নিয়েই সকাল থেকে চলে যায় অবুঝ ফয়সালের। ফয়সাল বলে -"মা আইবে কয়দিন পর আমারে নিয়া যাইবে তার কাছে। তহন আর এ কাম করতে হইবেনা।"

(১৭৭) যৌতুকের কারনে ভেঙ্গে গেছে রুমার সংসার

শামীমা আসমা (বরিশাল) :

যৌতুক না দিতে পেরে বাকেরগঞ্জের চরবিশারীকাঠি গ্রামের রুমা (২০) এর সংসার ভেঙ্গে গেছে। তিন বছর শারীরীক নির্যাতন শেষে ২৮ জুলাই ২০০৭ তার হতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে তালাকনামা।

তিন বছর আগে চরবিশারীকাঠি গ্রামেররশিদ সরদারের মেয়ে রুমার বিয়ে হয় একই গ্রামের রতন হোসেনের ছেলে মনিরের সাথে। বিয়েতে মনিরকে দশ হাজার টাকা নগদ দেয় রুমার বাবা। রিক্সা চালক মনির রুমাকে নানা অযুহাতে মারধর করত প্রতিনিয়ত।

রুমা জানায় তার স্বামী মনিরের সাথে মনিরের ফুফাত বোন তাছলিমার প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। তাদের প্রেমে বাঁধা দেয়ায় রুমার উপর চলে আরও বেশি নির্যাতন।

একপযায়ে রুমা সন্তান ধারণ করে কিন্তু অমানুষিক নির্যাতনে তার পেটের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। তারপরও রুমা স্বামীর সংসার করতে চেয়েছিলো। ক্রমান্বয়ে মনিরের নির্যাতন আরও বাড়তে থাকে।

অবশেষে ৪ আগস্ট ২০০৭ ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে তার হাতে তালাকনামা ধরিয়ে দেয়া হয়। কিছু টাকা তাৎক্ষনিভাবে দিয়ে দিলেও বাকি টাকা কয়েকদিন পর দেবে বলে গ্রামের হারুন সিকদার জামিনদার হয়।

রুমা বলে - "এমন কোনো আইন কি নাই যে মনিররে শাস্তি দিতে পারে, আমার জীবনটা নষ্ট করল এর বিচার কে রবে?"

(১৭৮) রেজার স্বপন পূরন হবে কি?

শামীমা আসমা (বরিশাল) :

ফেরীর খোলা ডেকে প্রখর খরতাপ বা বর্ষার মধ্যে চকলেট চুইংগাম আচারাার সামান্য কিছু চানাচুর নিয়ে ঘোরাফেরা করে ১০ বছরের রেজা।

বাকেরগঞ্জের দাড়িয়াল ইউনিয়নে রেজার গ্রামের বাড়ি। চার ভাইবোনের মধ্যে সে মেঝ। বড় ভাই রুবেল (১৩) প্রতিবন্দী।

রেজারবাবা যখন যে কাজ পায় তাই করে। রেজার বাবা কালাম খান (৫০) জানায় বড় ছেলে জন্ম থেকেই পঙ্গু। তার সামান্য আয়ে প্রতিদিনের খাবার জোগার করা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই রেজা ফেরীতে ফেরীতে কিছু খাবার জিনিস বিক্রি করছে।

রেজার মা হেনেরা বেগম জানায় বড় ছেলে পঙ্গু হওয়ায় সে কোথাও কাজ করতে যেতে পারেনা ওকে রেখে। স্বামীর রোজগার আর রেজার আয়ে সংসার চলে।

রেজা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফেরিঘাটে আসে। ফেরীঘাট তার বাড়ি থেকে ২/৩ কিলোমিটার দূরে। তাই কখনও লঞ্চে বা কখনও পায়ে হেটে পৌঁছায়। প্রতিদিন ৫০-৬০ টাকার মালামাল কিনে বিক্রি করে ৭০-৮০ টাকায়, যা থেকে লাভ খুব কম।

রেজা বলে- “আমি একদিন তো বড় হমুই। তহন আর আব্বা আম্মার অভাব থাকবেনা। অনেক টাকা কামামু, মায়রে নতুন নতুন শাড়ি দিমু।”

১৭৯) দাড়িয়ালে যৌতুক সমস্যা

শামীমা আসমা (বরিশাল) :

বাকেরগঞ্জের দাড়িয়াল ইউনিয়নে যৌতুক সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। যৌতুকের কারনে বিবাহ যোগ্য অনেক মেয়ের বিয়ে হচ্ছেনা।

অভিভাবক মোশাররফ হোসেন জানান শুধুমাত্র যৌতুকের কারনে বিবাহ যোগ্য মেয়ে তানজিলা (২৫) কে বিয়ে দিতে পারছেন না তিনি।

অভিভাবক শাহজাহান জানান, তার মেয়ের বিয়ের বয়স ৬ বছর হয়েছে। শুরু থেকে তার মেয়েকে শ্বশুর বাড়ির লোকজন এবং স্বামী বাবুল গাজী (৪০) বিভিন্নভাবে যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। তিনি বলেন - “তাদের চাহিদা অনুযায়ী যৌতুক না দিতে পারায় শেফালী এখন আমার বাড়ি।” শেফালী (৩০) জানান, তার বিয়ের সময় ২০ হাজার টাকা ছেলে পক্ষকে দেয়ার একটা চুক্তি হয়। দরিদ্র বাবা ১০ হাজার টাকা দেয় কিন্তু বাকি টাকা কিছু দিন পর দেয়ার কথা থাকলেও তা শাহজাহান মিয়ার পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। এরপর থেকেই বিভিন্নভাবে শেফালীকে চাপ দিতে থাকে যৌতুকের জন্য। অনেক মারধরও করে। এক সময়ে সে সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়িতে চলে আসে সে।

এই এলাকায় যৌতুকের কারনে ২০/২৫ বছরের অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এদের মধ্যে আছে কিছু শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী। স্বাস্থ্য কর্মী জয়নব (৩০) জানান, ভাল অনেক বিয়ের প্রস্তাব আসে ঠিকই কিন্তু তারা টাকা পয়সা চায়। যার কারনে তার ইচ্ছে করছেনা বিয়ে করতে।

অনেক অভিভাবক যৌতুক দেয়ার কথা চিন্তা করে তাদের মেয়েকে কম শিক্ষিত পাত্রের কাছে বিয়ে দিয়ে দেন। আবু হাওলাদার (৪০) জানান, তার বি এ পাশ মেয়েকে শুধু মাত্র যৌতুক দেয়ার কথা ভেবে সদ্য বিদেশ থেকে আসা প্রায় অশিক্ষিত পাত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

শাহানা বেগম (২৫) জানান, যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় এখন সে দরিদ্র ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় নিয়েছে। বিয়ের সময়কিছু টাকা পয়সা দেয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তা পুরোপুরি দিতে না পারায় তার স্বামী করিম মোলা (৩৫) তা উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন শুরু করে। শেষে ভাইয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। শাহানার ভাই মোস্তফা (৫০) জানায় তার নিজের ছেলেমেয়ে বাব-মা ছোটবোনদের ভরন পোষনেই সমস্যা তার উপর শাহানার খরচ বহন করা তার মত কৃষকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা।

এ গ্রামে লক্ষ্য করা গেছে দরিদ্র শ্রেনীর মানুষের মধ্যে যৌতুক প্রবনতা বেশি। জরুরি ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌতুক বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার বলে মনে করছেন ভুক্তভোগী নারী তার পরিবার সহ সংশ্লিস্টজন।

১৮০) দশ বছরেও শ্রমের মর্যাদা বাড়েনি বরিশালের নারী শ্রমিকদের

নজরুল বিশ্বাস (বরিশাল) :

দশ বছরেও শ্রমের মর্যাদা বাড়েনি বরিশালের নারী শ্রমিকদের। পুরুষদের সমান কাজ করলেও ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত তারা। শ্রমের ন্যায্য মজুরী দাবী আদায়ে প্রতিবাদ করলে নানা বঞ্চনার শিকার হতে হয়। নারী শ্রমিকদের উপর চলে অত্যাচার নির্যাতন।

বরিশাল ট্রেড ইউনিয়ন ও ইমারত শ্রমিক ইউনিয়নের এক তথ্যে জানা যায় বরিশাল নগরীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাচঁ হাজার নারী শ্রমিক তাদের শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমইপি কারখানা, বিড়ি কারখানা, বেঙ্গল বিস্কুট ফ্যাক্টরী উল্লেখ যোগ্য।

নারী শ্রমিকদের বিশাল একটি নগরীর বিভিন্ন জায়গায় রাজ মিস্ত্রীর কাজ ও ইটভাটায় কাজ করে। ট্রেড ইউনিয়নের এক সমীক্ষায় দেখা গেছ মানুষের জীবন যাত্রার মানউন্নয়নে পাশাপাশি বরিশালের নারী শ্রমিকদের পারিশ্রমিক আনুপাতিক হারে বাড়েনী। অথচ শ্রম দিতে আসা নারী শ্রমিকদের অবদান কোন অংশে কম নয়। দশ বছর পূর্বে এ নগরীতে একজন নারী শ্রমিক দিন শেষে তার মজুরী পেত ৪০/৫০ টাকা। আর এখন পায় ৭০/৮০ টাকা। এমন কি সর্বোচ্চ ১২০ টাকা। এখন দেখা যায় এ নগরীতে একজন পুরুষ শ্রমিক কাজ দিন শেষে মজুরী পায় ২শ থেকে ২৫০ টাকা। এতে করে দিন দিন নারী শ্রমিকদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে বলে ট্রেড ইউয়িন নেতৃবৃন্দের দাবী।

কেসস্টাডি -১

নগরীর বগুরা রোড এলাকায় একটি ভবনের ঢালাই কাজ করছে নীলুফা (৪৫)। সিমেন্ট বালু মিশিয়ে বড় একটা তাগড়া মাথায় বাশেঁর সিড়ি বেয়ে ঝটপট উপরে উঠে গেল। মাল ঢেলে রেখে আবার নিচে নামল। কথা হয় নিলুফার সাথে। সে জানায় সে একজন পুরুষের থেকে বেশি সক্ষমতার সাথে কাজ করে। কিন্তু তার পারিশ্রমিক ন্যায় সঙ্গত নয়। নিলুফা বলে– "প্রতিবাদ করলে আমারে আইজই কাম থিকা বাদ দেবে।"

নীলুফার মত অন্য নারী শ্রমিকদেরও একই অবস্থা। নারী শ্রমিকদের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে খোজঁ নেয়া হয় বরিশাল শ্রম দপ্তরে। সেখানে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নিয়ে কোন মন্তব্য করতে পারবেনা বলে জানান। একজন কর্মচারী জানান বরিশালে নারী কিংবা পুরুষ শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী নিয়ে তারা কিছুই করতে পারেনা।

নগরীর হাটখোলায় এমইপি ইলেট্রনিক্স কোম্পানিতে কাজ করে কয়েকশ নারী শ্রমিক। এদের প্রতিমাসে বেতন দেয়া হয় ৬০০-৭০০ টাকা। কাজে কোন ভুল হলে চলে নির্যাতন। অনেককে চাকুরীও হারাতে হয়। এ প্রেক্ষিতে নারী শ্রমিকরা নিজেরাই সহ্য করে মালিক পক্ষের নির্যাতন।

একই চিত্র নগরীর বিড়ি কারখানা ও বেঙ্গল বিস্কুট কোম্পানীর নারী শ্রমিকদের। এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে সংশ্লিস্ট কারখানা কর্তৃপক্ষের অনুমতি মেলেনি।
বরিশাল ট্রেড ইউনিয়ন ও ইমারত শ্রমিক নেতা এ কে আজাদ জানান, এক গবেষনায় দেখেছে দীর্ঘ ১০ বছরে বরিশালে নারী শ্রমিকদের আনুপাতিক হারে শ্রমের মর্যাদা বাড়েনি। তিনি বলেন- "মানুষের আয় বেড়েছে, জীবন যাত্রার মান বেড়েছে কিন্তু নারী শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাড়েনি এটা দুঃখ জনক। তবে আমরা ন্যায্য মজুরীর দাবীতে আন্দোলন করে যাচ্ছি।"

১৮১)কুড়ানী ও ভাঙ্গারিদের কথা
এম মিরাজ হোসাইন (বরিশাল) :
বরিশাল নগরীর অনেক শিশুর জীবন চলে ময়লা আবর্জনা ঘেটে পরিত্যাক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করে তা বিক্রির মাধ্যমে।
জানা গেছে বড়দের থেকে শিশুরাই এ কাজে বেশি নিয়োজিত। প্রতিদিন খুব সকাল থেকে শুরু হয় নগরীর ডাস্টবিন আর ড্রেনে আবর্জনা ফেলার স্থানে নোংরা ময়লা ঘেটে বিভিন্ন ভাঙ্গারী সামগ্রী খোঁজার কাজ যা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে।
মানুষ কাক ও কুকুরের বিচিত্র সহাবস্থান এ ডাস্টবিনে। কাক ও কুকুর খোঁজে খাবার আর শিশুরা খোঁজে খাবার কেনান মত উপকরণ।
ঘুটে কুড়ানীদের প্রত্যাশিত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে লোহা, প্লাস্টিক, কাঁচ, এ্যালুমিনিয়াম, রাবার, জুতা-স্যান্ডেল, পশুর হাড় ইত্যাদি। এসব দ্রব্য সংগ্রহ করে তা ভাঙ্গারী দোকানে বিক্রি করে যা আয় হয় তাই দিয়েই এসব শিশুদের কায়ক্লেশে জীবন চলে বরিশাল নগরীর শত শত ছিন্নমূল পরিবারের। কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে না পেরে তারা জীবন ধারনের একমাত্র উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে এ পেশাকে।
ঘুটে কুড়ানী নগরীর বালুর হাট বস্তির শিশু হাছান জানায় মানুষের ফেলেদেয়া সামগ্রী কুড়িয়ে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। বড়দের হাতে মারও ক্ষেতে হয় চুরির অপবাদে। হাসান জানায়, রূপাতলীর লালার দীঘির পাড় এলাকায় সম্প্রতি ডাস্টবিন থেকে ভাঙ্গা পুরানো কিছু লোহা কুড়িয়ে ফেরার পথে কয়েকজন লেঅক তার বস্তার মধ্যে কি তা দেখাতে বলে। বস্তায় লোহা দেখতে পেয়ে চোর অপবাদ দিয়ে তারা মারধর করতে থাকে। পরে অন্য এক ব্যক্তি এসে তাকে উদ্ধার করে। হাসানের মত অন্য শিশুরাও জানিয়েছে কম বেশি মার সবারই খেতে হয়েছে এ পেশায় এসে।
ঘুটে কুড়ানীদের সংগ্রহীত দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে ছেড়া জুতা স্যান্ডেল, এ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, ও রাবার। এগুলো ৭০-৮০ টাকা কেজি দরে কেনে ভাঙ্গারি ক্রেতারা।

সারাদিন রোদে পুরে হারভাঙ্গা খাটুনি খেটে পরিবারে দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করা শিশুদের যে বয়সে স্কুলের খাতা বউ, কলম হাতে থাকার কথা , সে বয়সে তারা তাদের কাধে ভাঙ্গারির বস্তা।
আবজর্নার স্তূপ থেকে ঘুটে কুড়ানো শিশুদের সাথে আলাপ করে তাদের নানা করুন কাহিনী জান গেছে। পরিবারে স্থায়ী কোনো কাজের ব্যবস্থা থাকলে তারা এ কাজ না করে পড়াশোনা করতো বলে জানিয়েছে স্টেডিয়াম বস্তির ভাঙ্গারি কুড়ানি শিশু আল-আমিন ও আবুল কালাম। তাদের মত অন্য শিশুদের বক্তব্য কে নেবে তাদের দু'বেলা খাবারেরর দায়িত্ব ?

১৮২) বিড়ি কারখানায় ঝুকিঁপূর্ন শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ভাগ্যোন্নায়ন হবে কি?
এম মিরাজ হোসাইন (বরিশাল) :

বরিশালের বিড়ি কারখানায় অসংখ্য শিশু শ্রমিক কাজ করছে। তারা একদিকে যেমন ন্যায্য মজুরী পাচ্ছেনা তেমনি অন্যদিকে তামাকের বিষক্রিয়ার শিকার হয়ে নানা রোগে ভুগছে। শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলে বিড়ি কারখানায় ঝুঁকিপূর্ন শিশু শ্রম বন্ধ হবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্টজন।
বরিশাল নগরীতে শিশু বিড়ি শ্রমিক ৩ হাজার। বিড়ি শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত এসব শিশুরা পাচ্ছেনা ন্যায্য মজুরী, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত এরা। কারখানাগুলোতে শ্রম আইন কেউ মেনে চলেনা। বরিশাল বিভাগে ১৭ টি বিড়ি কারখানা আছে। এসব কারখানায় দিনদিন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (অ্যাসেড) সুত্র জানায়, বিভাগের এসব কারখানায় কর্মরত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। আর এর মধ্যে বরিশাল জেলায় রয়েছে ৩ হাজার। এদের বয়স ৮ তেকে ১২ বছরের মধ্যে। এরা বিড়ি কারখানায় মালিক পক্ষের কাগজে কলমে কোথাও নেই। কারখানার নামধারী শ্রমিকদের সহকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। কারখানার ভেতরে বসেই কাজ করছে এরা। শিশু বিড়ি শ্রমিকরা প্রতিদিন ১৫-২০ টাকা উপার্জন করে। প্রতি হাজার বিড়ির খোলে তামাক ভরে মুখ আটকে দিলে মজুরী পায় চার টাকা। এতে সময় লাগে চার ঘন্টা। এ হিসেবে তারা প্রতিদিন ১২ ঘন্টা শ্রম ব্যয় করে। এতে ঘন্টা প্রতি মজুরী পায় এক টাকা ২৫ পয়সা করে। যা কোনো মতেই ন্যায্য মজুরীর আওতায় পড়েনা। আর শিশুরা যে তামাকের কাজ করে তা কোনো মতেই স্বাস্থ্য সম্মত নয়। বরং বিপদজনক। এ কারনে ওদের রোগ ব্যাধি লেগেই থাকে। এ শিশু শ্রমিকদের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় এদের স্বাস্থ্য সমস্যা দিনদিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এমনকি ক্যানসারের মত ঝুঁকিপূর্ন রোগ খুব সহজে এদের শরীরে স্থান নিচ্ছে। স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবদুল হামিদ শেখ জানান, বিড়ি শ্রমিক শিশুদের তামাকের বিষাক্ত গ্যাসের কারনে প্রথমে কাশি এবং পরে তা যক্ষা ও ক্যানসারে রূপ নিতে পারে। কর্তৃপক্ষ এদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য একজন চিকিৎসক নিয়োগ করতে পারে। তাছাড়া অসহায় এসব শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার সুযোগ নেই কোথাও। এরা শিক্ষা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আলাপকালে কারিগর বিড়ি ফ্যাক্টরীর এক কর্মকর্তা নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু মালিকদের কিছু দালাল এসব থেকে বঞ্চিত করে রাখছে শিশুদের।
শ্রম আইনে আছে ১৪ বছরের মধ্যে কোন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ন শ্রমে নিয়োগ করা যাবেনা। কিন্তু এ আইন মানছে না বিড়িকারখানা কর্তৃপক্ষ।
এ ব্যাপারে আলাপকালে কারিগর বিড়ি কারখানার মালিক পক্ষের এক ব্যক্তি বলেন- "আমরা কোনো শিশুকে নিয়োগ দেইনা। যারা কাজ করছে তারা কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের লোক।"
বিড়ি কারখানায় কর্মরত শিশু শ্রমিক সাথী (৮)। নগরীর ২৫ নং ওয়ার্ডের ব্রাঞ্চরোডের কালামের কন্যা। দুই বছর পূর্বে কালাম স্ত্রী ও দুই কন্যা শিশুকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়। সাথীর মা অর্থকষ্টে শিশুকন্যাকে নিয়ে বিড় কারখানায় কাজ করে। সাথীকে স্কুলে পাঠাতে পারেনি তার মা। সাথীর মত প্রায় তিন'শ শিশু সাগরদী এ বিড়ি কারখানায় কাজ করে।
শিশু শ্রম বন্ধ করতে শ্রম আইনের প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ছে বলে জানালেন বরিশাল বারের আইনজীবী এ্যাড.জাকির হোসেন মিন্টু মোল্লা।

১৮৩) পলাশপুর গুচ্ছ গ্রামের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

আরিফুর রহমান (বরিশাল) :

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, অবহেলা, দারিদ্র ও অব্যবস্থাপনার কারনে বরিশালের পলাশপুর গুচ্ছ গ্রামের প্রায় ৬ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে সরকারের গৃহীত সবার জন্য শিক্ষা

কার্যক্রমের ধারা ব্যহত হচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নায়ন ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন সুশীল সমাজ।

বরিশাল সিটি করপোরেশন এলাকার মধ্যে কীর্তনখোলা নদীর চরে গড়ে ওঠা গুচ্ছগ্রামের নাম পলাশপুর। পলাশপুর এলাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত করা হলেও এখান শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ এলাকার হাজার হাজার শিশু। পলাশপুরে বর্তমানে ২টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি কিন্ডারগার্টেন ও একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসা আছে।

সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা যায় বেসরকারি এসব প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি না থাকায় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, অব্যবস্থাপনা, বিদ্যালয়ের স্থানাভাব, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঠিক তদারকির অভাবে কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে এবং বেশিরভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বেসরকারি দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি আলহাজ্ব দলিল উদ্দিন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যটি হযরত শাহজালাল (র) বেসরকারি বিদ্যালয়।

এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক হাজার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করলেও আর্থিক সংগতি না থাকায় প্রতিবছর এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শতকরা ২০ ভাগ ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে। ৫ম শ্রেনী থেকে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে শতকরা ৫০ ভাগ এবং বাকি ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর ১০ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পেয়ে ঝরে পড়ে। অন্যদিকে পলাশপুরে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তারা তাদের দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাচ্ছেন। এসব বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান সূত্রে জানা যায়, পলাশপুরে শূন্য থেকে ১০ বছরের প্রায় ৬ হাজার শিশু রয়েছে। যারমধ্যে ৬ বছর বয়সের প্রায় চার হাজার শিশু রয়েছে। তাদের মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি রয়েছে মাত্র এক হাজার ছেলেমেয়ে।

এছাড়াও পলাশপুরের ৯৯ ভাগ লোক শ্রমজীবী হওয়ায় ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার কারনেও শিশু শ্রম বেড়ে যাচ্ছে এবং গরিব পরিবারের শিক্ষার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি না হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আর এসব বিদ্যালয় বেসরকারি হওয়ায় আর্থিক সহযোগিতাস্বরূপ কোনো উপবৃত্তির ব্যবস্থা না থাকায় ওই সব শিশুরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর তাই অধিকাংশ গরীব পরিবারের শিশুরা পরিবারে উপার্জন বাড়ানোর জন্য ঝুঁকিপূর্ন পেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে।

কথা হয় শিশু জুম্মান ও শাহিনের সাথে। দুজনের পরিবারেই ৮/১০ জনের সদস্য। তাই পরিবারের অর্থ যোগানের জন্য তারা চায়ের দোকানে কাজ করে। জুম্মান জানায়, ভাইয়া লেহাপড়া করতে ইচ্ছা অয় তয় টাহা-পয়সা পামু কই। তাই সবার জন্য শিক্ষাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক সহযোগিতা স্বরূপ সরকারিভাবে গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি উন্নয়ন ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন এ এলাকার বৃহৎ জনগোষ্ঠী।

১৮৪) বরিশাল সদর উপজেলায় নারী নির্যাতনের হার দিন দিন বাড়ছে।

আরিফুর রহমান (বরিশাল) :

বিভাগীয় শহর বরিশালে দিন দিন নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে শুধু বরিশাল সদরে ৯৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষনসহ ৪শ ৭৭ টি নারী নির্যাতনের মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। সূত্র সংশ্লিস্ট দফতরের। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত সম্ভব হলে এ সংখ্যা আরও বাড়বে বলে সূত্র উল্লেখ করে। জানা যায় ধর্ষনসংক্রান্ত মামলাগুলোর মধ্যে ৬৮ টির চার্জশিট ও ২৬ টির চুড়ান্ত রিপোর্ট থানা পুলিশ দাখিল করেছে। অন্যান্য ৩ শ ৮৩ টি নারী নির্যাতনের মামলার ২৪৫ টির চার্জশীট ও ১৩৪ টির চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলকৃত মামলাগুলোর তদন্তে থানা পুলিশের বিরুদ্ধে আসামীদের পক্ষ নিয়ে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ কর্মকর্তা বলেছে মামলার তদন্তকালীন সঠিক ঘটনা না পাওয়া,

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে মামলা দায়ের করা এবং সাক্ষীরা যথাযথভাবে সাক্ষ্য না দেয়াতে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে হচ্ছে। অপরদিকে আইনজীবীরা বলছেন, নারী নির্যাতনের যে চিত্র পুলিশের নথিপত্রে রয়েছে বাস্তবে তার বহুগুন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা আরও বলছেন, পুলিশের সহযোগিতা না পাওয়া ও প্রভাবশালীদের চাপের মুখে অনেক নির্যাতিতা আইনের আশ্রয় নিতে পারছেনা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় ২০০৬ সালে ১৫ জুন ধর্ষিতাসহ ৭৯ জন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২০০৫ সালে ১৮ টি ধর্ষনের ঘটনাসহ ৮৪ নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। ২০০৪ সালে ২২ টি ধর্ষনের ঘটনাসহ বিভিন্ন ধরণের ৫৭ টি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এতে একশ ৬৭ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৭ টি ধর্ষন মামলা রয়েছে।২০০২ সালে সালে ১২ ধর্ষনের ঘটনাসহ ৯০ টি বিভিন্ন ধরণের নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা হয়েছে।

মহিলা আইনজীবী সমিতির বরিশাল বিভাগীয় প্রধান এ্যাড. মুনিরা বেগম জানান, বেশিরভাগ নারী নির্যাতনের ঘটনা স্বামীর পরকিয়া প্রেমে বাঁধা, যৌতুক দিতে অস্বীকৃতি ও স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে না মেনে নেয়ার কারনেই ঘটে থাকে। তিনি মনে করেন এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ যেমন জরুরী তেমনি সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতা আরো দৃঢ় হওয়া দরকার। এ জন্য পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও উন্নত হওয়াটা সবচেয়ে বড় বেশি প্রয়োজন।

১৮৫) আমরাও আলোকিত মানুষ হতে চাই

আরিফুর রহমান (বরিশাল) :

অন্ধকার জীবন থেকে মুক্ত হয়ে আমরা আলোর পথে চলতে চাই। হতে চাই আলোকিত মানুষ। বাঁচতে চাই মাথা উঁচু করে। এভাবেই নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বরিশাল সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পূর্নবাসন কেন্দ্রের মেয়েরা। পতিতাবৃত্তির মত ঘৃন পেশায় আশার জন্য তারা মানুষের স্বার্থপরতাকেই দায়ী করেছে।

কথা হয় বরিশাল নগরীর জাগুয়া এলাকায় সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পূর্নবাসন কেন্দ্রের নিবাসী নুপুর, মুন্নি ও ডালিম সহ কয়েকজনের সাথে। তাদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ বছরের নিচে। তারা জানায় মানুষরূপি কিছু অমানুষের স্বার্থপরতার শিকার হয়ে আজ তারা সমাজের কাছে সামাজিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। তারা দাবী করছে এ পথে যেতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছে এর জন্য দায়ী দারিদ্র।

পূর্নবাসন কেন্দ্রের মুন্নি (১৪) জানায়, তার বাড়ি বরিশালে। দারিদ্রের কারনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পরে তার আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে ঢাকায় আসে বাবা মায়ের উপর রাগ করে। সেখানে তার পরিচয় হয় ছকিনা (ছদ্ম) নামের এক মধ্যবয়সী নারীর সাথে। মুন্নির সব কথা শুনে সে তাকে ভাল বেতনে চাকুরী দেয়ার নাম করে ঢাকার জয়া নামে এক পতিতা সর্দারনীর কাছে। তাকে আটকে রাখা হয় ধানমন্ডির এক বাড়িতে। তাকে কাজ বুঝিয়ে দেয় জয়া। রাজি না হলে তার উপর চালানো হয় অমানসিক নির্যাতন। বহুবার পালাতে চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়। ২০০৭ এর প্রথম দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এ বাড়ি থেকে মুন্নিসহ ৫/৬ জন মেয়েকে আটক করে। মুন্নির বাড়ি বরিশাল জেনে তাকে পুলিশের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয় এই পূর্নবাসন কেন্দ্রে। সেই থেকে এখানেই রয়েছে সে। এখানে মুন্নির মত বর্তমানে ৩৮ জন নিবাসী রয়েছে। যারা প্রত্যেকেই সমাজের কিছু স্বার্থপর মানুষের নির্যাতনের শিকার হয়ে চলে গিয়েছিল অন্ধকার পথে। তারা ঐ স্বার্থপর মানুষগুলোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছে।

নিবাসীরা জানায় এখানে তাদের পূর্নবাসনের জন্য দেয়া হচ্ছে হস্তশিল্প সহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ। তাদের মতে যোগ্যতা প্রমানের সুযোগ করে দিলে তারাও সমাজের আর দশটা মানুষের মত ভাল কাজে অবদান রাখতে পারে। তারা আর অন্ধকার জীবনে ফিরে যেতে চায়না। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য তারা সামাজিক স্বীকৃতির পাশাপাশি চায় কাজের ক্ষেত্র। সমাজসেবা অধিদপ্তর এ পর্যন্ত বরিশালের ৬৬ জন সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েকে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান এবং বিয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে বলে জানান সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ আঃ মতিন।

১৮৬) যে স্কুল মিতুকে স্বপ্ন দেখায়

গাজী শাহ রিয়াজ (বরিশাল) :

অভাব অনটন আর বস্তির নোংরা পরিবেশেই বেড়ে উঠছে মিতু (১০)। পিতা খোকন মল্লিক আর মা মমতাজ বেগমের সুখের সংসার ৭/৮ বছর আগে ভেঙ্গে গেলে সে আর তার মা নানী আম্বিয়া বেগমের কাছে বস্তিতে আশ্রয় নেয়। তার বাবা খোকন অনত্র বিয়ে করে তাদের অআর খোঁজ খবর নেয়না। মিতুর মা বাসাবাড়িতে কাজ করে আবার কখনও পার্শ্ববর্তী হোটেলে কাজ করে মাসে ৬০০-৭০০ টাকা আয় করে।

বরিশাল নগরীর গগনপল্লি সংলগ্ন চর বদনা বস্তিতে একটি বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠরত অবস্থায় কথা হয় মিতুর সাথে। ফুটফুটে মিতু ১০ বছরে পা দিয়েছে। জীবনের নয়টি বছর কেটে গেলেও তার মত বয়সী অন্য দশটি মেয়ের মত বাবার কাছে কিছু আবদার করা হয়ে ওঠেনি তার। তবে মমতাজ বেগম চেষ্টা করছেন সাধ্যানুযায়ী মেয়ের ইচ্ছা পূরনের। তবে অনেক সময়ই বড় কোনো চাহিদা পূরন করার সামর্থ মিতুর মায়ের থাকেনা। কারন মিতুর আরেকটি ছোট ভাইও আছে। গৃহপরিচারিকার কাজ করে সম্ভব হয়না দুটো ছেলেমেয়ের সব ইচ্ছা পূরনের।

মিতুর ইচ্ছে ছিলো সে স্কুলে পড়বে। কিন্তু অভাব অনটন বাঁধ সাধে সে ইচ্ছায়ও। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে হঠাৎই মিতুদের বস্তিতে একটি স্কুল চালু করে একটি বেসরকারি সংস্থা। কর্মজীবী শিশুদের এ স্কুলে ছুটে যায় সে। সব জেনে মাকে জানালে মা তাকে ভর্তি করে দেয় ঐ স্কুলে। মমতাজ বেগম জানায় স্কুলের শিক্ষাদানের সব বইখাতা মিতু বিনা মূল্যে পায়। এভাবে সুযোগ পেলে মিতুকে সে শিক্ষিত করে তুলতে পারবে বলে জানায়। কি হতে চাও মিতুকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে-"চাকরী করব।"

১৮৭) একজন ইউনুসের কথা

গাজী শাহ রিয়াজ (বরিশাল) :

ইউনুস (৯) জন্ম থেকে পলিও আক্রান্ত। অভাব আর নানা প্রতিকূল পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা। এক বছর বয়সে সে বাবাকে হারায়। বাবা আবুল হোসেন সন্ন্যামতের মৃত্যুর পর মা আনোয়ারা বেগম গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ৭/৮ বছর আগে চলে আসে বরিশাল নগরীর শিশুপার্ক বস্তিতে। কোনো ভাবে কাটাচ্ছিলেন দিন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে ইউনুস সবার ছোট। অভাবের কারনে পড়ালেখা হয়ে ওঠেনি কোনো ভাইবোনের। এমন অবস্থায় শহরের কর্মজীবী শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রকল্পে। পর একটি স্কুল ওদের মনে আশার আলো জাগায়। ২০০৬ সালের জুলাই মাস থেকে সরকারের উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা বুরেয়া ও ইউনিসেফ-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ঐ স্কুলে বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ পায় ইউনুস। স্কুলের দ্বিতীয় সাইকেলের অথাৎ চতুর্থ শ্রেনীর সমমান পর্যায়ের ছাত্র ইউনুস। তর চোখে মুখে হতাশার মাঝেও নতুনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দোলা দিচ্ছে। মা আনোয়ারা বেগমের সাথে কথা বললে তিনি জানান ইউনুসকে নিয়ে তার নতুন স্বপ্নের কথা। বলেন -"আমি মানসের বাড়ি কাম কইরা কোনোমতে সংসার চালাই। আমার এ অভাবের সংসারে আমার রোগা ইউনুস লেহাপড়া কইরা একদিন

বাতি জ্বালাইবে।” তিনি জানান ইউনুসের ভাল জামা নেই দেখে পাশের ঘরের একটি ছেলের জামা পরে সে স্কুলে আসে। ইউনুসকে নিয়ে কথা হয় কর্মজীবী ঐ স্কুলের শিক্ষিকা সীমা দাসের সাথে। তিনি জানান ইউনুসের মত শতাধিক শিশু এ বস্তিতে শিক্ষা বঞ্চিত রয়েছে। এখানে আরও সরকারি ও বেসরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

১৮৮) উজিরপুরে প্রায় ২০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

মাহফুজুর রহমান মাসুম (বরিশাল) :

উপজেলার বিল অঞ্চলের কয়েক হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। উপজেলা সদর থেকে কয়েকহাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। উপজেলা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে ১৭২ বর্গকিলোমিটার বিস্তির্ন বিল অঞ্চল। এ প্রত্যন্ত বিল অঞ্চলের কয়েক হাজার শিশু আর্থিক দৈন্যতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারনে ৫ বছরের শিশুরা বিদ্যালয়ের পরিবর্তে বাবা মায়ের সাথে জীবিকার তাগিদে নেমে পরে নানামুখী কাজে। সরকার ঘোষিত খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার ভাতা ব্যবস্থা তুরনামূলকভাবে কম থাকার কারনে বিল অঞ্চলের সাতলা, হারতা, জল্লা, ওটরা, বড়াকোঠা ইউনিয়নের শিশুরা বিলে শাপলা ও শামুক সংগ্রহ, ফাঁদ ও জাল পেতে মাছ ধরা, স্থানীয় বাজারে মাছ বিক্রি প্রভৃতি কাজ করে বাবা মাকে অর্থের যোগান দেয়।

এ সকল বিল অঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম, রেজিস্টার বিদ্যালয়গুলোতে হাটু পানি ও অধিকাংশ বিদ্যালয় বন্যায় ও পানির কারনে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। স্কুল গুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই খারাপ। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম তালের ডোঙ্গা, কলাগাছের ভেলা ও নৌকা। বছরের নয়মাস রাস্তাঘাট পানির নিচে থাকায় শিশুরা স্কুলে যেতে পারেনা। সাতলা শিবপুর বিলে শামুক সংগ্রহের সময় শিশু আকাশ জানায়, বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে স্কুল পথের মধ্যে বড় বড় সাঁকো ও রাস্তার পানি তাই স্কুলে যায় না। শামুক সংগ্রহ করে টাকাপয়সা বাবামাকে দেয়।

বিরৈ অধিবাসী অতুল বালা জানায় এ অঞ্চলে বছরে তিন মাস ধান চাষ হয় আর বাকি নয়মাস বিরৈ মাছ ধরা ও শাপলা তোলা সহ নানামুখী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। আর ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠাতে পেরে তাদের যুক্ত করে এ পেশায়।

এলাকাবাসীর ধারণামতে বিল অঞ্চলে প্রতি বছর প্রায় বিশ হাজার শিশু বিদ্যালয় যাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ বি এম খলিলুর রহমান জানান বিল অঞ্চলে অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি পরিমানে ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা ও মাঠ ভরাটের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নিম্নাঞ্চল হওয়ায় ভেড়ীবাঁধের মধ্যে পানি ঢুকে রাস্তাঘাট তলিয়ে যায়। এ কারনে শিশুরা ইচ্ছা থাকা সত্বেও যেতে পারেনা।

সাতলার চেয়ারম্যান আবুজাফর মোল্লঅ জানান শীত মৌসুমে বিদ্যালয়ের মাঠ ও রাস্তা মেরামত করা হবে। যাতে শিশুরা মাছধরা, শাপলা তোলা, শামুক সংগ্রহ ফেলে স্কুলে যাবে বলে আশা করেন তিনি।

১৮৯) পূর্ণের অপূর্ণতা

যোবায়েদা আক্তার সীমা (নোয়াখালী) :

শীতের সকালে একদল বেহালের সাথে দেখা। তাদের উপর নজর পড়তেই নজর পড়ল ছোট্ট একটি শিশুর উপর। বয়স হবে এই দশ কি এগারো। সারাদিন সবার সাথে মাছ ধরেছে। তাই শীত কাটাতে রোদে বসে আছে। দেখে মনে হয় কোনো চিন্তা নেই। কি হাসিখুশি চেহারা। অথচ শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। ছেলেটির নাম পূর্ণ। বাবা প্রিয় লাল দাস। ভাইবোন ছয় জন। পূর্ণ চাটখিল উপজেলার পরকট

দশঘরিয়া ইউনিয়নের ছেলে ।নামটি তার পূর্ণ অথচ জীবনটা যেন অপূর্নই থেকে যাবে। যখন বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাবারও বয়স হয়নি তখনই বাবার সাথে নেমেছে জীবীকা অর্জনের পথে। সে চানায় কার চার কিংবা পাঁচ বছর বয়সেই বাবার সাথে নেমে পড়ে মাছ ধরা পেশায়। পূর্ণ কখনও স্কুলে যায়নি। স্কুলে যাবার প্রচন্ড ইচ্ছা থাকলেও তার কখনও সেখানে যাবার সুযোগ হয়নি।
চাটখিল নদীতে মাছ ধরে তার বাবা তাদের অন্ন যোগায়। সংসারের আট সদস্যের অন্ন যোগারে হিমশিম খেলে আর একটু সচ্ছলতার জন্য বাবা সাথে করে নিয়ে যায় ছোট্ট পূর্ণকে। তাই সে স্কুলে যাবার বদলে যাচ্ছে এখন নদীতে। অ, আ, ক, খ লেখার বদলে পরিচিত হচ্ছে জালের প্রতিটি গিঁটের সাথে। বাবা চাচারা যেমন সারা জীবনের জেলে, তেমনি পূর্ণকেও বরণ করতে হবে এ ভাগ্যই। সূঁতো জোড়া দিয়ে যেমন জাল বোনা হয় ফূর্ণের জীবনও তেমনি জোড়াতালি দিয়ে সামনে যেতে যেতে একদিন শেষ হয়ে যাবে। মিশে যাবে নদীর স্রোতের সাথে। তাইতো পূর্ণের বাবার আক্ষেপ-" আল্লা ক্যান আংগো জীবনডা নিয়া এমন খেলা খেলে?"

১৯০) একজন রফিকা খাতুনের উত্থান

যোবায়েদা আক্তার সীমা (নোয়াখালী) :

"আমি আল্লার রহমতে স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়া ভালই আছি। আমার এখন কোন অভাব নেই। আগে যেখানে তিনবেলা ভাতই পেতে কষ্ট হত এখন সেখানে খেয়ে দেয়ে বাড়তিও থাকছে। আর এ সব কিছু সম্ভব হয়েছে সময়মত ঋণ নিয়ে তা কাজে লাগিয়েছি বলে"- কথাগুলো বলে সূবর্ণচর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের পূর্ব চরমজিদ গ্রামের রফিকা খাতুন (৪৫)।
এক সময় রফিকা খাতুনের কিছুই ছিলোনা। শ্বশুর বাড়িতে কেটেছে অনাহারে অর্ধাহারে। এরপর আলাদা হয়ে যাবার পর আরো দুর্ভোগ। যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করছে তখন তার কাছে আশার আলো হয়ে আসে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান। ১৯৯০ সালে যখন এটি ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে তখনই রফিকা এর সদস্য হয় ও ঋণ গ্রহণ করে। প্রথম ঋণের পরিমান ছিলো ২০০০ টাকা। এ টাকা দিয়ে সে একটি নার্সারি করে। এ নার্সারিই ঘুরিয়ে দিয়েছে তার ভাগ্যের চাকা। স্বামী স্ত্রীতে দুজনে মিলে প্রথম ঋণের টাকা পরিশোধ করে এবং পরে লভ্যাংশও থাকে অনেক। ঋণের পরিমান বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা নেয় সে। এ টাকা দিয়ে গরু কেনে। এরপর আস্তে আস্তে ঋণের টাকা বাড়িয়ে নিয়েছেন আর পরিশোধ করেছেন। এভাবে তিনি জমি কিনেছেন, টিনের ঘর তুলেছেন, হাঁস মুরগী গরু ছাগল তার সবই আছে এখন। স্বামী আর সন্তানেরা তার এসব কাজে সহযোগিতা করে। বর্তমানে রফিকার তিন একর জমি আছে। আরও ৬০ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে সে এ বছর জমি চাষ করেছে। তিনি বলেন- "আমার নয়টি সন্তান। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, জামাই কিছু দাবী না করলেও বিয়েতে একভরি স্বর্ন দিয়েছি। বড়ছেলে কিছুটা পড়ালেখা করে এখন দোকান করছে। অন্য ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার মধ্যে আছে। পুকুরে মাছ চাষ করি। বাঁশ বেতের কাজ চলছে। নিজের ইচ্ছেমত খেতে পারছি, পরতে পারছি। অন্যকে দিতে পারছি। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে।" কথাগুলো বলার সময় তার চোখ মুখ দিয়ে যেন সাফল্যের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে। যে দ্যুতি এ এলাকার আরও নারীর মাঝে ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে।

১৯১) চর মজিদের নারী স্বাস্থ্য

যোবায়েদা আক্তার সীমা (নোয়াখালী) :

দারিদ্র, সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব এবং কুসংস্কারে কারনে চর মজিদের অধিকাংশ নারী স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরেজমিন পরিদর্শকালে ভুক্তভোগী ও অন্যান্যরা জানিয়েছেন শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

নোয়াখালী জেলার সূবর্নচর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের পূর্ব চর মজিদ গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ৫০০০। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক নারী। এখানে শিক্ষার আলো তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি লোকজনকে। স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যে তার অধিকার এখানকার নারীরা তা জানেনা। এমন একজন নাছিমা (২২)। নবমশ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও সে জানেননা তার মৌলিক অধিকার গুলো কিকি। তার কথায়-"আমার সন্তান যখন গর্ভে ছিলো তখন সংসারের হালকা ভারী সব কাজ আমাকে করতে হয়েছে। আটদিন পর্যন্ত আমি প্রসব ব্যাথায় কষ্ট পেয়েছি, কোন ডাক্তারের মুখ দেখিনি। অআমার বাবা-মা এসে হুজুরের কাছ থেকে তেলপড়া, পানিপড়া এনে দেয় পরে।"

রাহেলা বেগম (২০) তারও একই অবস্থা। সাতদিন প্রসব ব্যাথায় কষ্ট পাবারপরও কোনো চিকিৎসা পাননি তিনি। একজন এনজিও কর্মী জানান গর্ভকালীন সময়ে ডাক্তার বা প্রশিক্ষিত ধাত্রীর শরনাপন্ন না হওয়ায় নানা জটিলতায় ভোগে এমনকি মৃত্যুর শিকার হয় এখানকার নারীরা।

কয়েকজন নারী জানিয়েছেন তাদের শাশুড়িরা ডাক্তার দেখানো নিয়ে নানা বিরূপ মন্তব্য করে তাদের। আবার দেখা গেছে অনেকেরই দুয়ের অধিক সন্তান। সন্তান ধারণের ব্যাপারে নারীদের স্বাধীনতা নেই। পুরুষরাই নির্ধারন করে এটা। এ সম্পর্কে সবিকা বেগম(২৭) জানান সন্তান না নিতে চাইলে তার স্বামী তাকে মারধর করে। কোনো জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণ করতে দেয়না। সে বলে-" আমার স্বামী বলে আমি খাওয়াপড়া দেই, তুই শুধু জন্ম দিবি। আর কিছু নিয়া তোর ভাবতে হইবনা।"

গর্ভকালীন সময় ছাড়াও অন্যান্য অসুখ বিসুখে ডাক্তারের কাছে যাননা তারা। একজন নারী বলেন- " মহিলাগো অসুখবিসুখ স্বাভাবিক ব্যাপার, এত ডাক্তার লাগেনা।" এভাবেই নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত রাখে যুগের পর যুগ।

১৯২) যৌতুকের কারনে জীবন দিতে হয়েছে গৃহবধূ শিউলী বেগমকে

মাহফুজুর রহমান মাসুম (বরিশাল):

বরিশালের উজিরপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এরমধ্যে যৌতুকের কারনে শতকরা ৮০ ভাগ নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এরেই ধারাবাহিকতায় স্বামী শাশুড়ি ও ননদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন দিতে হয়েছে গৃহবধু শিউলি বেগমকে। উপজেলার জয়শ্রী গ্রামের মৃত কাজী আবদুল মজিদের ছোট মেয়ে শিউলীর সাথে একই উপজেলার কালিহাতা গ্রামের হোসেন হাওলাদারের ছেলে বাস ড্রাইভার সেলিম হাওলাদারের সাথে ১২ বছর আগে বিয়ে হয়। তাদের তিনটি সন্তানও হয়। এরপর শিউলীর স্বামী সেলিম, শাশুড়ি আলেয়া বেগম ও ননদ শিউলী মিলে যৌতুকের জন্য তার উপর শারীরীক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে থাকে। পরে শিউলীর বড় ভাই কাজী ইউনুস বোনের সুখের জন্য জমি বিক্রি করে ৫০ হাজার টাকা দেয়। তারপরও শিউলির উপর নির্যাতন থামেনা। ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর সকালে যৌতুকের দাবীতে তারা শিউলিকে নির্মমভাবে কুপিয়ে জখম করে। পরে স্থানীয় লোকজন এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। এরপর শিউলীর ভাই বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করে। সাতদিন হাসপাতালে থাকার পর স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় সমঝোতার মাধ্যমে শিউলিকে স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যায় শ্বশুর বাড়ির লোকজন। ঠিক এর দু মাস চার দিনের মাথায় নির্মমভাবে পরিকল্পিতভাবে শিউলিকে পিটিয়ে, কুপিয়ে হত্যা করে মুখে বিঁষ ঢেলে উজিরপুর হাসপাতালের সামনে রেখে যায় ঘাতকরা। ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১১ টার দিকে হাসপাতালের সামনে অজ্ঞাত লাশ পড়ে থাকতে দেখে কর্তব্যরত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ

শুভংক বাড়ৈ উজিরপুর থানা পুলিশে খবর দেয়। পরে শিউলির আত্নীয় স্বজনরা লাশ গ্রহণ করে বাবার বাড়িতে কবর দেয়। শিউলির ভাই বাদী হয়ে পুনরায় থানায় মামলা দায়ের করে। ছয় মাস ঘুরে মামলা রেকর্ড করে থানা পুলিশ। এদিকে হত্যা কান্ড ঘটিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় আসামিরা। এ ব্যাপারে থানা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন-"বর্তমানে মামলাটির আমি তিন নম্বর আই.ও তদন্ত কার্য শেষ করেছি, কয়েক দিনের মধ্যে চার্জশীট দেব।"